একক 11 ❑ যুগসন্ধির কবি ও কাব্য

গঠন

11.1 উদ্দেশ্য
11.2 প্রস্তাবনা
11.3 মূলপাঠ (প্রথম অংশ) যুগসন্ধির কবিতা কবিওয়ালা
11.4 সারাংশ (প্রথম অংশ)
11.5 অনুশীলনী 1
11.6 মূলপাঠ (দ্বিতীয় অংশ) যুগসন্ধির কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রঙ্গলাল
11.6.1 যুগসন্ধির কবি
11.7 সারাংশ (দ্বিতীয় অংশ)
11.8 অনুশীলনী 2
11.9 উত্তর সংকেত
11.10 গ্রন্থপঞ্জি

11.1 উদ্দেশ্য

এই এককের মূল উদ্দেশ্য হল এটি পাঠ করে আপনি আধুনিক বাংলা কাব্য সাহিত্য সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা অর্জন করতে পারবেন। প্রয়োজনে প্রাসঙ্গিক আলোচনা করা বা এ বিষয়ে কিছু লেখাও সম্ভবপর হবে।

11.2 প্রস্তাবনা

দশম এককে আধুনিক গদ্যভাষায় রচনার সূচনা ও তার বিকাশ পর্ব ও পরিণতি সম্পর্কে পরিচয় আপনি পেয়েছেন। এখানে আধুনিক কাব্যের সূচনা, বিকাশ ও পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। মধ্যযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্রের মধ্যে মধ্য যুগাবসানের অনেকগুলি চিত্র ল(্য করা গিয়েছিল। মধ্যযুগের সাহিত্যে একদিকে ছিল বৈচিত্র্যহীন ধর্মকেন্দ্রিকতা, ইহবিমুখতা—অপরদিকে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে তুর্কী অভিযানের পর রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তাবোধের অভাবে সৃষ্টিশীল রচনার অভাব ঘটে। পরে অন্ধকার পর্বের অবসানে অনুবাদ কাব্য, মঙ্গল-কাব্য ও বৈষ(বসাহিত্যের মধ্য দিয়ে বাংলা কাব্যভাষায় প্রথম আত্মোপলব্ধির অভিব্যক্তি(দেখা দেয়। তারও পরে সপ্তদশ শতকে আরাকান রাজসভার আনুকুল্যে বাংলার সাংস্কৃতিক জগতে পরিবর্তন ঘটে। কতিপয় বাঙালি মুসলমান কবি রোমান্সরসে জারিত কতকগুলি আখ্যায়িকা কাব্য হিন্দি-ফারসি ভাষার সংমিশ্রণে রচনা করেন। যখন চৈতন্যপ্রভাব প্রায় ী়য়মাণ এবং প্রতিদিনের প্রচলিত ধারা আর পাঠককে আকৃষ্ট করছে না, তখন দৌলত কাজীর 'লোরচন্দ্রানী' বা আলাওলের 'পদ্মিনী উপাখ্যানে'র মানবিক প্রেমকাহিনী বাংলা কাব্যে এক নূতন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছে। তথাপি তা দীর্ঘদিন বাঙালি পাঠককে ধরে রাখতে পারেনি। পদ্যবন্ধের গতানুগতিকতা ছন্দরীতির (-থ পরিত্র(মা পাঠকসমাজকে তেমন আকৃষ্ট করতে পারেনি।

এদিকে মোগল সুবাদারদের দুঃশাসন—অর্থলোলুপতা, চারিত্রদৃষ্টি তার অমাত্যবর্গ ও জমিদার শ্রেণীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ায়, সমাজজীবনও ত্র(মশ দূষিত, পৌ(ষহীন, লালসা-শৈথিল্যে জড়িয়ে পড়ে। ফলত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলা সাহিত্যে পুরাতন অনুবাদ, মঙ্গল ও বৈষ(ব কাব্যধারার অনুবর্তন চলছিল, কিন্তু সেখানে অতীত ঐ(র্য একেবারেই ছিল না। বাংলা সাহিত্যে এটি ছিল অব(য়ের পর্ব। 1757 সালে পলাশির যুদ্ধে ইংরেজ বিজয়ের পর বাংলার সমাজ-পরিবেশ ও তার ভাব পরিমণ্ডল ত্র(মশ পরিবর্তিত হচ্ছিল কিন্তু নির্দ্বন্দ্ব হতে পারেনি। এ সময়কে বলা যায় 'যুগসন্ধির কাল'। এ পর্বে নব্য কলকাতার নগর সংস্কৃতির পটভূমিতে কবিগানের জন্ম।

11.3 মূলপাঠ (প্রথম অংশ) যুগসন্ধির কবিতা কবিওয়ালা

একদিকে অপসৃয়মান সামন্তশাসিত বাংলার পুরাতন সমাজ পরিবেশ ও ভাব পরিমণ্ডল, অপরদিকে বিজয়ী ইংরেজশাসিত নূতন রাজনৈতিক-সামাজিক প্রে(াপটে নানা পৌরাণিক ও ভক্তি(মূলক প্রসঙ্গ অবলম্বন সত্ত্বেও ধর্মভাবমুক্ত(খণ্ড কবিতায় দেশ-কাল মানুষের কথা এ সময় প্রাধান্য পেল। কবিওয়ালারা (1760-1830) নগরজীবনে কর্মশ্রান্ত মানুষকে লঘু আমোদ-উত্তেজনার মধ্য দিয়ে অবসর বিনোদনের উপায় হিসেবে কবিগান উপহার দিতেন। যদিও কবিগানের প্রধান বিষয় রাধাকৃষে(র প্রেম, উমাসঙ্গীত এবং শ্যামাসঙ্গীত, তথাপি সেখানে ভক্তি(রসের পরিবর্তে প্রাধান্য পেয়েছে স্থূল, চটুল মানবিক জীবনরস। কবিওয়ালারা উত্তর-প্রত্যুত্তরে প্রতিপ(ের চাপানের কাটান দিতেন। অনুপ্রাস-যমকের মিশ্রণে মুখে মুখে গান বেঁধে উপস্থিত শ্রোতাদের চমৎকৃত করতেন। এই শ্রেণীর রচনায় কাব্যোৎকর্ষ সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রসম্মত ছিল না। রচয়িতারাও পরিচিত হতেন 'কবি' নয়, 'কবিওয়ালা' নামে। তাঁদের রচনাও 'কবিতা' নয় 'কবিগান' নামে আখ্যাত হ'ত। নগর কলকাতার নবোদ্ভূত বিত্তবান বেনিয়ান মুৎসুদ্দিদের সান্ধ্যবৈঠকে "আমোদের উত্তেজনা" পরিবেশনের জন্য কবিগানের মৌলরূপ—পদ্য বিতণ্ডার আকার পরিগ্রহ করেছিল। তর্জা, পাঁচালি, ঢপ, কীর্তন, টপ্পা প্রভৃতির উপাদানের সংমিশ্রণে কবিগান রচিত। এ(ত্রে বিশেষ খ্যাতির অধিকারী যাঁরা হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে রাম বসু, ভোলা ময়রা, অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি সহ পাঁচালিকার দাশু রায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রাম বসু (1781-1828) জন্ম শালকিয়া (হাওড়া)। লেখাপড়া শিখে কেরানির বৃত্তি নিয়েছিলেন। কবিগানের আকর্ষণে প্রথমে গান বাঁধা, পরে দল করে গান গেয়ে শ্রেষ্ঠ কবিওয়ালার মর্যাদা পেয়েছেন। 'সখী সংবাদ' ও 'বিরহ পর্যায়ের' গান রচনার জন্য তিনি খ্যাত। তাঁর রচনা হৃদ্যতা ও বুদ্ধিদীপ্ত বিতর্কে যথার্থই অনন্য

উমা কেমন ছিলে মা,
ভিখারী হরের ঘরে।
জানি নিজে সে পাগল, কে আছে সম্বল
ঘরে ঘরে বেড়ায় ভি(া করে।।
শুনিয়া জামাতার দুখ কেঁদে বুক বিদরে।

উদ্ধৃত গানটিতে পরিবারজীবনের ছবি সহজ সরল ভাষা ভঙ্গীতে ফুটে উঠেছে।

হ(ঠাকুর এক সময় কবিয়াল রঘুনাথ তন্তুবায়ের শিষ্য হ(ঠাকুর—হরেকৃষ(দীর্ঘাঙ্গী, বিশেষ খ্যাতির অধিকারী ছিলেন। কবিগানের ইতিহাসে ঐতিহ্যময় দুটি নাম হ(ঠাকুর ও রাম বসু। হ(কলকাতার সিমলা পাড়ায় 1749 খ্রিস্টাব্দে জন্মেছেন। পড়াশুনায় শৈশব থেকেই তেমন অনুরাগ ছিল না। এগারো বছর বয়সে পিতৃহীন হ(সখের কবিদল

গড়েন। রাজা নবকৃষে(র পৃষ্ঠপোষণায় এটি পেশাদারি দলে পরিণত হয়। নবকৃষে(র মৃত্যুর পর হ(দল ভেঙে দেন। 1814 খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

হ(র বাঁধা কবির গানে ধ্বনিঝঙ্কারের সঙ্গে বেশ কিছু চটকদারি উক্তি(থাকত। তাঁর গায়ন পদ্ধতি ও ভাষা প্রয়োগ প্রচলিত কবিগানের দোষগুণমুক্ত(ছিল না। হ(র জনপ্রিয় গান "আজ বাঁধবো তোমায় বলমাণি/করিয়ে সখীমণ্ডলী।... গো রসের অবশেষ দিব তোমার মস্তকে ঢালি।"—উদ্ধৃতি সেকালের কবি-ভাষা ও (চির পরিচায়ক। আলোচ্য কবিয়াল তার ব্যতিত্র(ম ছিলেন না।

হ(ঠাকুরের 'লড়াই'-এর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন কৃষ(চন্দ্র চর্মকার, বিখ্যাত কেষ্টা মুচি। বয়সে হ(র চাইতে বড়। হ(ঠাকুর একাধিকবার তাঁর কাছে পরাজিত হয়েছেন। কবিয়াল ভবানী বেনে ও তাঁর শিষ্য রাম বসুর কাছে পরাজয় স্বীকার করেছেন। এতে কোনো অগৌরব ছিল না।

ভোলা ময়রার গানে প্রকাশিত কবিগানের ধারার সঙ্গে যুক্ত(হয়েছে আগমনীর একান্ত আবেগ। ভোলার অনন্য বৈশিষ্ট্য গানের আসরে সমসাময়িক লৌকিক ও ব্যক্তি(গত প্রসঙ্গের অবতারণা ঘটিয়ে তাঁর প্রতিপ(কে পর্যুদস্ত করার মুন্সিয়ানা। আত্মকথাজাতীয় নীচের কবিতাটি ভোলার প্রতিনিধিস্থানীয় রচনা—

"শীত এলে লেপ চাই এলে খোল মই
যাহা কিছু হাতে আসে 'কবির নেশায়' দিই ঢালি।
শরতে হেমন্তে, বৈখাখে বসন্তে
ভোলার খোলা নাহি মানি।।

****

নহি কবি কালিদাস বাগবাজারে করি বাস
পুজো এলে পুরী মিঠাই ভাজি।...
তবে যদি কবি পাই হাটে কভু নাহি যাই..."

পর্তুগীজ ফিরিঙ্গি কবিওয়ালা 'এন্টুনি' ভোলা ময়রার সমসাময়িক ছিলেন। তিন পু(ষ ধরে এদেশে বাস করে বঙ্গললনাকে বিয়ে করে এন্টুনি বাংলা দেশের জীবনযাত্রার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়েছিলেন। ভোলা ময়রা তাঁর জাত-ধর্ম নিয়ে আত্র(মণ করলে—"তুই জাত ফিরিঙ্গি, জারহীঙ্গি.../যীশুখৃষ্ট ভজগে বেটা শ্রীরামপুরের গির্জাতে।" এন্টুনি যে উত্তর দিয়েছিলেন তাতে ব্যঙ্গ ছিল না, ছিল উদার ধর্মীয় চেতনা—"সত্য বটে বটি আমি জেতে ফিরিঙ্গি/(তবে) ঐহিকে লোক ভিন্ন ভিন্ন, অন্তিমে সব একাঙ্গী।" এন্টুনির এ উত্তর সর্বকালের সমন্বয়বাদী ধর্মদর্শনের শেষ কথা— সেকালের প(যা ছিল একান্তই অভাবনীয়। অনুরূপে রামবাবুর একটি আত্র(মণের উত্তরে এন্টুনি উদার চৈতন্যের জয় ঘোষণা করে গেয়েছেন—"খৃষ্টে আর কৃষ্টে কিছু ভিন্ন নাই রে ভাই/শুধু নামের ফেরে মানুষ ফেরে এত কোথা শুনি নাই।"

দাশু রায়—দাশরথি রায় (1806-1857) কবিগানের প্রতিবেশে লালিত হলেও বিধবা বিবাহের মত শতাব্দীর কয়েকটি ভাবতরঙ্গ তাঁর চিত্তকে আলোড়িত করলেও প্রধানত তিনি পাঁচালিকার হিসেবেই স্বীকৃত। কবিগানের মত পাঁচালিও আসরে গাওয়া হোত, অন্যান্য সহযোগীরা গানে বাজনায় সাহায্য করতেন। এখানে গায়ক পায়ে নূপুর ও হাতে চার মন্দিরা নিয়ে এ্কাই গান গাইতেন। চাপান-উতোর বা উত্তর-প্রত্যুত্তরের কোনো অবকাশ ছিল না। দাশরথির গানে অনুপ্রাসের ঝঙ্কার ও সুরের লালিত্য শ্রোতাদের চিত্ত জয় করত।

তাঁর পালাগান মধ্যযুগ প্রচলিত পুরাণ কাহিনী আশ্রিত হলেও সেখানে ভক্তি(-ভাব ব্যাকুলতার পরিবর্তে যুগপ্রভাবে রঙ্গ-ব্যঙ্গাত্মক উপস্থাপনায় আধুনিকতার স্বাদ এনে দিয়েছে। প্রকৃতপ(দাশু রায় উনিশ শতকে জন্মেও মানসিকতায় ছিলেন অষ্টাদশ শতকের কাব্য-কবিতার শেষ ধারক ও বাহক। এই যুগসন্ধি(ণে জন্মেও ঈশ্বর গুপ্ত এ(ত্রে নবযুগের বার্তা বহন করে এনেছেন।

11.4 সারাংশ (প্রথম অংশ)

ইংরেজ অধিকারের পর পুরাতন সমাজ পরিবেশ ও ভাবমণ্ডলের পরিবর্তন ঘটে। ধর্মভাবমুক্ত(খণ্ড কবিতায় সমসাময়িক দেশকালের পটভূমিকায় মানুষের কথা এ সময় প্রাধান্য পায়। কবিওয়ালারা পুরাণ কথার মোড়কে মানুষের কথা স্থূল-চটুল রসের ভিয়েনে শ্রোতৃমণ্ডলীকে উপহার দিয়েছেন। এ (ত্রে যাঁরা স্মরণীয় হয়েছেন তাঁদের মধ্যে রাম বসু, ভোলা ময়রা, এন্টুনি ফিরিঙ্গি এবং পাঁচালিকার দাশু রায় উল্লেখযোগ্য।

11.5 অনুশীলনী 1

নীচের প্র(গুলির উত্তর ক(ন। উত্তর শেষে 165 পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

1. শূন্যস্থান পূর্ণ ক(ন
   (ক) সপ্তদশ শতকে ..... রাজসভার আনুকূল্যে বাংলার ..... ঘটে।
   (খ) দৌলত কাজীর..... বা .....পদ্মাবতী..... প্রেমকাহিনী বাংলা কাব্যে এক নূতন.....সন্ধান দিয়েছে।
   (গ) অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলা সাহিত্যে পুরাতন _____ও _____কাব্যধারার অনুবর্তন চলছিল।
   (ঘ) কবিগানের প্রধান বিষয়_____ প্রেম _____এবং _____তথাপি সেখানে _____ পরিবর্তে প্রাধান্য পেয়েছে মানবিক জীবনরস।
   (ঙ) কবিগান রচয়িতা হিসেবে বিশেষ _____অধিকারী যাঁরা হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ___ ___ ____ সহ পাঁচালিকার _____বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
2. সং(পে পরিচয় লিখুন
   (ক) আলাওল, (খ) লোরচন্দ্রানী, (গ) কবিগান, (ঘ) রাম বসু, (ঙ) সংবাদ প্রভাকর।
3. (ক) ভোলা ময়রার কবিত্ব সম্পর্কে সং(পে লিখুন।
   (খ) দাশু রায়কে উনিশ শতকে জন্মেও "অষ্টাদশ শতকের কাব্য-কবিতার ধারক" বলা হয়েছে। ___এ কথার প্রকৃত অর্থ বুঝিয়ে লিখুন।
   (গ) 'হ(ঠাকুরে'র সং(প্ত পরিচয় লিখুন।

10.6 মূলপাঠ (দ্বিতীয় অংশ) যুগসন্ধির কবি ঈশ্বর গুপ্ত—রঙ্গলাল

বাংলাদেশে যে সময় নতুন-পুরাতনের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ঘোর কাটেনি, তখনও বাংলার কাব্য ও সংস্কৃতি জগৎ বন্ধ্যা ছিল না। কবিওয়ালারা তখন পুরাতনকেই আঁকড়ে আছেন। রাধা-কৃষ(, রামায়ণ মহাভারত পুরাণ নিয়ে

কবির আসর বসাচ্ছেন। এই সন্ধিযুগের সাংবাদিক-কবি ঈশ্বর গুপ্ত তথাপি নতুনকে বরণ করে নিতে দ্বিধা করেননি। সমকাল ও স্বদেশ তাঁকে টেনেছে। তাই নতুন পরিবেশ নিয়ে কবিতা লিখেছেন। সমাজের ভাল-মন্দ নিয়ে কথা বলেছেন। নতুন এ পরিবেশের প্রতি টান থাকলেও, কবির আজন্ম সংস্কার তখনও সনাতন ধ্যান-ধারণার মধ্যে ছিল সীমিত। সামনের দিকে তাকালেও প্রতিনিয়ত তাঁর পিছুটান থেকে গেছে। তা কাটাতে অনেক সময় গেছে। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার বিষয়বস্তু অতি সমকালীন হলেও উপস্থাপনায়—ভাষা-ছন্দে-অলঙ্কারে পুরাতন প্রত্যয়কে তিনি ত্যাগ করতে পারেননি।

অপরদিকে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমী শি(ায় শি(ত। ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের সঙ্গে গদ্য পরিচয়। মুগ্ধ বিস্ময়ে স্বীয় শিল্পকর্মে তাকে আঁকড়ে ধরতে চান। আবার দেশের ঐতিহ্য, স্বদেশ ও সমকাল তাঁকে ভাবায়। এই দুয়ের টানাপোড়েনে অতীত ইতিহাস-কিংবদন্তী থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে, মূর-বায়রণের অনুসরণে মানবিক প্রেমের কথা দেশপ্রেমের কথা বলবার জন্য রোমান্টিক আখ্যান কাব্য লেখেন। কাহিনী পুরাতন, উপস্থাপনায় ভাবে-রূপে আধুনিক।

ঈশ্বর গুপ্ত ও রঙ্গলাল যুগসন্ধিকালে বাস করে নবযুগকে চিনতে ভুল করেননি। এই চেনার ফলে মনে-মননে, ধাক্কা লেগেছিল। আগ্রহ বোধ করেছিলেন বলবার। হৃদয় ও মনের সেই দোলা উনিশ শতকের দান। সে কথাই এ পর্যায়ে বলতে চাওয়া হয়েছে।

11.6.1 যুগসন্ধির কবি

ঈশ্বর গুপ্ত (**1812-1859**) উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলি হল কালীকীর্তন (1833), ভারতচন্দ্র রায়ের 'জীবন বৃত্তান্ত' ও কাব্য সংকলন (1855), 'প্রবোধ প্রভাকর' (1858) এবং মৃত্যুর পর প্রকাশিত 'হিত প্রভাকর' (1863), সংস্কৃত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক অবলম্বনে রচিত 'বোধেন্দুবিকাশ' (1863) খণ্ডাকারে সম্পাদিত কাব্য গ্রন্থাবলিতে সাংবাদিক কবির কবিব্যক্তি(ত্ব ধরা পড়ে। ঈশ্বর গুপ্তই সর্বপ্রথম তাঁর কবিতায় বাঙালিকে স্বদেশপ্রেমের দী(া দিয়েছেন— দেশকে, মাতৃভাষাকে ভালবাসতে শিখিয়েছেন। "তিনি বাঙ্গালা সমাজের কবি।... তিনি বাঙ্গালা গ্রাম দেশের কবি।...ঈশ্বর গুপ্ত Realist এবং ঈশ্বর গুপ্ত Satirist... (তিনি) আপন সময়ের অগ্রবর্তী ছিলেন।... ঈশ্বর গুপ্তের দেশবাৎসল্য তীব্র ও বিশুদ্ধ।...ধর্মেও সমকালিক লোকদিগের অগ্রবর্তী ছিলেন।...ঈশ্বর গুপ্তের রাজনীতি বড় উদার ছিল।"

বঙ্কিমচন্দ্রের এই মূল্যায়ন যথার্থ এবং আজও সমান গু(ত্বপূর্ণ।

এ কথা ঠিক যে, তাঁর কবিতায় মধ্য ও আধুনিক যুগের সংমিশ্রণ দেখা যায়। সাংবাদিক ঈশ্বর গুপ্ত পত্রিকার পাদপূরণে ও বৈচিত্র্যসাধনে এবং অন্তরের তাগিদে যত কবিতা লিখেছেন, বিষয়বৈচিত্র্যে সেগুলি অনন্যতা দাবী করতে পারে। তী্ব্র সমাজ-চেতনা, বাস্তব জীবনবোধ, ব্যঙ্গ ও কৌতুকরসের পরিচয় যেমন তাঁর কবিতায় আছে, তেমনি আছে একাধারে স্বদেশ প্রেম, প্রকৃতি বর্ণনামূলক, ঈশ্বরতত্ত্ব, নীতিত্ত্ব বিষয়ক কবিতা। তিনিই প্রথম কবিতায় নিসর্গ প্রকৃতির একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ রূপ তুলে ধরেছেন। প্রকৃতির রূপ-রঙ্-রস মানুষের জীবনে একটি পৃথক আবেগ সৃষ্টি করে, প্রকৃতির রূপগরিমা মানবজীবন নিরপে(রূপে একটি রস-স্বাতন্ত্র্য রচনা করে—এই উপলব্ধি ঈশ্বর গুপ্তের পূর্বে আর কোনো বঙ্গীয় কবির ছিল না। তাই তাঁর কাব্যে প্রকৃতি একটি ভিন্ন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঈশ্বর গুপ্তকে স্নেহ করতেন। তিনিও তাঁর ভক্ত(ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে তাঁর যাতায়াত ছিল। মহর্ষির উদার ব্রহ্মতত্ত্বের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাই দেখি গুপ্ত কবির ঈশ্বর বিষয়ক কবিতায় ঈশ্বরবোধ

একটি স্বতন্ত্ররূপ লাভ করেছে। ঈশ্বর তাঁর কাছে নির্গুণ। এই ঈশ্বরচৈতন্য উনিশ শতকে সম্পূর্ণ নতুন। কবিই প্রথম বললেন যে ঈশ্বর ত্রাণকর্তা—"অপার মহিমা তব শুনি পুরাণে।/যার চিন্তামণি-চিন্তা অন্তরে, তার কি চিন্তা মরণে?— যে জন কৃষ(বলে একবার, অতুল্য অমূল্য কৈবল্য হয় তার/...ভক্তি(ভব জলধি জলে হয় পার।।"

যে যুগে স্বদেশপ্রেম একেবারেই অপরিজ্ঞাত ছিল, বৃটিশ শাসনে বাঙালির জাতীয় চৈতন্য যখন সুপ্তিমগ্ন, সেই সময় ঈশ্বর গুপ্ত লিখলেন—

দেশের দা(ণ দুখ দেখিয়া বিদরে বুক,
চিন্তায় চঞ্চল হয় মন।
লিখিতে লেখনী কাঁদে ম্লানমুখ মসী ছাঁদে
শোকঅশ্রু করে বরিষণ।।

"এই কণ্ঠস্বর বাংলা কাব্যে সম্পূর্ণ অভিনব।" নিজের জীবনের দুঃখের সঙ্গে দেশজননীর নির্যাতন মিলিয়ে এক অপূর্ব গীতিমূর্ছনা সৃষ্টি করেছেন বলেই ঈশ্বর গুপ্ত 'was the reigning king of literary world in his day. চিৎকারপ্রিয় পদ্য লেখক সাংবাদিক ঈশ্বর গুপ্ত ও কবি ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব ছিল। এই দ্বন্দ্বের অবসানে ঈশ্বর গুপ্তের কবিমন কবিতার মর্মবাণী উচ্চারণে স(মতার পরিচয় দিয়েছে। সমাজচেতনা ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার একটি প্রধান ধারা। যে কোনো আদর্শবাদী সমাজমনস্ক মানুষের মতো ইতিবাচক মনোভাব থেকে সমকালীন ইঙ্গ বঙ্গীয়দের উচ্ছৃঙ্খলাকে তিনি সমর্থন করতে পারেননি—ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে তাদের বিদ্ধ করেছেন। তিনি যখন লেখেন—

যত কালের যুব, যেন সুবো
ইংরেজী কয় বাঁকাভাবে।
ধরে গু(পু(ত মারে জুতো
ভিখারী কি অন্ন পাবে?

—এর মধ্যে আছে নবযুবদের প্রগতির নামে যথেচ্ছাচারের বি(দ্ধে প্রতিবাদ—আবার স্ত্রীশি(ার (ে ত্রে বাড়াবাড়ি দেখে তিনি লিখেছেন

যত ছুঁড়ীগুলো তুড়ী মেরে
কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে
তখন 'এ, বি' শিখে বিবি সেজে
বিলাতী বোল কবেই কবে।

সমাজচেতনা থেকেই কবির দেশাত্মবোধের জন্ম। তিনিই প্রথম জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি সম্ভ্রম এবং মাতৃভাষার প্রতি ভালবাসা থেকে বলেছেন,

কত রূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া!

কখনও কখনও তিনি তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে বৃটিশ শাসনব্যবস্থার প্রতি তী(্ণ কষাঘাত করেছেন—

তুমি মা কল্পত(আমরা সব পোষা গ(
শিখিনি সিং বাঁকানো।
কেবল খাব খোল বিচিলি ঘাস।

* * * * *

আমরা ভুষি পেলেই খুশি হব

ঘুষি খেলে বাঁচব না।।

এই সমস্ত রচনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর গুপ্ত আধুনিক বাংলা কাব্যে খণ্ড কবিতার একটি নতুন ধারা প্রবর্তন করেছেন। তার মধ্যে আবেগ (emotion) ও কল্পনাশক্তি(র (imagination) কিঞ্চিৎ অভাব থাকায় গীতিকবির যে তন্ময়তা যাকে 'লিরিসিজম' বলে তা না থাকলেও ঈশ্বর গুপ্তই আধুনিক কবিতার প্রে(াপট রচনা করে দিয়েছেন বলা যায়। প্রসঙ্গত, বাংলা কাব্যের বিকাশে ঈশ্বর গুপ্তের আর একটি অবদানের কথা স্মরণ করতে হয়। তিনিই প্রথম 'সংবাদ প্রভাকরে' নতুন কাব্যপ্রতিভা আবিষ্কারে উদ্যোগী হন। অসীম সাহিত্যপ্রীতি থেকেই ত(ণ কবিদের আত্মপ্রকাশের সুযোগ করে দিয়ে তিনি অসামান্য অবদান রেখেছেন। কবিতার মধ্য দিয়ে বাদানুবাদের সৃষ্টি করে নব্য কবিরা ঈশ্বর গুপ্তের পৃষ্ঠপোষণায় 'কলেজীয় কবিতাযুদ্ধ' শীর্ষকে তাঁদের পারস্পরিক মতবিনিময় করতেন। এই কবি দলে যাঁরা আশ্রয় পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র ও দ্বারকানাথ অধিকারী স্মরণীয়।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (1827-1887) আধুনিক ইংরেজি শি(ত রঙ্গলাল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে ভালবেসে কাব্যচর্চার অনুরক্ত(হয়ে পড়েন। এই বাংলা সাহিত্যপ্রীতি থেকেই তিনি বাংলা সাহিত্যের বিরূপ সমালোচনার উত্তরে বীট্ন সোসাইটিতে 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' (1851) পাঠ করেন। 'পদ্মিনী উপাখ্যান' (1858), 'কর্মদেবী' (1832), 'শূর সুন্দরী' (1868) এবং 'কাঞ্চীকাবেরী' (1879) রচনা করে বাংলা কাব্যকে শি(ত সমাজের শ্রদ্ধার বস্তু করে তোলেন। তাঁর এই কাব্যগুলি প্রধানত ইতিহাস, পুরাবৃত্ত ও জনশ্রুতি অবলম্বনে প্রণয়-রস প্রধান রোমান্টিক আখ্যানকাব্য।

রঙ্গলালের আখ্যানমূলক কাব্যের রোমান্টিক ধারা একদিকে যেমন গীতিকবিতার প্রেরণা, তেমনি পরবর্তী 'মহাকাব্য' রচনার অন্যতম প্রেরণা বলা যেতে পারে। 'পদ্মিনী উপাখ্যানে' স্বদেশপ্রীতির উদ্দীপনাময় আবেগ, মনন প্রধান গাঢ়বদ্ধতা মধ্যযুগের দেবপ্রশস্তিমূলক কাব্যের গণ্ডী থেকে আধুনিক যুগের বিস্তৃততর কাব্য পরিধির দিকে ফিরে এসেছে। সম্ভবত এই প্রচেষ্টা মধুসূদন দত্তকে তাঁর মৌলিক পথ আবিষ্কারে অনেকটা উৎসাহিত করেছিল।

'পদ্মিনী উপাখ্যান' টডের 'রাজস্থান' অবলম্বনে রচিত এবং ''স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়'' প্রভৃতি পঙ্ক্তি(এক সময় মুক্তি(-সংগ্রামী বাঙালির বীজমন্ত্র ছিল। প্রাচীন কাব্যের কোথাও স্বদেশপ্রীতির কথা ছিল না। এ কাব্যের এটিই নূতনত্ব। তাঁর 'কর্মদেবী' ও 'শূর সুন্দরী' রাজপুত ইতিহাসের কাহিনী নিয়ে রচিত। উড়িষ্যায় জনশ্রুতিমূলক কাহিনীর আশ্রয়ে 'কাঞ্চীকাবেরী' ছাড়াও তিনি কালীদাসের 'কুমারসম্ভবে'র আংশিক অনুবাদ করেছিলেন।

রঙ্গলাল সম্ভবত অনুভব করেছিলেন কাব্যরচনায় মধ্যযুগের 'মঙ্গলকাব্যে'র অনুসরণ যেমন নয়, তেমনি ঈশ্বর গুপ্তীয় খণ্ড কবিতাতেও বাংলা কাব্যের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হবে না, তাই পদ্মিনী আখ্যানের পথ ধরেই অগ্রসর হতে চেয়েছিলেন। বাংলা কাব্য রচনায় ইংরেজি রোমান্টিক কাব্যধারাই যে দিগদর্শক হবে, তা তিনি বুঝেছিলেন। রোমান্টিক কাব্য রচনার এই বাতাবরণটিই স্বতন্ত্র ভাবে-রূপে বিহারীলাল ও তাঁর অনুসারীদের গীতিকবিতায় আত্মপ্রকাশ করেছে।

11.7 সারাংশ (দ্বিতীয় অংশ)

. সাংবাদিক ঈশ্বর গুপ্ত পত্রিকার প্রয়োজনেই কাব্যরচনা করেন। প্রথাসিদ্ধ পদ্য লেখার পরিবর্তে সাময়িকতার ল(ণাত্র(ান্ত তাঁর কবিতাজগৎ জীবনাশ্রয়ী। দেশ-কাল সচেতন নানা বিষয় নিয়ে তিনি পাঠ্য কবিতা রচনা করেন। তাঁর কবিতায় ভাবাবেগ ও জীবনবোধের গাঢ়তার কোনো পরিচয় নেই(আছে জীবনের উপরিতলকে আস্রয় করে নানা রঙ্গ-ব্যঙ্গাত্মক উপস্থাপনা। কবি-সাংবাদিক ঈশ্বর গুপ্ত উনিশ শতকের প্রথমার্ধে একাধিপত্য করলেও এ সময়ের রোমান্টিক জীবনাবেগের যে তরঙ্গবি(প বাঙালির চিত্তলোককে উদ্বেল করছিল তা ধারণ ও প্রকাশ করবার মত শক্তি(তাঁর ছিল না। রঙ্গলাল এই পালাবদলের সুরটি বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি রোমান্টিক আখ্যানকাব্যে তাকে প্রাথমিকভাবে আশ্রয় দিলেন। তাঁর পদ্মিনী কর্মদেবী, শূর সুন্দরী রাজস্থানের বীরগাথা নিয়ে লেখা। কাঞ্চীকাবেরী উড়িষ্যার কিংবদন্তী অবলম্বনে রচিত। ইংরেজি কাব্য এ(ত্রে তাঁর প্রধান প্রেরণা। সেখান থেকেই তিনি পদ্মিনীর স্বদেশপ্রেমের বাণী আহরণ করেছিলেন। মধুসূদনের তিলোত্তমা, মেঘনাদবধ এরই পরিণত ও স(ম অনুসরণ।

11.8 অনুশীলনী 2

নীচের প্র(ের উত্তর দিন। পরে 165 পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

1. সঠিক উত্তরে টিক চিহ্((✓) দিন।

(ক) সংবাদ প্রভাকরের প্রকাশ	1831, 1818, 1843
(খ) পদ্মিনী উপাখ্যান প্রকাশ	1856, 1862, 1858
(গ) বীট্ন সোসাইটিতে বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক পাঠ করেন	1858, 1852, 1860
(ঘ) 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়'— কোন কাব্যের পঙ্ক্তি(	কাঞ্চীকাবেরী, হিত প্রভাকর, পদ্মিনী উপাখ্যান

2. শূন্যস্থান পূর্ণ ক(ন

(ক) ঈশ্বর গুপ্তই সর্বপ্রথম ..... বাঙালিকে ..... দী(া দিয়েছেন।

(খ) বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, ঈশ্বর গুপ্ত ..... ঈশ্বর গুপ্ত ..... (তিনি) আপন সময়ের ..... ছিলেন।

(গ) যত ছুঁড়ীগুলো
..... হাতে নিচ্ছে যবে
তখন ..... সিখে ..... সেজে
..... বোল কবেই কবে।

3. (ক) ঈশ্বর গুপ্ত রচিত দুটি বইয়ের নাম লিখুন।

(খ) পদ্মিনী উপাখ্যানের কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপর দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম উল্লেখ ক(ন।

(গ) রঙ্গলালের রাজপুত ইতিহাস অবলম্বনে রচিত কাব্যগ্রন্থগুলির নাম উল্লেখ ক(ন।

(ঘ) উড়িষ্যার জনশ্রুতি নিয়ে লেখা .....র কবি .....।

(ঙ) তুমি মা ..... আমরা সব .....
শিখিনি .....।
কেবল খাব ..... ঘাস।

(চ) রঙ্গলাল কালিদাসে ..... অংশটি অনুবাদ করেছিলেন।

4. (ক) ঈশ্বর গুপ্ত রচিত দুটি বইয়ের নাম লিখুন।
(খ) পদ্মিনী উপাখ্যানের কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপর দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম উল্লেখ ক(ন।
(গ) রঙ্গলালের রাজপুত ইতিহাস অবলম্বনে রচিত কাব্যগ্রন্থগুলির নাম উল্লেখ ক(ন।
(ঘ) আধুনিক বাংলা কবিতায় ঈশ্বর গুপ্তের অবদান সম্পর্কে সং(পে আলোচনা ক(ন।

11.9 উত্তর সংকেত

11.5 অনুশীলনী 1

1. (ক) আরাকান, সাংস্কৃতিক, জগতে, পরিবর্তন।
(খ) লোরচন্দ্রানী, আলাওলের, মানবিক, দিগন্তের।
(গ) অনুবাদ, মঙ্গল, বৈষ(ব।
(ঘ) রাধাকৃষ(, উমাসঙ্গীত, শ্যামাসঙ্গীত, ভক্তি(রসের।
(ঙ) খ্যাতির, রাম বসু, ভোলা ময়রা, অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি, দাশু রায়।
2. সং(প্ত পরিচয়ের উত্তর সংকেত নিষ্প্রয়োজন।
3. উত্তর সংকেত নিষ্প্রয়োজন।

11.8 অনুশীলনী 2

1. (ক) 1831, (খ) 1862, (গ) 1852, (ঘ) পদ্মিনী উপাখ্যান।
2. (ক) তাঁর কবিতায়, দেশপ্রেমের।
(খ) Realist, Satirist, অগ্রবর্তী।
(গ) তুড়ী মেরে, কেতাব, এ. বি., বিবি. বিলাতী।
(ঘ) 'কাঞ্চীকাবেরী'র, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
(ঙ) কল্পত(, পোষা গ(, সিং বাঁকানো, খোল বিচালী।
(চ) 'কুমারসম্ভবে'র।
3. উত্তর সংকেত নিষ্প্রয়োজন।

11.10 গ্রন্থপঞ্জি

1. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড) ড. সুকুমার সেন।
2. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (তৃতীয় খণ্ড) ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
3. বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস ড. (ত্র গুপ্ত।

একক 12 ❑ আধুনিক বাংলাকাব্য

গঠন

12.1 উদ্দেশ্য
12.2 প্রস্তাবনা
12.3 মূলপাঠ (প্রথম অংশ) আখ্যানকাব্য
12.4 সারাংশ (প্রথম অংশ)
12.5 অনুশীলনী 1
12.6 মূলপাঠ (দ্বিতীয় অংশ) মহাকাব্য
12.7 সারাংশ (দ্বিতীয় অংশ)
12.8 অনুশীলনী 2 (আখ্যানকাব্য-মহাকাব্য একত্রে)
12.9 মূলপাঠ (তৃতীয় অংশ) গীতিকবিতা
- **12.9.1** মাইকেল মধুসূদন দত্ত
- **12.9.2** হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
- **12.9.3** নবীনচন্দ্র সেন
- **12.9.4** বিহারীলাল চত্র(বর্তী
- **12.9.5** সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার
- **12.9.6** গোবিন্দচন্দ্র দাস
- **12.9.7** দেবেন্দ্রনাথ সেন
- **12.9.8** অ(য়কুমার বড়াল
- **12.9.9** দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
- **12.9.10** দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
- **12.9.11** মহিলা কবিগোষ্ঠী

12.10 সারাংশ (তৃতীয় অংশ)
12.11 অনুশীলনী 3
12.12 উত্তর সংকেত
12.13 গ্রন্থপঞ্জি

12.1 উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি—

- উনিশ শতকের আধুনিক বাংলা কাব্যের প্রধান কবি ও কাব্য সম্পর্কে বিশদ পরিচয় পাবেন।
- আলোচ্য বিষয়—আখ্যানকাব্য, মহাকাব্য ও গীতিকাব্য—এই তিনটি অংশে বিভক্ত(করা হয়েছে তাদের প্রকৃতি ও গঠনগত বৈশিষ্ট্যের দিকে ল(্য রেখে। সে সম্পর্কে ধারণা জন্মাবে।

- একটি পড়ে আপনি বাংলা কাব্যের কয়েকজন বড় কবির সম্পর্কে জেনে, নিজেও সে সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

12.2 প্রস্তাবনা

যুগসন্ধিপর্বে ইংরেজাধিকার ও রাজনৈতিক (মতার পুনর্বিন্যাস দেশ-কাল-সমাজ ও অর্থনীতি তথা সমগ্র সাংস্কৃতিক জগতে নীরব বৈপ-বিক পরিবর্তন সূচিত হয়। মধ্যযুগীয় ধর্মীয় সংস্কার ধীরে ধীরে অপসৃত হল। বাঙালির জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে নূতন বোধ সঞ্চারিত হচ্ছে, এ পরিচয় ত্র(মান্বয়ে কবিওয়ালাদের রচনা—ঈ(র গুপ্তের কবিতা ও বঙ্গলালের আখ্যানমূলক কবিতায় স্পষ্টতর হয়েছে। বাঙালি নব্যপাঠক এটি উপলব্ধি করতে শু(করেছেন যে, মধ্যযুগের দেবপ্রশস্তিমূলক কাব্যের গণ্ডী থেকে উনিশ শতকের আধুনিক জীবন ভাবনার দিকে বাঙালির কবি-মনীষা ত্র(মশ অগ্রসর হচ্ছে। আর এখান থেকেই আধুনিক বাংলা কাব্যের মুক্তি(বলা যায়। এ সম্পর্কেই বর্তমান এককে তিনটি অংশে আলোচনা করা হয়েছে। তিনটি যথাত্র(মে আখ্যানকাব্য, মহাকাব্য ও গীতিকাব্য। প্রত্যেক অংশেই প্রধান কবি ও তাঁদের কাব্যের সাধারণ পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

12.3 মূলপাঠ (প্রথম অংশ) আখ্যানকাব্য

মধ্যযুগের আখ্যানমূলক কাব্য ছিল মূলত পৌরাণিক দেব-দেবী বা অ-পৌরাণিক দেবতার পুরাণিকৃত রূপের মহিমা প্রচারমূলক। একদিকে সমকালীন শাসক সম্প্রদায়ের বি(দ্ধে মানসিক শক্তি(সঞ্চার ও অপরদিকে দেবতার চরণাশ্রয়ে পার্থিব স্বস্তি, স্থিতি ও স্বাচ্ছন্দ্যলাভ— এ ছিল কাব্য রচনার প্রেরণাস্থল। তাই এ মঙ্গল-দেবতা বাঙলার মাটিতে সৃষ্ট এক অভিনব দেবকল্পনা। এখানে বাঙলার অনার্য-সংস্কৃতির প্রভাবে স্ত্রীদেবতার প্রাধান্য। বাঙালির সমাজ ও পরিবারজীবনে যে নারীপ্রাধান্য ল(্য করা যায়, তার সঙ্গে এ দেবতারাও যেমন মান্যতা পেয়েছে, চরিত্র পরিকল্পনায়ও তেমনি বেহুলা, ফুল্লরা, লহনা-খুল্লনা, কানড়া-ই সমধিক ঔজ্জ্বল্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ কাব্যের কাহিনী প্রধানত বাঙালির জীবন-অভিজ্ঞতা আশ্রয়ী। পরে মুসলমান রাজশক্তি(র চাপে আত্মর(ার তাগিদ থেকে উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজের ভক্তি(বাদ দৈবানুগ্রহের ওপর নির্ভরতার সূত্রে এ কাব্যের দেবতাদের অলৌকিক কৃৎ-কর্ম যুক্ত(হয়। ফলে, দেবতার সন্তোষ-অসন্তোষের ওপর মানুষের শুভাশুভ নির্ভরশীল, পু(ষকার নয়— দৈবই সর্বশক্তি(মান, এ প্রত্যয় সৃষ্টি হয়।

যুগসন্ধিকালে ঈ(র গুপ্তের ভাবশিষ্য হলেও ইংরেজি শি(ায় শি(িত রঙ্গলাল ঈ(র গুপ্তের ইতিহাস চেতনা ও স্বদেশ প্রেমের সূত্র ধরেই সাহিত্য পথ-পরিত্র(মা করলেও ইংরেজি রোমান্টিক প্রণয়মূলক কাহিনীকাব্যের অনুসরণে কাব্য রচনায় ব্রতী হলেন। তাঁর কাব্যের উপকরণ হিসেবে তিনি কল্পিত উপকরণের পরিবর্তে দেশপ্রচলিত ইতিহাস বা কিংবদন্তীর থেকে উপাদান নিয়ে রোমান্টিক প্রণোয়োপাখ্যানের সঙ্গে স্বদেশ প্রেমের ভিয়েন দিয়েছেন। নব্যশি(িত বাঙালির অবচেতনায়ও এ সময় পাইক-কোল-সাঁওতাল প্রভৃতি বিদ্রোহ ও আন্দোলনের ফলে, পরাধীনতার গ-ানিও সঞ্চারিত হতে শু(করেছে। টডের 'রাজস্থান' এতে সমিধ জোগায়। ইংরেজি শি(িত প্রথম বাঙালি কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় টডের গ্রন্থ অবলম্বনে রাজস্থানের বীরগাথার সাহায্যে 'পদ্মিনী উপাখ্যান'-এ বাঙালির দেশগৌরববোধ প্রকাশে উদ্যোগী হলেন। এতে টমাস মূরের প্রত্য(প্রভাব ছাড়াও

সেক্সপিয়র-স্কট-বায়রন প্রভৃতি ইংরেজি রোমান্টিক কবিদের কিছু প্রভাব আছে। এভাবে 'পদ্মিনী উপাখ্যান', 'কাঞ্চী-কাবেরী', 'শূরসুন্দরী' প্রভৃতি আধুনিক বাংলা কাব্যে রঙ্গলাল আখ্যান কাব্যের ধারা সূচনা করেছেন। পরবর্তীকালে মধুসূদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র প্রভৃতি অনেক কবি এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

'পদ্মিনী উপাখ্যান' (1858) টডের Annals and Antiquities of Rajasthan থেকে আলাউদ্দীন কর্তৃক চিতোর অবরোধ ও পদ্মিনীর স্বীয় সতীত্ব র(ার জন্য চিতায় আত্মবিসর্জনের মহিমময় কাহিনী নিয়ে রচিত। পদ্মিনীর শৌর্যবীর্য প্রতিপাদক এই কাহিনী ঐতিহাসিক পরিবেশে উপস্থাপিত হওয়ায় একটি বলিষ্ঠ জীবনবোধ প্রকাশিত হয়েছে। রচনায় কোথাও কোথাও আধুনিক কবি মনের পরিচয় পাওয়া গেলেও রঙ্গলাল সর্বত্র সেটি অনুসরণ করতে পারেননি। বীররসের বর্ণনায় তিনি অনেক (ে ত্রে ভারতচন্দ্রীয় প্রভাব কাটাতে পারেননি। 'কর্মদেবী' (1852) ও 'শূরসুন্দরী' (1868) রাজস্থানীয় কাহিনী। 'কর্মদেবী' পদ্মিনী উপাখ্যানের চেয়ে বেশি বর্ণময়। রঙ্গলালের দেশপ্রেমের আদর্শ 'কর্মদেবী'তে স্পষ্টতর। উড়িষ্যার ইতিহাসের এক রোমান্টিক কাহিনী নিয়ে 'কাঞ্চী-কাবেরী' (1879) রচিত। কর্মসূত্রে উড়িষ্যা বাসকালে রঙ্গলালের ওড়িয়া কবি পু(ষোত্তম দাসের কাব্যের সঙ্গে পরিচয় হয়। রঙ্গলাল ঐ কাব্যটি অবলম্বনে সাত সর্গে তাঁর 'কাঞ্চী-কাবেরী' রচনা করেন। কোনো কোনো সর্গে মূলের অনুসরণ করলেও, রঙ্গলাল দু'-তিনটি সর্গে মৌলিকতার স্বা(র রেখেছেন। এই কাব্যের যুদ্ধ বর্ণনা অংশে রাজপুত কাহিনীর প্রভাব আছে। আদি কাব্যে ভক্তি(ভাবের প্রাচুর্য ছিল, রঙ্গলালের কাব্যটি রোমান্টিক প্রণয়মূলক হওয়ায় ভক্তি(ভাব অনেকটা তরল। ভাষা সরল ও ছন্দপ্রবাহ সুললিত।

আখ্যানমূলক কাব্যধারায় রঙ্গলালের অভিনবত্ব পাঠকের (চি পরিবর্তন ঘটালেও যুগান্তর আনতে স(ম হয়নি। তিনি নবজীবনোপলব্ধির মর্মস্থানটি স্পষ্ট করতে পারেননি বটে কিন্তু বাংলা কাব্যসাহিত্যকে ভারতচন্দ্রীয় আদিরস, কবিওয়ালাদের স্থূল রঙ্গরসিকতা এবং ঈশ্বর গুপ্তের পদ্যের হাত থেকে র(া করে স্বাদেশিকতা ও বীররসাত্মক উপাখ্যান পরিবেশনে উদ্যোগ নিয়েছেন।

পরবর্তীকালে এই ধারা অনুসরণে রচিত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (1838-1903) 'বীরবাহু কাব্য' (1864), নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' (1875), 'রঙ্গমতী' (1880) অসংযত আবেগোচ্ছ্বাসে, স্বদেশপ্রেম অনেকটা রোমান্স রসাচ্ছন্ন। 'পলাশীর যুদ্ধ' ইতিহাসের সন্ধি(ণের ঘটনাত্র(মকে অবলম্বন করে রচিত। এতে স্বাদেশিক মনোভাব মহৎ বীর্যের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। বিষয়বস্তুর (ে ত্রে রঙ্গলাল-হেমচন্দ্রের রাজস্থানী ও পৌরাণিক কাহিনীর পরিবর্তে এ এক সম্পূর্ণ অভিনব আয়োজন। শতাব্দী-প্রাচীন ঘটনা হলেও সমকালের বাঙালি মানসে এটি অনেকটা জীবন্ত ঘটনা। ষড়যন্ত্র ও বি(্বাসঘাতকতার মধ্য দিয়ে ইংরেজের জয় সত্ত্বেও দেশপ্রেমিক মোহনলালের অসামান্য বীরত্ব স্বদেশপ্রেমী বাঙালির মনে নতুন শক্তি(সঞ্চার করেছিল। নবীনচন্দ্র 'পলাশীর যুদ্ধ' রচনার মাধ্যমে দেশের পরাধীনতার যে মর্মবেদনা ধ্বনিত করেছেন তা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর বিশিষ্টতার পরিচায়ক। তাঁর অপর রচনা 'রঙ্গমতী' চট্টগ্রামের রাঙামাটি অবলম্বনে একটি কাল্পনিক কাহিনী। এখানে শিবাজীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে কবি কাব্যটিতে স্বাদেশিকতার বাতাবরণ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। অন্যান্য বিষয়ে আখ্যানকাব্য রচনা করে যাঁরা জনপ্রিয় হয়েছিলেন তাঁরা হলেন অ(য়চন্দ্র চৌধুরী। ('উদাসিনী'—1874) এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ('স্বপ্নপ্রয়াণ'—1875)। শেষোক্ত(টি স্পেন্সারের ফেয়ারি কুইনের আদর্শে রূপকধর্মী আখ্যানকাব্য। ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'যোগেশ' (1880) একটি উৎকৃষ্ট রোমান্সধর্মী আখ্যানকাব্য। আখ্যানকাব্য রচয়িতাদের মধ্যে যে আবেগ, উচ্ছ্বাস ও রোমান্টিক মনোভঙ্গি সত্রি(য় ছিল সেটিকে মধুসূদনের কবিব্যক্তি(ত্ব ও শিল্পচেতনা একদিকে মহাকাব্য ও অপরদিকে গীতিকাব্যের ধারায় সঞ্চালিত করে। ফলে, আখ্যানকাব্যের স্রোত ত্র(মশ মন্দীভূত হয় এবং গীতিকাব্যের ত্র(ম প্রতিষ্ঠা ঘটে।

12.4 সারাংশ (প্রথম অংশ)

রঙ্গলাল আধুনিক শি(ায় শি(িত। তথাপি নূতন জীবনাদর্শের গভীরে যেতে পারেননি। ইংরেজ রোমান্টিক আখ্যানকাব্যে অনুরক্তি(থেকে বাংলায় পদ্মিনী, কর্মদেবী, শূরসুন্দরী রাজস্থানের বীরগাথা অবলম্বনে লিখেছেন। কাঞ্চী-কাবেরী উড়িষ্যার প্রাচীন কাহিনীনির্ভর। এগুলিতে তাঁর স্বদেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। কাব্যের গঠন, বর্ণনা—ভাষারীতিতে তিনি পূর্বসূরীদের অনুসরণ করেছেন। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের বীরবাহু এবং পলাশির যুদ্ধ ও রঙ্গমতী অসংযত আবেগোচ্ছ্বাসে ভারাত্র(ান্ত। পলাশির যুদ্ধে নানা হীন চত্র(ান্তের মধ্যে দেশপ্রেমিক মোহনলালের বীরত্ব স্বদেশপ্রেমী বাঙালির মনে আশার সঞ্চার করেছিল। অন্যান্য আখ্যানকাব্যের মধ্যে অ(য় চৌধুরীর 'উদাসিনী', ঈশান বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'যোগেশ' এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্নপ্রয়াণ'-রূপক কাব্য উল্লেখযোগ্য।

12.5 অনুশীলনী 1

নীচের প্র(গুলির উত্তর ক(ন। উত্তর করা হলে 179 পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

1. নীচের দুই সারিতে কাব্য এবং প্রকাশকাল দেওয়া আছে। সঠিকটিকে চিহ্নি(ত ক(ন

(ক) পদ্মিনী উপাখ্যান	1868
(খ) শূরসুন্দরী	1864
(গ) 'বীরবাহু' কাব্য	1880
(ঘ) রঙ্গমতী	1858
(ঙ) স্বপ্নপ্রয়াণ	1875

2. সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন

(ক) 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যের প্রকাশ কাল	1875, 1858, 1860
(খ) 'কর্মদেবী' কাব্যটি লেখেন	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
(গ) অ(য় চৌধুরীর 'উদাসিনী'	গীতিকাব্য, আখ্যানকাব্য, নাটক।

3. (ক) আধুনিক বাংলা সাহিত্যে 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যের অবদান সংক্ষে(পে আলোচনা ক(ন।
   (খ) প্রথম অংশে বাংলা আখ্যানকাব্যের যে প্রধান বিষয়গুলি আপনার নজরে এসেছে সে সম্পর্কে আলোচনা ক(ন।

12.6 মূলপাঠ (দ্বিতীয় অংশ) মহাকাব্য

পলাশির পর কোম্পানির ও পরে ভিক্টোরিয়ার শাসনের মধ্য দিয়ে বাঙালির জনজীবনে যে প্রত্য(অভিজ্ঞতা সঞ্চারিত হচ্ছিল, তার সবটাই অনুকূল ছিল না। একশ্রেণীর মানুষ এ সময় বিদ্যা-বিত্তের মহার্ঘ সুযোগ পেয়ে যেমন সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠছিল তেমনি দেশের অগণিত মানুষ ইংরেজের শোষণ ও শাসনে রীতিমত জর্জরিত হয়ে উঠেছিল। তাঁদের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের প্রয়াস শাসকসমাজকে বিব্রত রেখেছে। এ সমস্ত ঘটনার মধ্য দিয়েও যে

বিষয়গুলি ল(ণীয় হয়ে উঠছিল, তা হল মধ্যযুগীয় দৈবনির্ভর ধ্যান-ধারণার পরিবর্তে বাঙালি ত্র(মশ মর্ত্যজীবন সম্পর্কে, সচেতন হয়ে উঠেছে। মাটি-মানুষ, জগৎ-জীবন সম্পর্কে এই সচেতনা থেকেই জীবন-জীবিকার প্রয়োজনবোধ, শি(া-সংস্কৃতিচর্চার প্রেরণা ত্র(মশ দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

রামমোহন-বিদ্যাসাগরের কর্মমহাযজ্ঞ তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। পাশ্চাত্য শি(া, সনাতনী শি(াব্যবস্থার আধুনিকীকরণের তাগিদ এ বোধ থেকেই এসেছে। এই আধুনিক মন-মননের ফলেই স্বদেশ-স্বজনবোধ, পু(ষের মতই নারী-ব্যক্তি(ত্ব ও তার মর্যাদার স্বীকৃতি সমাজসংস্কার ও রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ত্র(মশ ঘটেছে। দেশ ও সমাজের ধ্যান-ধারণার এই আমূল পরিবর্তন সমাজ-সংস্কৃতিতে যে যুগান্তর সৃষ্টি করে প্রধানত মহাকাব্যই তাকে ধরে রাখতে স(ম। কেননা মহাকাব্য জীবনকে সমগ্রত প্রকাশ করে। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্ত(ব্য প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে "যাহার রচনার ভিতর দিয়া একটি সমগ্র দেশ একটি সমগ্র যুগ আপনার হৃদয়কে আপনার অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত(করিয়া তাহাকে মানবের চিরন্তন সামগ্রী করিয়া তুলে" সেই শ্রেণীর কবিকে মহাকবি এবং তার কাব্যকে মহাকাব্য বলা যায় কিন্তু পূর্বে আলোচিত আখ্যান কাব্যের মধ্যে কিছু নূতন বিষয়ের, এমন কি কিঞ্চিৎ সামাজিক-রাজনৈতিক প্রে(াপট ফুটে উঠলেও সমাজের জীবনের সমগ্র রূপ প্রতিভাত হয়নি।

মধুসূদন তাঁর অসামান্য কবি-প্রতিভায়, যুগজীবনের এই মহিমময় রূপকে মহাকাব্যের আঙ্গিকে ফুটিয়ে তুলতে তাঁর 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্য (1860) ও 'মেঘনাদবধ কাব্য' (1861) রচনা করেন। 'তিলোত্তমা'য় তিনি বাংলা কবিতায় প্রচলিত কাব্যভাষা ও ছন্দের মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়ে এক নূতন যুগের প্রবর্তন করেন। পয়ারের পদ্যবন্ধ থেকে মুক্ত(করে অমিত্রা(র ছন্দের জন্ম হল। কবিতায় এ হল নূতন অভিজ্ঞতা। তিলোত্তমার কাহিনী মহাভারত থেকে নেওয়া। এ কাব্যের দেবতারা দুই ভাইয়ের পারস্পরিক সৌহার্দ্য থাকায়, সুন্দ-উপসুন্দের কাছে পরাজিত হলে ব্রহ্মার সঙ্গে ইন্দ্রাদি দেবতারা দেখা করে স্বর্গোদ্ধারের প্রার্থনা জানান। সুন্দ-উপসুন্দের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করবার জন্য বি(কর্মা সর্বজগৎ থেকে তিল তিল করে সৌন্দর্য নিয়ে তিলোত্তমা সৃষ্টি করেন। পরিশেষে, তিলোত্তমার রূপ দর্শনে সুন্দ-উপসুন্দের দ্বন্দ্ব ও বিনাশ। শিল্প হিসেবে এটি দুর্বল রচনা হলেও মধুসূদন তিলোত্তমাকে কেন্দ্র করে যে সৌন্দর্য-চেতনা প্রকাশ করেছেন, তার সাহিত্যিক মূল্য সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রামায়ণের 'লঙ্কাকাণ্ডের লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিতের' যুদ্ধ এবং ইন্দ্রজিৎবধের কাহিনী অবলম্বনে মধুসূদন ন'টি সর্গে 'মেঘনাদবধকাব্য' সমাপ্ত করেন। মধুসূদনের তো বটেই, সমগ্র বাংলা সাহিত্যে এটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি। মধুসূদনের কবিমানস তাঁর রচনার দোষ-গুণ-ভাষার ভাল-মন্দ স্বদেশী-বিদেশী কাব্যঐতিহ্য গ্রহণের পরিমাণ ছন্দ-অলঙ্কারের শক্তি(-দুর্বলতা সব নিয়েই এ কাব্যটি যে ব্যাপক আলোড়ন তুলেছিল সে সমস্ত বিচার করে এটিকে ঊনবিংশ শতাব্দীর জাতীয় মহাকাব্য বলা যায়। তিলোত্তমায় সৃষ্ট অমিত্রা(র এখানে সার্থকতালাভ করেছে। মেঘনাদবধের কাহিনী বাল্মিকী ও কৃত্তিবাস অনুসরণে পরিকল্পিত হলেও চরিত্র ও ভাবাদর্শের দিক দিয়ে তিনি পুরোপুরি ভারতীয় ঐতিহ্য স্বীকার করেননি। পাশ্চাত্য মহাকবিদের আদর্শ অনুসরণে তিনি ট্রাজিক ল(ণাত্র(ান্ত মহাকাব্য রচনা করেছেন। গ্রিক সাহিত্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত কবি রাবণ চরিত্রকে নিয়তিতাড়িত দেখিয়েছেন। তিনি সূচনায় 'গাইব মা বীররসে ভাসি মহাগীত' বললেও কাব্যটি আদ্যন্ত ক(ণ রসাত্মক। আধুনিক জীবনবোধের প্রে(তে রাবণের শেষ পর্যন্ত এই মানসিক পরাভব যে মহাশূন্যের সৃষ্টি করেছে তা কাব্যটিকে একাধারে মহাকাব্য ও ট্র্যাজেডির অনন্যসাধারণ রূপদান করেছে।

'মেঘনাদবধকাব্য' তার সমকালে প্রতিকূল অনুকূল সমালোচনা সত্ত্বেও মধুসূদনের এই অসামান্য সৃষ্টি সে যুগেই বহু কবিকে মহাকাব্য রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। এঁদের মধ্যে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (1838-1903) ও নবীনচন্দ্র সেন (1847-1909) উল্লেখযোগ্য। হেমচন্দ্রের ও নবীনচন্দ্রের আখ্যানকাব্য সম্পর্কে ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। মধুসূদনের পরেই হেমচন্দ্র তাঁর 'বৃত্রসংহার' (প্রথম খণ্ড 1875, দ্বিতীয় খণ্ড 1877) কাব্যের জন্য কবিপ্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন। মধুসূদন রামায়ণী কাহিনী আশ্রয় করলেও রাম-লক্ষ্মণ চরিত্র পরিকল্পনায় সিদ্ধরসের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করায় হেমচন্দ্র পুরাণ ও ভক্তি(বাদের প্রতিষ্ঠায় অধিকতর মনোযোগী হন। তিনি পৌরাণিক বৃত্রসংহারের কাহিনীর সঙ্গে সমকালের স্বদেশবোধের পরিমণ্ডল যুক্ত(করে কাহিনীগত বিশালতা ও বর্ণনাগত সংহতি প্রদান করেছেন। এর ফলে 'বৃত্রসংহার' মহাকাব্যোচিত মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই কাব্যের চরিত্র পরিকল্পনায় মধুসূদনের প্রভাব পূর্বাপর ল(ণীয়। বৃত্র-রাবণ, ইন্দ্র-রামচন্দ্র, (দ্রপীড়-মেঘনাদ, জয়ন্ত-ল(ণ চরিত্রে মধুসূদনের প্রভাব থাকলেও, ঐন্দ্রিলা অনেকাংশেই মৌলিক সৃষ্টি। ভাষাছন্দ প্রয়োগেও হেমচন্দ্রের দুর্বলতা আছে। তাই বলা যায়, 'বৃত্রসংহারে'র আখ্যানভাগে মহাকাব্যিক মহিমা থাকলেও, সমগ্রতার বিচারে তিনি সিদ্ধিলাভ করতে পারেননি। প্রকৃতপ(হেমচন্দ্রের প্রতিভা গীতিকাব্য রচনার উপযুক্ত(, তিনি কিছু বিশুদ্ধ গীতিকবিতা রচনা করেছেন। গীতিকাব্য প্রসঙ্গে তার উল্লেখ করা হবে।

নবীনচন্দ্র 'ত্রয়ী' মহাকাব্যের রচয়িতা বলে সমধিক খ্যাত। তাঁর 'রৈবতক' (1887)—কৃষে(র আদিলীলা, 'কু(র(ক্ষে' (1893)—মধ্যলীলা এবং 'প্রভাস' (1896) অন্তিমলীলা নিয়ে রচিত। অন্যত্র তিনি বলেছেন, 'রৈবতককাব্যে উন্মেষ, কু(র(ক্ষে বিকাশ এবং প্রভাসে শেষ।' এই তিনটি কাব্যের উপাদান যেহেতু কৃষ(কে অবলম্বন করে এবং কাহিনীর মধ্যে একটি পরম্পরা আছে, তাই তিনটি কাব্যকে এখানে 'ত্রয়ী' কাব্য বলা হয়। কর্মসূত্রে পুরী ও রাজগীরে যাবার সময় তিনি কৃষ(জীবন অবলম্বনে মহাকাব্য রচনার কথা ভাবেন। তারই ফলশ্রুতি 'ত্রয়ী' মহাকাব্য 19 শতকের দেশ, সমাজ, নীতি ও দর্শনের প্রভাব এখানে ব্যাপক। সম্ভবত এ কারণেই বঙ্কিমচন্দ্র কাব্য ত্রয়ীকে "ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত" (The Mahabharat of the Nineteenth Century) বলে আখ্যাত করেছিলেন।

রৈবতকে সুভদ্রা-অর্জুনের বিবাহ—কু(র(ক্ষে এঁদের পুত্র অভিমন্যুর নিধন এবং প্রভাসে যদুবংশ ধ্বংস ও কৃষে(র দেহত্যাগ বর্ণনা করা হয়েছে। এই বিশাল-বিস্তৃত কাহিনীর মধ্যে পুরাণের ওপর রোমান্টিক কল্পনার ব্যাপক প্রভাব ল(্য করা যায়। 19 শতকের য়ুরোপীয় সমাজ-দর্শন, নীতিতত্ত্ব, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তত্ত্বচিন্তায় উদ্বুদ্ধ মানবসত্যে বি(্বাসী ছিলেন বলে, বৈদিক যাগযজ্ঞের বিরোধিতা করে গীতার নিষ্কামধর্ম প্রচার করেছেন। এর ফলে কাব্যত্রয়ীতে পৌরাণিক সত্যের অপলাপ ঘটায় কালানৌচিত্যদোষ-এর জন্য সঠিক সমাদর লাভ করেনি। তদুপরি তাঁর ভাষা ও ছন্দপ্রয়োগ বাচনভঙ্গি ও অসংযত উচ্ছ্বাসে মহাকাব্যের মহিমাচ্যুত হয়েছে। বস্তুত তাঁর প্রতিভা রোমান্টিক গীতিকবির প্রতিভা তাই মহাকাব্য রচনায় তেমন সার্থক হতে পারেননি।

মধুসূদনের থেকে (মেঘনাদবধ 1861), নবীনচন্দ্রের (প্রভাস 1896) রচনাকালের পরিসীমা এই পঁয়ত্রিশ বৎসরের মধ্যে। তার পরেও অনেক কবি মহাকাব্য রচনা করেছেন। যেমন বলদেব পালিত (কর্ণার্জুন কাব্য 1875) , ভুবনমোহন রায়চৌধুরী (পাণ্ডবচরিত কাব্য 1877), মধুসূদন জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু (পৃথ্বীরাজ 1322 সাল ও শিবাজী 1325 সাল)। কাব্যগুলিতে অলঙ্কার শাস্ত্র বা মধুসূদনের অনুসরণ প্রয়াস থাকলেও প্রতিভার অপ্রতুলতায় সার্থক হয়ে ওঠেনি। কিন্তু এ সময় কাব্য রচয়িতাদের গীতিপ্রাণতার ধারাটি রোমান্টিক ধারায় বর্ণনামূলক কাব্য রচনার পথ ধরেই ত্র(মে গীতি কবিতার প্রতিষ্ঠা ঘটেছে।

12.7 সারাংশ (দ্বিতীয় অংশ)

. পলাশির যুদ্ধের পর বাংলার যেমন রাজনৈতিক ও সামাজিক (ে ত্রে নবযুগের সূত্রপাত হয়েছে, তেমনি ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর (1760) বাংলা সাহিত্যেও নূতনত্বের সূচনা হয়েছে। কবি ঈ(রের গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশ ও সেখানে তাঁর নিজের ও ত(ণতর কবিদের আত্মপ্রকাশের সুযোগের মধ্য দিয়েই নতুন যুগের নতুন কবিভাবনা আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। বাংলা সাহিত্য ত্র(মশ নিজস্ব ঐতিহ্যের আবহাওয়াতেই নবযুগের মানসিকতার উপযোগী হয়ে ওঠে। সেই ধারার সূচনা করেন ঈ(রের গুপ্ত ও রঙ্গলাল।

যুগসন্ধির সমস্ত ল(ণ সত্ত্বেও রঙ্গলাল নবযুগের নতুন কবিতার সূচনায় বিশিষ্ট অবদান রেখেছেন। তাঁর 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাহিনী ও উপস্থাপনায় কতকগুলি নূতনত্ব এনেছে। মূর, বায়রন, শেলি প্রভৃতি পাশ্চাত্য রোমান্টিক কবিদের শিল্পিত রূপ বাংলা কাব্যে তিনিই প্রথম নিয়ে অসেন। পুরাণের পরিবর্তে ইতিহাস বিশেষত টডের 'রাজস্থান কাহিনী' তাঁর কাব্যের আখ্যানভাগের প্রথম আশ্রয় হয়েছে। আখ্যানকাব্যের এই ধারায় হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রমুখ কবিরাও বিচরণ করেছেন। আধুনিক বাংলা কাহিনী কাব্যে যে দুটি ধারার পরিচয় পাওয়া যায় তার মধ্যে অপে(াকৃত সফল মহাকাব্যের (ে ত্র প্রস্তুতিতে রঙ্গলালের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তিনি বাঙালি পাঠকের (চি পরিবর্তন এবং নূতন যুগের উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে অনেকাংশে সফল।

যুগন্ধর মধুসূদন স্বকীয় প্রতিভায় সাহিত্যিক মহাকাব্যের ধারাটির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র সেই পথেই বিচরণ করেছেন কিন্তু ততটা সফল হতে পারেননি। পরবর্তীকালে এদের যাঁরা অনুসরণ করেছেন তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেননি, যে, ব্যক্তি(হৃদয়ের গীতোচ্ছ্বাসের মুক্তি(গীতিকবিতায় এবং মধুসূদন ব্রজাঙ্গনা বীরাঙ্গনা এবং হেমচন্দ্রের কবিতাবলিতে তার সূচনা ঘটেছে।

12.8 অনুশীলনী 2 (আখ্যানকাব্য-মহাকাব্য একত্রে)

নীচেব প্র(গুলির উত্তর ক(ন। পরে 180 পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন

1. সঠিক উত্তরে টিক চিহ্((✓) দিন।

(ক) 'শূরসুন্দরী' কাব্যের রচয়িতা	1. মধুসূদন, 2. হেমচন্দ্র, 3. রঙ্গলাল
(খ) 'বীরবাহু' কাব্যের রচয়িতা	1. হেমচন্দ্র, 2. মধুসূদন, 3. নবীনচন্দ্র
(গ) 'রঙ্গমতী' কাব্য রচনা করেছেন	1. 1875, 2. 1858, 3. 1880
(ঙ) 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্যের রচনাকাল	1. 1858, 2. 1860, 3. 1862

2. শূন্যস্থান পূর্ণ ক(ন

(ক) _____বাংলার মাটিতে খ্রিস্ট এক _____দেবকল্পনা।

(খ) রঙ্গলালের কাব্য _____পরিবর্তন ঘটলেও _____আনতে স(ম হয়নি।

(গ) 'পলাশির যুদ্ধ' _____সন্ধি(ণের _____অবলম্বনে রচিত।

(ঘ) অ(য় চৌধুরী কাব্যের নাম _____ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্য _____।

(ঙ) ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ———— একটি উৎকৃষ্ট ————আখ্যানকাব্য।

(চ) ——— রচিত 'মেঘনাদবধ' কাব্য ——— সর্গে সমাপ্ত। কাব্যটি আদ্যন্ত———।

3. (ক) অমিত্রা(র ছন্দের সাধারণ ল(ণ সম্পর্কে সং(পে লিখুন।

(খ) 'ত্রয়ী' মহাকাব্য বলতে কী বোঝানো হচ্ছে আলোচনা ক(ন।

(গ) 'ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাকাব্য' মন্তব্যটি কার এবং কোনো কাব্য সম্পর্কে বলুন।

(ঘ) 'মেঘনাদবধ' কাব্য সম্পর্কে সং(পে আলোচনা ক(ন।

(ঙ) হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার' কাব্যের বিষয়বস্তু আলোচনা ক(ন।

(চ) নবীনচন্দ্রের 'ত্রয়ী' মহাকাব্যের খণ্ড ত্রয়ীর বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোকপাত ক(ন।

12.9 মূলপাঠ (তৃতীয় অংশ) গীতিকবিতা

গীতিকবিতা বলতে সাধারণত কাহিনীবর্জিত গীতিমূলক চোট কবিতা বোঝায়। এখানে কবির মনের জমে থাকা বা গড়ে ওঠা ভাব অভিব্যক্তি(লাভ করে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে বক্ত(ার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটন করা গীতিকাব্যের উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রনাথ একটিমাত্র ভাবের সংহত প্রকাশের মধ্যে গীতিকাব্যের ল(ণ দেখেছেন। সেখানে ভাষা, ছন্দস্পন্দ, উপমার স্বকীয়তা ও নূতনত্ব কবিঅনুভূত ভাবকে অভিনব রূপ দেয়। কিন্তু সেগুলি যদি আপে(ক নৈর্ব্যক্তি(কতায় প্রকাশিত হয় তবেই তা সর্বজনীন হয়ে ওঠে। ইংরেজ রোমান্টিক ও ফরাসি সিম্বলিস্ট এমনকী মিস্টিক কবিরা স্বকীয় নিবিড় অনুভব ও আবেগের সঙ্গে ধ্বনিবিন্যাসের সৌষম্যের যে আদর্শ রূপায়িত করেছেন, তাই পরবর্তীকালে গীতিকবিতা রচয়িতাদের আদর্শ হিসেবে মান্য হয়ে আসছে।

ভারতীয় প্রাচীন গীতিকাব্য বিশেষত ঋক ও অথর্ববেদের সংগীতগুলি আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন হলেও, সেগুলি মহিমান্বিত প্রাকৃতিক দৃশ্যেরই বর্ণনা। সংস্কৃত নাটক ও কাব্যে লৌকিক ভাবই প্রাধান্য পেয়েছে। বাংলা গীতিকাব্যের ঐ(র্য চর্যাগীতির যুগ থেকে পরিস্ফুট হয়েছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাহিনীকাব্যের বহুলাংশেই গীতি-উচ্ছ্বাস অভিব্যক্ত(। এই দেশী-বিদেশী গীতিময়তাকে অঙ্গীকার করেই মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বিহারীলাল, দেবেন্দ্রনাথ, অ(য়কুমার, রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বাংলা গীতিকাব্যকে সমৃদ্ধ করেছেন।

12.9.1 মধুসূদন দত্ত (1824-73)

'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনাকালেই মধুসূদন বন্ধু রাজনারায়ণকে লিখেছেন, "I think I have a tendency in the lyrical way"—সম্ভবত সেই মর্মগত গীতিব্যাকুলতা থেকেই তাঁর 'রাধাবিরহ' (রচনা 1860) নামান্তরে 'ব্রজাঙ্গনা' (1861) কাব্য হিসেবে প্রকাশিত হয়। হৃদয়পাশে বন্দিনী যে নারী অদৃষ্টের নির্যাতন সহ্য করে, তারাই এ কাব্যের নায়িকা। ভাগ্যবঞ্চিতা সীতা আর বল্লভ-বঞ্চিতা রাধা এখানে প্রেমময়ী নারীচিত্তের চির বঞ্চনার আর্তি প্রকাশে নিত্যকালের বাঙালি মনের প(নিরপে(আবেদনে সমৃদ্ধ। মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা' দেশকাল-নিরপে(চিরন্তন মানব হৃদয়ের আর্তিকেই প্রকাশ করেছে। মধুসূদন এ কবিতাগুলিকে ode (কাউকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলা) আখ্যাত করেছেন। 'ব্রজাঙ্গনা'র কবিতা মধুসূদনের এবং বাংলা সাহিত্যের প্রথম lyric বা গীতিকবিতা।

'বীরাঙ্গনা' (1862) ওভিদ (Ovid)-এর হেরোইডস্ (Heroides) অনুসরণে রচিত পত্রকাব্য। এখানে বিভিন্ন

নায়িকা তাদের স্বামী বা প্রিয়জনের উদ্দেশ্যে প্রেম উদ্বোধিত চিত্তে চিঠিগুলি রচনা করেছেন। রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণ থেকে এগারোটি নারীচরিত্র সংগ্রহ করে কবি তাদের দিয়ে কবিতা-পত্র রচনা করিয়েছেন। পত্র রচয়িতারা হলেন সোমের প্রতি তারা, দশরথের প্রতি কৈকেয়ী, নালধ্বজের প্রতি জনা প্রভৃতি। প্রত্যেক পত্রের রচয়িত্রী বীর পত্নী বা প্রণয়িনী। পত্রগুলি ভাবকেন্দ্রিক স্বয়ংসম্পূর্ণ, মুখ্য বিষয় আত্মমগ্ন রোমান্টিক প্রেম। এর ভাষা গীতিকবিতার অনুসারী। এখানে বীর, ক(ণ প্রভৃতি রসের সার্থক প্রয়োগ করেও কবি গীতিকবিতা সুলভ ললিতমধুর রসসৃষ্টিতেই অধিকতর সার্থকতা দেখিয়েছেন।

'বীরঙ্গনা' রচনার চার বছর পর বিলেত থেকে ফিরে মধুসূদন তাঁর শেষ কাব্যগ্রন্থ 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' (1866) প্রকাশ করেন। য়ুরোপীয় 'সনেটে'র অনুসরণে তিনি বাংলা কাব্যে 'চতুর্দশপদী কবিতা' প্রবর্তন করেন। বিদেশে বাসকালে বাল্য-কৈশোর-স্মৃতি, বাঙালির বারব্রত, পূজা-পার্বণ, দেশী-বিদেশী কবিদের স্মৃতি তাঁর কবিহৃদয়কে উদ্‌বোধিত করেছিল। তারই আন্তরিক তাড়নায় সনেটগুলির সৃষ্টি। এতদিন মহাকাব্য, নাটক ও পত্রাবলির মধ্যে কবির ব্যক্তি(জীবনের যে অন্তরঙ্গ অভিলাষ, আত্মরতির যে স্বচ্ছন্দ বিকাশ প্রকাশের সুযোগ পায় নি, সেগুলি সনেটের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।

12.9.2 হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (1838-1903)

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চিন্তা-তরঙ্গিনী' (1861) 'কবিতাবলী' (প্রথম 1870, দ্বিতীয় 1880) ও 'চিত্তবিকাশ' (1898) গীতিকাব্যের সংকলনগ্রন্থ। সতীর্থ শ্রীশচন্দ্র সেনের উদ্ধন্ধনে মৃত্যুতে শোকার্ত কবির বেদনা ভারাত্র(ান্ত হৃদয়ের অভিব্যক্তি('চিন্তা-তরঙ্গিনী'। এখানে চিন্তার চেয়ে আবেগ বেশি। রচনাভঙ্গিতে ঈ(রের গুপ্তের প্রভাব আছে। গীতিকবিতা রচনায় হেমচন্দ্র প্রায় কোনো পর্যায়েই নিজ ভাবনাকে sentiment-এর গণ্ডি থেকে গাঢ়বদ্ধ emotion-এ পরিণত করতে পারেননি। কবিতাবলির কয়েকটি কবিতা যেমন—লজ্জাবতী, যমুনাতটে, পদ্মের মৃণাল, জীবন-মরীচিকা-য় অনুভূতির মন্ময়তা অনুভব করা যায়। 'ভারতবিলাপ' পরাধীন জাতির বেদনা বিধুরতায় আচ্ছন্ন। এই কবিতায় দেশপ্রেমের উত্তেজনাময় প্রকাশ ল(করা যায়। কবিতাটি রচনার জন্য হেমচন্দ্র রাজরোষে দুর্ভোগ ভুগেছেন। পরে 1875 খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ রাজকুমারের ভারত আগমন উপল("ভারতভি(া" কবিতা লিখে পুরনো অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। 'ভারতবিলাপ' ও 'ভারতভি(া' দুটি পরস্পরবি(দ্ধ ভাবের কবিতা। হেমচন্দ্রের দুর্বল কবিচিত্ততার পরিচায়ক। 'চিত্তবিকাশ' কাব্যটিও উল্লেখ্য। এটি কতকগুলি গীতিকবিতার সমষ্টি। শিল্প সৌকর্যের অভাব আছে। মর্মবেদনার উৎসজাত বলে এর গীতিধর্ম অন্তরকে স্পর্শ করে।

12.9.3 নবীনচন্দ্র সেন (1847-1909)

নবীনচন্দ্র সেনের 'অবকাশরঞ্জিনী' (প্রথম 1871, দ্বিতীয় 1878) দুই খণ্ডে প্রকাশিত। এর কয়েকটি কবিতা কাহিনী সমাশ্রিত ও দীর্ঘ। নবীনচন্দ্রের কবিচেতনায় ভাবালুতা বাঙালিসুলভ আতিশয্যকে অতিত্র(ম করেছিল। তাঁর মধ্যে একজন আত্মমুগ্ধ প্রচারপ্রয়াসী ব্যক্তি(ত্ব ছিল। প্রেম, প্রকৃতি, গৃহজীবন এবং স্বদেশচিন্তা তাঁর 'অবকাশ রঞ্জিনী'র কিছু কবিতাকে সার্থক গীতিকাব্যের মর্যাদা এনে দিয়েছে।

12.9.4 বিহারীলাল চত্র(বর্তী (1835-94)

মধুসূদন সৃষ্টিশীল মনীষায় গীতিকবিতার যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা, বিষয়গৌরব ও বহুধা আঙ্গিকচর্চার সূচনা করেন তা বিহারীলাল চত্র(বর্তী আবির্ভাব লগ্নটিকে ত্বরান্বিত করেছে। তাঁর 'সঙ্গীতশতক' (1862), 'বঙ্গসুন্দরী' (1870), 'নিসর্গ

সন্দর্শন' (1870), 'বন্ধুবিয়োগ' (1870), 'প্রেমপ্রবাহিনী' (1870) এবং 'সারদামঙ্গল' (1879) ও 'সাধের আসন' (1889) উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। বিহারীলালের মধ্যে একটা অকারণ, অনির্দেশ্য বেদনাবোধ, একটা অপ্রকাশিত অভাবের অস্বস্তি নিয়ত ধূমায়িত হোত। তাঁর কবিতার প্রেরণায় এই অজ্ঞাতপূর্ব অনুভূতি সত্রি(য় ছিল। তাঁর কবিতায় এ ছিল এক নূতন অনুভব, নূতনতর অভিজ্ঞতা। তিনি নিজের মনের রঙ দিয়ে বাইরের বস্তুকে রঞ্জিত করে দেখেছেন। এদিক থেকে তাঁকে প্রথম গীতিকবির মর্যাদা দিতে হয়। প্রসঙ্গত স্মরণীয় প্রথমোত্ত(তিনজন কবি থেকে বিহারীলাল আরও একদিক থেকে উল্লেখযোগ্য(তিনিই প্রথম কবি যিনি গীতিকবিতা ছাড়া কার্যত অন্য শিল্পকর্মে প্রবেশ করেননি। বিহারীলাল প্রকৃতির অতি কোমল অংশের উপাসক। তাঁর সঙ্গীতশতক, বন্ধুবিয়োগ, প্রেমপ্রবাহিনী— ব্যতিত্র(মী রচনা। নূতন যুগের নূতন কবিতার আস্বাদ পাওয়া গেল তাঁর 'বঙ্গসুন্দরী' এবং 'নিসর্গ সন্দর্শনে'। প্রথমেই কবির ধ্যানমগ্ন সৌন্দর্য সৃষ্টির সূত্রপাত। প্রথম কাব্যটিতে 'নারী সম্বন্ধে রোমান্টিক' ধারণার আর দ্বিতীয়টিতে সৌন্দর্য বর্ণনার প্রকাশ ল(করা যায়।

উনিশ শতকে পাশ্চাত্য শি(া প্রসারের ফলে নারীজাতি সম্পর্কে যে নূতন বি(াস ও শ্রদ্ধাবোধের সৃষ্টি হয়েছিল, 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যে তারই অভিব্যত্তি(ঘটেছে। বিহারীলাল নারীকে প্রেমময়ী রোমান্টিক দৃষ্টি দিয়ে অনুভব করে, পারিবারিক জীবনে তাকে 'সদানন্দময়ী আনন্দরূপিণী/স্বরগের জ্যোতি মূরতিমতী' রূপে আবিষ্কার করেছেন।

'সারদামঙ্গল' বিহারীলালের শ্রেষ্ঠ কাব্য। 'সাধের আসন' একই ভাবচেতনার অনুসরণমাত্র। সারদা বা সরস্বতী এখানে সাধারণ ধারণা থেকে স্বতন্ত্র। এই দেবী কবিমনে সৌন্দর্যবোধ ও প্রেমোপলব্ধির কল্পিত রূপ। তিনি কখনো জননী, প্রেয়সী বা কন্যা। মূর্তিমতি সৌন্দর্য এবং দয়া, স্নেহ ও প্রেমের প্রতীক। সারদা শেলির spirit of beauty-র সমগোত্রীয়—কখনো বালিকা, কখনো সুন্দরী যোড়শী, কখনো কবির প্রণয়িনী। এই সারদাকেই তিনি আপন অন্তরে পেতে চেয়েছেন। সারদা তাঁর কাছে দেবী, প্রেম তাঁর পূজা। তাই লক্ষ্মীর ধনসম্পদে তাঁর কিছুমাত্র কামনা নেই। এই রোমান্টিক কবি-কল্পনা বিহারীলালের বৈশিষ্ট্য। এ থেকেই এসেছে এক অকারণ বেদনা। কবি যাকে বলেছেন, "মৈত্রী বিরহ, প্রীতি বিরহ, সরস্বতী বিরহ।" এই ত্রিবিধ বিরহে উন্মত্তবৎ হয়ে তিনি 'সারদামঙ্গল' রচনা করেছেন। এভাবে তিনি বাংলা গীতিকাব্যে এক বিশুদ্ধ রোমান্টিক ধারার প্রতিষ্ঠা করেছেন। এদিক থেকে তিনি আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার পথিকৃৎ মধুসূদন থেকে স্বতন্ত্র। কেননা, মধুসূদনের কবি প্রতিভায় ছিল ক্লাসিসিজম্-রোমান্টিসিজমের সংমিশ্রণ। বিহারীলাল নির্দ্বন্দ্ব মনের পরিচয় দিয়ে বাংলা কবিতায় পথ প্রদর্শকের কাজ করেছেন।

12.9.5 সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (1838-78)

রামমোহন-বিদ্যাসাগরের সমাজ-সংস্কার ও স্ত্রীশি(ার বিস্তার আন্দোলন, বঙ্গসুন্দরী-সারদামঙ্গলে রোমান্টিক কবি কল্পনায় নারীত্বের যে মহিমান্বিত রূপ বিহারীলাল জননী-জায়া-ভগিনী-কন্যায় অঙ্কন করেছেন, সেই ধারাবাহিকতাকে সুরেন্দ্রনাথ আরও সমৃদ্ধ করেছেন। তিনি নারীর উত্ত(চারটি সামাজিক অবস্থা অবলম্বনে মহিলা (প্রথম 1880, দ্বিতীয় 1883) কাব্য রচনা করেন। জায়া, জননী এবং ভগিনীর কিয়দংশ রচনার পর কবির মৃত্যু হয়। যদিও এই কাব্যরচনায় বিহারীলালের প্রভাব প্রত্য((তথাপি কবি 'নারী' সম্পর্কে শ্রদ্ধা ও আবেগসঞ্জাত একটি ক্লাসিক্যাল এবং রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন। সুরেন্দ্রনাথ 'মহিলা' কাব্যে প্রাকৃত প্রেমের সংস্কারকে অবলম্বন করে, তাকে দার্শনিক যুত্তি(দিয়ে শোভন ও সর্বজনগ্রাহ্য করে তুলেছেন। সেই সঙ্গে তাঁর ভাষার উচ্ছ্বাস সংযত, বত্ত(ব্য সংহত ও গাঢ়।

12.9.6 গোবিন্দচন্দ্র দাস (1854-1918)

ভাওয়াল পরগনার এই কবি স্বভাব-কবি পরিচয়ে খ্যাত। তাঁর ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে ভাল পরিচয় ছিল না। তদুপরি দারিদ্র্যের মধ্যে তাকে জীবনযাপন করতে হয়েছে। বাংলাদেশের জন-হাওয়ায় তাঁর কবিতা ও কবিত্ব অনেকটা সিদ্ধবস্তু ছিল। প্রবল আবেগোচ্ছ্বাস নিঃসঙ্কোচ দেহ-কামনা, বলিষ্ঠ প্রকাশ এবং সমকালীন জীবন থেকে আহৃত রোমান্টিক বেদনাবোধ তাঁর কাব্যে সুন্দর ও স্বচ্ছ ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর কল্পনায় ভোগবাদ ও নারীদেহ কামনার তীব্রতা ল(ণীয়। তিনি বলেন, 'আমি তারে ভালবাসি অস্থি-মাংসসহ/অমৃত সকলি তার মিলন বিরহ'। গোবিন্দদাসে ইন্দ্রিয়ানুগত্যের, লৌকিক কাম-ভাবনার প্রাধান্য আছে। তাঁর মধ্যে বড় কবির কিছু সম্ভাবনা থাকলেও ভাষার অসংযম ও রূপনির্মিতির দুর্বলতায় তা বাস্তবায়িত হয়নি। তাঁর কাব্য গ্রন্থাবলির মধ্যে 'প্রেম ও ফুল' (1887), 'কুঙ্কুম. (1891), 'কস্তুরি' (1895), 'চন্দন' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

12.9.7 দেবেন্দ্রনাথ সেন (1858-1920)

রবীন্দ্র সমসাময়িক ও কবির ঘনিষ্ঠ দেবেন্দ্রনাথের ওপর রবীন্দ্রনাথের কিছু প্রভাব আছে। তাঁর কাব্যের উপজীব্য প্রেম। গীতিকবি হিসেবে তাঁর কল্পনা বস্তুকে অতিত্র(ম করেছে। দেবেন্দ্রনাথের কাব্যে একই সঙ্গে ধ্রুপদী (classical) বন্ধন-দৃঢ়তা, সৌন্দর্য-রূপ-মুগ্ধতা এবং দাম্পত্য প্রেমের স্বভাবমাধুর্য সুন্দর রস ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে। কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ফুলবালা' (1880)। অপরাপর কাব্য—'অশোক গুচ্ছ' (1900), 'শেফালি গুচ্ছ' (1912) ও 'গোলাপ গুচ্ছ' (1912)। এই কাব্যগ্রন্থগুলি কবির মৌলিক ও বিশিষ্ট কবি-প্রতিভার পরিচায়ক। তাঁর কবিতায় ভাবে, ভাষায় ও ছন্দের সৌকর্যে মৌলিকতার পরিচয় আছে।

12.9.8 অ(য়কুমার বড়াল (1860-1919)

"মানবীর তরে কাঁদি, যাচি না দেবতা" বলে যিনি নারী সম্পর্কে সমস্ত রোমান্টিকতার কুয়াশা ছিন্ন করে তাকে সমাজে ও সংসারের 'সেবা-মায়া, পাপ-পুণ্যের মধ্যে এনে মানবী সত্তায় প্রতিষ্ঠিত করলেন সেই অ(য়কুমার বড়াল গীতিকাব্যধারার একজন বিশিষ্ট কবি। এঁর তিনটি কাব্যগ্রন্থে ('প্রদীপ' 1885, 'কনকাঞ্জলি' 1885 ও 'ভুল' 1887) বিহারীলাল, সুরেন্দ্রনাথ এবং মধুসূদনের সীতা, প্রমীলার নারীচৈতন্যের সমন্বয়পুষ্টি ল(করা যায়। কাব্যসাধনার এ পর্বে বাস্তবতার ে(ত্র থেকে, প্রাত্যহিক তুচ্ছতার বিষয় তাকে তাঁর প্রেম-পিপাসা নায়িকার রোমান্টিক সত্তাকে আবিষ্কার না করে কল্পনার স্বর্গলোকে অভিসার করেছে। কিন্তু 'শঙ্খ' কাব্যের শেষ পর্যায়ে কবির বাস্তবচেতনা, অনেকটা স্পষ্ট রূপ লাভ করে। তিনি পৃথিবীর রূপ-রঙ-রসের বিচিত্র সৌন্দর্যভাণ্ডারকে আবিষ্কার করেন। এমন সময় স্ত্রীবিয়োগ তাঁর প্রেম কল্পনায় আঘাত করে। প্রচণ্ড আন্তর্বেদনা ত্র(মশ শোককাব্যরসে পরিণত হয়। এর থেকে 'এষা' (1912) কাব্যগ্রন্থের সূচনা। বাংলা সাহিত্যে এটি শ্রেষ্ঠ শোককাব্য। মৃত্যু, অশৌচ, শোক, সান্ত্বনা—এই চারটি সর্গে 'এষা' রচিত। কবিহৃদয়মথিত শোক যেন চারটি তরঙ্গের মধ্য দিয়ে উপলব্ধির তটরেখায় এসে শেষ হয়েছে। কবির যে শোক সহসা ক(ণ রসের সৃষ্টি করেছিল, তা ত্র(মে মহৎ উপলব্ধির মধ্য দিয়ে কাব্য-সুধায় পরিণত হয়েছে। 'এষা'র অনন্যতা এখানেই।

12.9.9 দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (1858-1920)

বাংলার বিখ্যাত নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-এর কবিকৃতিত্ব কোনো অংশে কম নয়। অনেকে মনে করেন, দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যখ্যাতি তাঁর কবিপ্রতিভাকে আচ্ছন্ন করেছে। বাল্যেই তাঁর কবিত্বশক্তি(র উন্মেষ ঘটেছিল।

তাঁর প্রথম কাব্য মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্রের মত ইংরেজি ভাষায় লেখা 'The Lyrics of Ind'-। প্রথম বাংলা কাব্যগ্রন্থ 'আর্যগাথা' (1882, 1893) গ্রন্থটির প্রশংসা করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, কতকগুলি গান আছে যা কাব্য হিসেবে সম্পূর্ণ, পাঠকমাত্রেই হৃদয়ে ভাবের উদ্রেক ও সৌন্দর্যের সঞ্চার করে। তাঁর 'হাসির গান' (1900) বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। এতে এমন একটি সুর ও ভঙ্গি আছে যা বাংলায় পূর্বে বা পরে আর দেখা যায়নি। এগুলিই তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এ ছাড়া কবির 'আষাঢ়ে', 'মন্দ্র' আলেখ্য প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে সুমার্জিত ভাষা, ছন্দ ও প্রসাধনকলার নৈপুণ্য ধরা পড়ে। তিনি দেশবাসীর চরিত্রের উন্নতি, মনে স্বদেশপ্রীতি ও স্বজাতি গৌরব জাগ্রত করবার অভিপ্রায়ে বহু কবিতা ও গান রচনা করেছেন।

12.9.10 দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (1840-1926)

রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠভ্রাতা স্বপ্নপ্রয়াণের কবি ও দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'মেঘদূত' কাব্যের অনুবাদ ছাড়াও 'কাব্যমালা' নামে গ্রন্থ রচনা করেন। নিরহঙ্কার পাণ্ডিত্য, সুমিষ্ট কবিত্ব, বিচিত্র ছন্দসৃষ্টি, কোমল-মধুর ভাষা এবং (চিপূর্ণ হাস্যরস প্রভৃতির মিশ্রণে দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর 'কাব্যমালা' রচনা করেছেন।

12.9.11 মহিলা কবিগোষ্ঠী

বাংলাদেশে পাশ্চাত্য শি(াবিস্তারের সঙ্গে স্ত্রীশি(ার প্রসার ঘটে। এক সময় দেশের অর্ধেক জনসংখ্যা ঘরের চার দেওয়ালে তাদের অন্তরের ভাষাকে মূক করে রেখেছিল। এ সময়ে কয়েকজন উদারচেতা মানুষের চেষ্টায় গৃহ প্রাঙ্গণ ছেড়ে বাইরে এসে কিছু মহীয়সী নারী তাঁদের হৃদয়ের আকূতি প্রকাশ করলেন। বাংলা কাব্য-প্রাঙ্গণে শত পুষ্প বিকশিত হল। আলোচ্য অংশে পুষ্পের রস-সৌরভ যাঁরা বিতরণ করেছিলেন তাঁদের কয়েকজনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হচ্ছে

গিরীন্দ্রমোহিনী (দত্ত) দাসী (1858-1924) কাব্যগ্রন্থ 'কবিতাহার' (1873), 'ভারতকুসুম' (1882), 'অশ্রুকণা' (1887)। নারী তার সাংসারিক জীবনেও কত সহজে সুখ-সম্পদকে উপভোগ করতে পারে, তার সার্থক পরিচয় গিরীন্দ্রমোহিনীর কবিতায় পাওয়া যায়। স্বামী-পুত্র ঘর-সংসার তাঁর অধিকাংশ কবিতার বিষয়বস্তু। স্বামী বিয়োগের পর প্রকাশিত 'অশ্রুকণা'য় কবির প্রিয়জন-বিয়োগ-ব্যাথাতুর হৃদয়ের পরিচয় আছে। কবিতাগুলি পাঠকের সহানুভূতি ও সহৃদয়তা আকর্ষক।

কামিনী রায় (1864-1933) ১৯ শতকের শেষার্ধে যে ক'জন মহিলা কবি বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে 'আলোছায়া'র (1889) কবি কামিনী রায় শ্রেষ্ঠ। তাঁর 'মাল্য' ও 'নির্মাল্য' (1913), 'দীপ ও ধূপ' (1929) উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। শেষোত্ত(টিতে কয়েকটি কবিতায় অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি কবির সহানুভূতির প্রকাশ আছে। কামিনী রায়ের কবিতায় আত্মভাবের প্রাধান্য আছে। সে যেন তাঁর প্রাণের কথা(কিন্তু সমাজের আর সকলের সঙ্গে যে তাঁর প্রাণের মিল নেই, তার জন্য তিনি দুঃখ পান, অর্থাৎ তাঁর কবিতার ভাব ব্যত্তি(গত হলেও সমাজ ও জাতি সম্পর্কে তিনি একেবারে উদাসীন ছিলেন না। তবে রচনারীতিতে তিনি বিশেষ কোনো নূতনত্ব দেখাতে পারেননি, বা নূতন কোনো পথের সন্ধানও করেননি।

মধুসূদন দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্রী **মানকুমারী দত্ত (বসু) (1865-1943)** অন্যতম বিখ্যাত কবি। পিতৃগৃহ-শ্বশুরালয়ে সাহিত্যচর্চার পরিবেশ থাকায় তাঁর কবিত্বশত্তি(স্ফুরণে বাধা হয়নি। সূক্ষ্ম অনুভূতি অন্তরের আবেগের স্পন্দন, ভাষার প্রাঞ্জলতা, সাধারণ সামাজিক জীবনের উপযোগী ভাব-চিন্তার গুণে ইনি বাংলার

মহিলা কবিদের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিলেন। 'কুসুমাঞ্জলি' (1893) কাব্যে তাঁর কবিখ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়। 'কনকাঞ্জলি' (1896) তাঁর অপর কাব্য। নীতিবোধ ও সংযম মানকুমারীর কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ইতোমধ্যে বাংলা কাব্যজগতে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ঘটেছে, তাঁর বহুমুখী ব্যক্তি(ত্ব ও সৃষ্টির প্রাচুর্য এক বিস্ময়। এ সম্পর্কে সামগ্রিক আলোচনা একটি স্বতন্ত্র এককে বিন্যস্ত হবে।

12.10 সারাংশ (তৃতীয় অংশ)

বাংলা সাহিত্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার করেন মধুসূদন। পাশ্চাত্য কাব্য-সাহিত্যে অনুরাগী কবি মহাকাব্য রচনার পাশাপাশি নতুন নতুন আঙ্গিকে গীতিকাব্য রচনা করে বিস্ময়ের উদ্রেক করেছেন। তাঁর 'ব্রজাঙ্গনা'র বিষয় নির্বাচন ও ছন্দকা(কার্য ল(ণীয়। 'বীরাঙ্গনা'র পৌরাণিক নারীচরিত্রগুলি স্বতন্ত্র মহিমায় সম্পূর্ণ আধুনিক নারীসত্তা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' কবির আত্মগত ভাবনার সংযত-সংহত প্রকাশ। এটি বাংলা ভাষায় প্রথম সনেটের বই।

হেমচন্দ্র তাঁর সময়ে জনপ্রিয়তা পেলেও মধুসূদনের সমক(ছিলেন না। তাঁর 'চিন্তা-তরঙ্গিনী', 'কবিতাবলী' ও 'চিত্তবিকাশ' গীতিকাব্য সংকলন। 'ভারত বিলাপ' কবির স্বদেশ প্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নবীনচন্দ্রের কবিচেতনায় ভাবালুতা ও আত্মপ্রচারের প্রয়াস আছে। 'অবকাশ রঞ্জিনী' তাঁর গীতিকাব্য সংগ্রহ।

মধুসূদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের রোমান্টিক কবিমন থাকলেও তাঁরা আখ্যানকাব্য-মহাকাব্য রচনায় ব্রতী হলেও, গীতিকবিতাতেও স্বাচ্ছন্দ্যের পরিচয় দিয়েছেন। বিহারীলালের বহুমুখী কবিপ্রতিভা ছিল না। গীতিকবিতার (ে ত্রে তিনি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। এ ধারাটির পুষ্টিবিধানে তাঁর অবদান আছে। 'বঙ্গসুন্দরী', 'নিসর্গ সন্দর্শন'-এ কবির ধ্যানমগ্ন সৌন্দর্য সৃষ্টির যে পরিচয় পাওয়া যায়, সেটি আরও পরিণতরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে তাঁর 'সারদামঙ্গ ল' ও 'সাধের আসন' কাব্যে। সুরেন্দ্রনাথের 'মহিলা' কাব্যে নারী বন্দনার নতুন রূপ ফুটেছে। গোবিন্দচন্দ্র দাসের কবিতায় দেহ-কামনার বলিষ্ঠ প্রকাশ ভাষায় অসংযম ও গঠন শিল্পের দুর্বলতায় স্থায়িত্ব পায়নি। দেবেন্দ্রনাথের কাব্যে দাম্পত্য প্রেমের মাধুর্য সুন্দর রস-ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছে। অ(য় বড়ালের স্ত্রীবিয়োগ তাঁর প্রেম-কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে, এরই পরিণতিতে তাঁর শোককাব্য 'এষা' রচনা করেছেন। অপরাপর কবিদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মহিলা কবিগোষ্ঠী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, কামিনী রায়, মানকুমারী বসু প্রভৃতি স্মরণীয়।

12.11 অনুশীলনী 3

নীচের প্র(গুলির উত্তর ক(ন। তারপর 180 পৃষ্ঠার দেওয়া উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

1. শূন্যস্থান পূর্ণ ক(ন
   (ক) ভারতীয় প্রাচীন গীতিকাব্য বিশেষত ———ও ——— সংগীতগুলি ———ভাবাপন্ন হলেও, সেগুলি মহিমান্বিত ——— দৃশ্যেরই বর্ণনা।
   (খ) মধুসূদনের ——— নামান্তরে ———কাব্য হিসাবে প্রকাশিত হয়।
   (গ) হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী'র কয়েকটি কবিতা যেমন ——— ——— অনুভূতির ——— অনুভব করা যায়।

(ঘ) ——— ও ——— দুটি পরস্পরবি(দ্ধে ভাবের কবিতা।

(ঙ) নবীনচন্দ্রের কবিচেতনায় ———বাঙালিসুলভ ——— অতিত্র(ম করেছিল।

(চ) বিহারীলালই ——— কবি যে ——— ছাড়া কাব্যের অন্য ——— প্রবেশ করেননি।

(ছ) সারদা শেলির ———সমগোত্রীয়া।

2. সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্(দিন

(ক) মধুসূদন দত্তের 'বীরাঙ্গনা' কাব্য প্রকাশ কাল	1861, 1862, 1860
(খ) হেমচন্দ্রের 'চিত্তবিকাশ' প্রকাশিত হয়	1870, 1882, 1898
(গ) বিহারীলাল চত্র(বর্তীর 'সারদামঙ্গল' কাব্যের প্রকাশকাল	1862, 1879, 1889
(ঘ) 'মহিলা' কাব্যের রচয়িতা	সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, দেবেন্দ্রনাথ সেন, কামিনী রায়।
(ঙ) ফুলের নামে কাব্যগ্রন্থের নামকরণ করেছেন	গোবিন্দচন্দ্র দাস, দেবেন্দ্রনাথ সেন, মানকুমারী বসু।
(চ) অ(য়কুমার বড়ালের 'এষা'	শোককাব্য, পত্রকাব্য ode

3. (ক) বিহারীলাল বলেছেন, 'ত্রিবিধ' বিরহে উন্মত্তবৎ হয়ে তিনি 'সারদামঙ্গল' কাব্য রচনা করেছেন।— কি সেই 'ত্রিবিধ' বিরহ, উল্লেখ ক(ন।

(খ) মধুসূদন দত্তের 'অঙ্গনা' কাব্য দুটির পুরো নাম লিখুন।

(গ) 'মন্দ্র' কাব্যটি কার রচনা? কবির আরও দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম লিখুন।

(ঘ) 'এষা' কাব্য সম্পর্কে সং(পে আলোচনা ক(ন।

(ঙ) 'সারদামঙ্গল' বিহারীলাল চত্র(বর্তীর শ্রেষ্ঠ রচনা মনে করা হয়।—এ সম্পর্কে আপনার অভিমত লিখুন।

(চ) 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের দুটি পত্রের নাম উল্লেখ ক(ন।

(ছ) কামিনী রায়ের দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম লিখুন।

(জ) 'মহিলা' কাব্যের রচয়িতা কে? কাব্যটির সং(পে পরিচয় দিন।

(ঝ) আধুনিক বাংলা গীতিকবিতা সম্পর্কে সং(প্ত পরিচয় লিখুন।

(এ() দু'জন মহিলা কবি সম্পর্কে আলোচনা ক(ন।

12.12 উত্তর সংকেত

12.5 অনুশীলনী 1

1. (ক) 1858, (খ) 1868, (গ) 1864, (ঘ) 1880, (ঙ) 1875।
2. (ক) 1875, (খ) রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, (গ) আখ্যান কাব্য।
3. এই প্র্নের উত্তর সংকেত অপ্রয়োজনীয়।

12.8 অনুশীলনী 2

1. (ক) রঙ্গলাল, (খ) হেমচন্দ্র, (গ) নবীনচন্দ্র, (ঘ) 1875, (ঙ) 1860।
2. (ক) মঙ্গলদেবতা, অভিনব, (খ) পাঠকের (চি, যুগান্তর, (গ) ইতিহাসের, ঘটনাত্র(মকে,)(ঘ) উদাসিনী, স্বপ্নপ্রয়াণ, (ঙ) যোগেশ, রোমান্সধর্মী, (চ) মধুসূদন ন'টি, ক(ণ রসাত্মক।
3. প্র(গুলির উত্তর সংকেতের আলোচনা অপ্রয়োজনীয়।

12.11 অনুশীলনী 3

1. (ক) ঋক, অথর্ববেদের, আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন, প্রাকৃতিক, (খ) রাধাবিরহ ব্রজাঙ্গনা, (গ) লজ্জাবতী, যমুনাতটে, মন্ময়তা, (ঘ) ভারত বিলাপ, ভারতভি(া, (ঙ) ভাবালুতা, আতিশয্যকেও, (চ) প্রথম, গীতিকবিতা, শিল্পকর্মে, (ছ) 'স্পিরিট অফ বিউটি'র।
2. (ক) 1861, (খ) 1898, (গ) 1879, (ঘ) সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, (ঙ) গোবিন্দচন্দ্র দাস, (চ)শোককাব্য, (ছ) মানকুমারী বসু।
3. প্র(গুলির উত্তর সংকেত অপ্রয়োজনীয়। বর্তমান পাঠ্যপুস্তকটি থেকে উত্তর সংগ্রহ ক(ন।

12.13 গ্রন্থপঞ্জি

1. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড) ড. সুকুমার সেন।
2. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (তৃতীয় খণ্ড) ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
3. বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস ড. (ে ত্র গুপ্ত।
4. কবিতার বিচিত্র কথা হরপ্রসাদ মিত্র।

একক 13 ❑ নাট্যমঞ্চ ও নাটক

গঠন

13.1 উদ্দেশ্য
13.3 প্রস্তাবনা
13.3 মূলপাঠ (প্রথম অংশ) মঞ্চ বিদেশী প্রেরণা
13.4 সারাংশ (প্রথম অংশ)
13.5 অনুশীলনী 1
13.6 মূলপাঠ (দ্বিতীয় অংশ) মঞ্চ সৌখীন নাট্যাভিনয় থেকে ন্যাশনাল থিয়েটার
13.7 সারাংশ (দ্বিতীয় অংশ)
13.8 অনুশীলনী 2
13.9 মূলপাঠ (তৃতীয় অংশ) বাংলা নাট্যসাহিত্যের সূচনা
13.10 সারাংশ (তৃতীয় অংশ)
13.11 অনুশীলনী 3
13.12 মূলপাঠ (চতুর্থ অংশ) নাট্যসাহিত্যের বিকাশ-প্রতিষ্ঠা
13.13 সারাংশ (চতুর্থ অংশ)
13.14 অনুশীলনী 4
13.15 উত্তর সংকেত
13.16 গ্রন্থপঞ্জি

13.1 উদ্দেশ্য

এই একক পাঠ করে আপনি বাংলা নাটক ও নাট্যাভিনয়ের জন্য মঞ্চপ্রতিষ্ঠার প্রেরণা, ধনাঢ্য ব্যক্তি(দের পারিবারিক মঞ্চে সৌখীন নাটক অভিনয় থেকে সর্বসাধারণের জন্য মুক্ত(সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার সংি(প্ত ইতিবৃত্ত জানতে পারবেন। পরবর্তী অংশে পারিবারিক মঞ্চের প্রয়োজনে নাটক রচনা এবং শেষে যে সামাজিক ও সাহিত্যিক অন্তঃপ্রেরণায় রবীন্দ্রপূর্ববর্তী নাট্যসাহিত্যের বিকাশ ঘটেছে সে সম্পর্কে জানতে, বুঝতে ও প্রকাশ করতে পারবেন।

- এই একক থেকে আপনি কলকাতার বিদেশী ও দেশী নাট্যাভিনয় নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন।
- বাংলা নাট্যসাহিত্যের উদ্ভব-বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

13.2 প্রস্তাবনা

বাঙালির পাশ্চাত্য ধারার নাটক অভিনয়ে প্রেরণার সংি(প্ত ইতিহাস জানার প্রয়োজনে কয়েকটি ইংরেজি মঞ্চে অভিনীত নাটকের প্রসঙ্গ আলোচনা করতেই হয়। এককের প্রথমাংশে এই বিদেশী প্রেরণার পরিচয় দেওয়া

হয়েছে। দ্বিতীয় অংশে কোম্পানির সঙ্গে ব্যবসায়িক লেনদেনের মধ্য দিয়ে যে নতুন বিত্তবান গোষ্ঠী গড়ে ওঠে সামাজিক মর্যাদা, আভিজাত্য ও সাংস্কৃতি প্রেরণায় তাঁরা নিজেদের বাড়িতে পারিবারিক মঞ্চে ব্যয়বহুল অভিনয়ের আয়োজন করেন, বাঙলায় নাটক রচনা ও জনসাধারণের জন্য রঙ্গমঞ্চ স্থাপনের আগ্রহের তীব্রতা সেখান থেকে সৃষ্টি হয়। বর্তমান অংশে তার পরিচয় আছে। এভাবে মঞ্চের প্রয়োজনে কিছু নাটক লেখা হলেও ইংরেজি শি(া প্রবর্তনের পর শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নাটকের দর্শক-পাঠক ত্র(মশ বৃদ্ধি পায়। ফলে মঞ্চের প্রয়োজন ও সাহিত্যিক প্রেরণা ছাড়াও সমাজ সংস্কার আন্দোলনের প(-বিপ(হাতিয়ার হিসেবে নাটককে ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা বোধ থেকে শি(ত মধ্যবিত্ত জনসমাজে চাহিদার সৃষ্টি হয়। সেই তাগিদ থেকেই প্রথম যুগে অনেক নাটক লেখা হয়েছে। এর পরিচয় তৃতীয় অংশে দেওয়া হয়েছে। চতুর্থ অংশে মধুসূদন থেকে ীরোদপ্রসাদ পর্যন্ত বিশিষ্ট নাট্যকার ও নটের নাট্যকৃতি আলোচনার অন্তর্ভুক্ত(করা হয়েছে। একটি স্বতন্ত্র এককে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র অবদান আলোচিত হওয়ায় রবীন্দ্রপূর্ব নাট্য আলোচনাতেই এককটির সমাপ্তি রেখা টানা হয়েছে।

13.3 মূলপাঠ (প্রথম অংশ) মঞ্চ বিদেশী প্রেরণা

দিল্লীর বাদশাহের সনদ নিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশে ব্যবসায় অধিকার পায়। কলকাতাকে কেন্দ্র করে সেক্সপিয়রের দেশের কিছু ত(ণ কর্মচারী অবসর বিনোদনের জন্য নাটক অভিনয়ের আয়োজন করে। এই তাগিদ থেকেই কলকাতার লালবাজারের উত্তর-পূর্ব কোণে 1753 সালে 'পে- হাউস' নামে রঙ্গালয় স্থাপিত হয়। ইংরেজদের বি(দ্ধে দ্বিতীয় অভিযান পরিচালনায় এই মঞ্চেই সিরাজ তার তোপ রেখে তখনকার ফোর্ট আত্র(মণ করে। তখন থেকে বিধ্বস্ত ও পরিত্যক্ত(এই মঞ্চ। এখানে আর কোনো অভিনয় হয়নি। বর্তমান মহাকরণের পেছনে 1776 খ্রিস্টাব্দে 'দি ক্যালকাটা থিয়েটার' নামান্তরে 'নিউ পে- হাউস'-এর প্রতিষ্ঠা। লন্ডন থিয়েটারের আদলে তৈরি অভিজাত এই মঞ্চে বহু ইংরেজ বিনা পারিশ্রমিকে অভিনয় করতেন। দৃশ্যপট ও অভিনেতাদের জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক, সাধারণ প্রহসন থেকে সেক্সপিয়রের হ্যামলেট, রিচার্ড থার্ড এখানে অভিনীত হয়েছে। হেস্টিংস ও ইম্পে এই থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। 1808 সাল পর্যন্ত মঞ্চটি স্থায়ী হয়েছিল। 1789 খ্রিস্টাব্দে এমা ব্রিস্টো চৌরঙ্গীতে তাঁর বাড়িতে একটি নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। এমা নিজে প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। এখানেই প্রথম স্ত্রী-চরিত্রে অভিনেত্রীর অংশ গ্রহণের সংবাদ পাওয়া যায়। এ সময় থেকে কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তে ইংরেজি নাটক অভিনয়ের ছোট ছোট আয়োজন হতে থাকে। এ পর্বে উল্লেখযোগ্য মঞ্চ 'চৌরঙ্গ ী থিয়েটারে'র প্রতিষ্ঠা 1813 খ্রিস্টাব্দে। হিন্দু কলেজের অধ্যাপক রিচার্ডসন প্রাচ্যতত্ত্ববিদ উইলসন প্রভৃতি বহু বিগদ্ধ ব্যক্তি(চৌরঙ্গী থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। উচ্চাঙ্গের অভিনয়ের জন্য সমসাময়িক সংবাদপত্রে এর ভূয়সী প্রশংসা হয়েছে। এখানে 'ম্যাকবেথ', 'কোরিওলেনাস' 'স্কুল ফর স্ক্যান্ডল' অভিনীত হয়। সৌখীন অভিনেতাদের সঙ্গে যে অভিনেত্রীরা অভিনয় করতে তাঁরা পারিশ্রমিক পেতেন। এক সময় চৌরঙ্গী থিয়েটার ঋণজালে জড়িয়ে পড়লে নিলামে দ্বারকানাথ ঠাকুর কিনে 'ক্লার্ক, কার ও পার্কারের' হাতে তুলে দেন। এঁরা মঞ্চটির যথেষ্ট উন্নতি বিধান করেন। 1839-এর 31শে মে রাতে আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডে এটি ভস্মীভূত হয়। এখানে যে কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তা হোল, এই প্রথম একটি ইংরেজি মঞ্চে শুধু নাট্যমোদী দর্শক পৃষ্ঠপোষক হিসেবে নয় বাঙালি দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রত্য(সম্পর্ক স্থাপিত হোল। পরবর্তী মঞ্চ সাঁসুসি (Sans Souci) ডালহৌসী এলাকায় 1839 খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হলেও স্থান সঙ্কুলানের অভাবে পরে পার্ক স্ট্রিটে যেখানে বর্তমান সেন্ট জেভিয়ার্স

কলেজ, নিজস্ব বাড়ি তৈরি করে চলে যায়। এখানেই প্রথমে একজন বাঙালি অভিনেতা বৈষ(বচরণ আঢ্য অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে 'ওথেলো' নাটকের নামভূমিকায় অভিনয় করে খ্যাতি অর্জন করেন।

চৌরঙ্গী ও সাঁসুসি থিয়েটার কলকাতার ধনাঢ্য বাঙালিদের অভিনয় দেখাই শুধু নয়, সমগ্র নাট্যকলা সম্পর্কেই অত্যন্ত আগ্রহী করেছিল। পরবর্তীকালে বাংলা নাটকের অনেক অভিনেতাও এই সমস্ত ইংরেজ থিয়েটার থেকে প্রেরণা পেয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, কেউ কেউ নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা, মঞ্চসজ্জার পরিকল্পনা, অভিনয়কৌশল সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নিয়ে পারিবারিক মঞ্চে প্রয়োগ করেছিলেন।

ইংরেজ অভিনীত ও পরিচালিত থিয়েটারের পাশাপাশি আমাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয় (শ পর্যটক, জ্ঞানতাপস ও সঙ্গীতজ্ঞ গেরাসিম লেবেডেফ্-এর কথা। তিনি এম. জড্রেল-এর 'দি ডিসগাইস' (The Disguise) নাটকটির বাংলা অনুবাদ 'কাল্পনিক সংবদল' 25 ডোমতলা লেনে, তাঁরই নিজস্ব মঞ্চে 1795-এর 27শে নভেম্বর ও 21শে মার্চ, 1796 —দু'বার অভিনয় করিয়েছিলেন। তিনি মলিয়েরের নাটক Love is the Best Doctor-এর ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন।

এতদিন ইংরেজদের মঞ্চে ইংরেজি নাটক অভিনয় হোত। লেবেডেফ তাঁর বেঙ্গলী থিয়েটারে বাংলা নাটক অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করান। দর্শক আকর্ষণের জন্য বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল, বঙ্গীয় রীতিতে মঞ্চসজ্জা, অভিনেতার সঙ্গে অভিনেত্রীর সমাবেশ, কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতে ভারতীয় প্রেমগীতি, যে সমস্ত ইউরোপীয় যন্ত্র-সঙ্গীত বাঙালির প্রিয় সেগুলি এবং নাটকের মাঝে মাঝে আনন্দদায়ক ও কৌতুককর বিষয় পরিবেশিত হবে। টিকিটের দাম সে সময়ে গ্যালারি 4 (চার) টাকা, বক্স 8 (আট) টাকা ধার্য হওয়া সত্ত্বেও প্রথম অভিনয়ের সমস্ত টিকিট বিত্রি(হয়ে গিয়েছিল। অভিনয়ের এই সাফল্য লেবেডেফকে উৎসাহী করেছিল। তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কলকাতায় ও গ্রামাঞ্চলে এই নাটকের অভিনয় করবেন। সে বাসনা পূরণ হয়নি। লেবেডেফের এই সাফল্য ইংরেজি থিয়েটারের কর্তাব্যক্তি(রা সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। কারণ তাঁরা অনুভব করেছিলেন 'কাল্পনিক সংবদলের' প্রধান দর্শক ছিলেন সাহেবরাই। সম্ভবত এ জন্যই তাঁদেরই একজন টমাস রোওয়ার্থ-এর চত্র(ান্তে থিয়েটারের যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম বিত্রি(করে লন্ডন হয়ে দেশে ফিরে যান।

বাংলা নাটকে লেবেডেফের অবদানগুলি হোল তিনিই প্রথম ইংরেজি ও (শ থিয়েটারের অনুসরণে বেঙ্গলী থিয়েটার স্থাপন করে বাঙালি অভিনেতা-অভিনেত্রীর সাহায্যে প্রথম বাংলা অভিনয় করান। এদেশের সমসাময়িক দর্শকের চাহিদা ও (চি অনুযায়ী নাট্য বিষয়ক নির্বাচন ও উপস্থাপনায় সামাজিক ব্যঙ্গ ও হাস্যরসাত্মক উপাদান এবং জনপ্রিয় বিদ্যাসুন্দরের গান সংযোজন করেছেন পরবর্তী দিনের বাংলা নাটকের সাফল্যের দিকগুলি এর থেকেই নির্দেশিত হয়েছে। বাংলা মঞ্চ এসব থেকে অভিজ্ঞতা নিয়ে নাট্য প্রযোজনায় আগ্রহী হয়েছে। পরবর্তী অংশে তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

13.4 সারাংশ (প্রথম অংশ)

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নাট্যপ্রেমী কিছু কর্মচারীর উৎসাহে ও আগ্রহে 1753 খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় প্রথম ইংরেজি নাটক অভিনয়ের মঞ্চ 'পে- হাউস' প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপরে 1776 খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় জনপ্রিয় ক্যালকাটা থিয়েটার, নামান্তরে, 'নিউ পে- হাউস'। 1789 সালে এম. ব্রিস্টো তাঁর বাড়িতে নাটক অভিনয়ের আয়োজন করে, নিজেই অভিনয় করেছিলেন। ইংরেজি মঞ্চে এই প্রথম একজন মহিলার অভিনয়ে অংশগ্রহণ। চৌরঙ্গী থিয়েটারের

এবং সাঁসুসির প্রতিষ্ঠা যথাত্র(মে 1813 এবং 1839 খ্রিস্টাব্দে। দুটি থিয়েটার সেযুগে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। প্রথম মঞ্চটি ঋণের দায়ে নিলাম হলে দ্বারকানাথ ঠাকুর সেটি কিনে কয়েকজন ইংরেজের হাতে তুলে দেন পরিচালনার জন্য। সাঁসুসিতে প্রথম বাঙালি অভিনেতা বিষু(চরণ আঢ্য 'ওথেলো' চরিত্রে অভিনয় করে সবিশেষ খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন।

(শ পর্যটক লেবেডেফ 1795 সালে বেঙ্গলী থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা, নাট্য-পরিচালক, অভিনয়শি(ক। ইংরেজি নাটকের অনুবাদ করে 'কাল্পনিক সংবদল' নাম দিয়ে এদেশীয় নট-নটীদের দিয়ে অভিনয় করান। মহাসমারোহে 27শে নভেম্বর 1795 ও 21শে মার্চ 1796 মার্চ লেবেডেফ-এর নাটক অভিনয় হয়। ইংরেজি থিয়েটারের চত্র(ান্তে ও প্রতিকূলতায় তিনি যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম বিত্রি(করে দেশে ফিরে যান।

ইংরেজি ও লেবেডেফের থিয়েটার কলকাতার ধনাঢ্য বাঙালিদের অভিনয়, নাট্যকলা ও নাট্যমঞ্চ সম্পর্কে আগ্রহী করে তোলে, তার ফলে কতকগুলি পারিবারিক মঞ্চে অভিনয়ের আয়োজন হয়।

13.5 অনুশীলনী 1

নীচের প্র(গুলির উত্তর দিন। উত্তর করা হলে 204 পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

1. শূন্যস্থান পূর্ণ ক(ন
   (ক) কলকাতায় ———— উত্তর-পূর্ব কোণে ————সালে ———— স্থাপিত হয়।
   (খ) 1776 খ্রিস্টাব্দে ——— নামান্তর ——— এর প্রতিষ্ঠা।
   (গ) ——— ও ——— এই থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।
   (ঘ) এক সময়ে ——— ঋণজালে জড়িয়ে পড়লে নিলামে ——— কিনে ——— হাতে তুলে দেন।
   (ঙ) ———অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে ——— নামভূমিকায় অভিনয় করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।
   (চ) ——— নাটকটির বাংলা অনুবাদ 'কাল্পনিক সংবদল'।
   (ছ) (বেঙ্গলী থিয়েটারের) টিকিটের দাম ——— 4 (চার) টাকা বক্স ——— ধার্য হয়েছিল।
2. সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্(দিন

(ক) দি ক্যালকাটা থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা	1753, 1776, 1816
(খ) 'সাঁসুসি' প্রতিষ্ঠিত হয়	পার্কস্ট্রিট, ডালহৌসীতে, চৌরঙ্গীতে।
(গ) 'কাল্পনিক সংবদল' প্রথম অভিনীত হয়	27শে নভেম্বর, 1895, 27শে নভেম্বর, 1795, 21শে মার্চ, 1796।
(ঘ) চৌরঙ্গী থিয়েটারের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন	হেস্টিংস, অধ্যাপক রিচার্ডসন, দ্বারকানাথ ঠাকুর।

3. (ক) গেরাসিম লেবেডেফ দুটি নাটক অনুবাদ করেন। নাটক দু'টির রচয়িতা ও নাটকের নাম উল্লেখ ক(ন।

(খ) চৌরঙ্গী থিয়েটারে অভিনীত তিনটি নাটকের নাম লিখুন।

(গ) নিউ পে- হাউসের পৃষ্ঠপোষক দু'জনের নাম লিখুন।

4. (ক) 'বেঙ্গলী থিয়েটার' সম্পর্কে সংে(পে আলোচনা ক(ন।

(খ) বাঙালি জীবনে ইংরেজি নাটকের অবদান সংে(পে আলোচনা ক(ন।

13.6 মূলপাঠ (দ্বিতীয় অংশ) মঞ্চ সৌখীন নাট্যাভিনয় থেকে ন্যাশনাল থিয়েটার

ইংরেজ প্রযোজক ও পরিচালকদের থিয়েটার স্থাপন করে নাটক অভিনয়ের প্রচেষ্টা, হিন্দু কলেজের নব্যশি(ত যুবসমাজের মনে তরঙ্গ সৃষ্টি করে। ইউরোপীয় আদর্শে নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা জাগে। ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি(রা একত্র হয়ে ইংরেজদের মত যৌথভাবে নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়। কিন্তু তখনও উল্লেখযোগ্য বাংলা নাটকের একান্ত অভাব। তাই ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য বিশেষ করে সেক্সপিয়রের এবং সংস্কৃত থেকে কালিদাস—ভবভূতির নাটকের অনুবাদ নিয়ে বিত্তবান ব্যক্তি(দের উদ্যোগে তাঁদেরই বাড়িতে সখের নাট্যশালা গড়ে উঠল।

এরকম একটি নাট্যশালা প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নারকেলডাঙ্গার বাগানবাড়িতে প্রতিষ্ঠিত 'হিন্দু থিয়েটার' (1831)। প্রসন্নকুমার পিতামহ দর্পনারায়ণের ধনসম্পত্তি পিতা গোপীমোহন ঠাকুরের মৃত্যুর পর পেয়েছিলেন। সেকালের বাঙালি সমাজে প্রসন্নকুমার রাজনৈতিক সামাজিক আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন। তাঁর 'হিন্দু থিয়েটারের' উদ্বোধন হোল 28শে ডিসেম্বর 1831। এটি বাঙালি প্রতিষ্ঠিত প্রথম থিয়েটার। প্রথম রজনীতে উইলসন অনূদিত ভবভূতির 'উত্তর রামচরিতে'র প্রথম এবং সেক্সপিয়রের 'জুলিয়াস সীজারের' পঞ্চম অঙ্ক ইংরেজিতে অভিনীত হয়। এখানে নাটক অভিনয় শি(া দিতেন একজন ইংরেজ। দর্শক ছিলেন কিছু ইংরেজ শি(িত বাঙালি। হিন্দু থিয়েটার একবছরের মধ্যে উঠে যায়।

এর পরে উল্লেখযোগ্য হোল নবীন বসুর বাড়ির পারিবারিক মঞ্চ। বর্তমান শ্যামবাজার ট্রাম ডিপো ছিল নবীন বসুর বাড়ি। সেখানে সুরম্য বাগান বাড়িতে 1833 খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালায় বাংলা নাটক অভিনয়ের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। জানা যায়—প্রতি বছর এখানে চার পাঁচটি নাটক ইংরেজি ধরনে হিন্দুদের দ্বারা দেশীয় ভাষায় অভিনয় হোত। নারী চরিত্রে মহিলারাই অভিনয় করতেন। 1835 খ্রিস্টাব্দে এখানে ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকাকারে পূর্ণিমা রাত্রে অভিনীত হয়েছিল। নানা জাতীয় প্রায় একহাজার দর্শক অভিনয় দেখেছিলেন। আবার প্রশংসাও পেয়েছে। এই অভিনয়ে বিশেষ উল্লেখের বিষয় হোল কৃত্রিম দৃশ্যপট ছাড়াও নবীনবাবুর বাড়ির পুকুর ও বাগানের নানা দৃশ্য নাটকে ব্যবহৃত হয়েছে এবং মাটি খুঁড়ে সুড়ঙ্গ পথে মালিনীর ঘর থেকে রাজপ্রাসাদের ভেতর প্রবেশের পথ দেখানো হয়েছে।

নবীনবাবু এই মঞ্চ প্রচুর অর্থ ব্যয়ে তিন-চার বছর চালাবার পর ভাল নাটক ও অর্থাভাবে সেটি বন্ধ হয়ে যায়। নাট্যরসামোদী দর্শক এর ভেতর থেকে তৈরি হলেও বেশ কিছু দিন বাংলা নাটক তেমনভাবে অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়নি। তবে স্কুলে কলেজে পুরস্কার বিতরণী সভায় বা ইংরেজি মঞ্চে তখনও অভিনয় চলছে।

নবীন বসুর বাড়ির অভিনয়ের প্রায় কুড়ি বছর পর তাঁরই ভ্রাতুষ্পুত্র প্যারীমোহন বসু চিৎপুর অঞ্চলে 'জোড়াসাঁকো থিয়েটার' (1854) স্থাপন করেন। 3রা মে এখানে সেক্সপিয়রের 'জুলিয়াস সীজার' অভিনীত হয়। ঝড়-বৃষ্টি সত্ত্বেও ঐ রাত্রিতে প্রায় চার'শ লোক অভিনয় দেখতে গিয়েছিলেন। সীজার, ব্রুটাস ও কেসিয়াস-এর ভূমিকায় মহেন্দ্রনাথ বসু, কৃষ(ধন দত্ত এবং যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' নাটকের প্রশংসা

করলেও কর্তৃপ(কে বাংলা নাটক পরিবেশনের পরামর্শ দেন। এর পর আশুতোষ দেব (সাতুবাবু)-র বাড়িতে 'জ্ঞানপ্রদায়িনী সভা'র সদস্যরা একটি নাট্যশালা স্থাপন করেন (1857)। এখানে ঐ বছর সরস্বতী পূজার দিন (30শে জানুয়ারি) নন্দকুমার রায় প্রণীত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' নাটক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে মঞ্চের উদ্বোধন ঘটে। সাতুবাবুর দৌহিত্র শরচ্চন্দ্র ঘোষ শকুন্তলার অভিনয়ে অসাধারণ দ(তার পরিচয় দিয়েছেন। অন্যান্য চরিত্রাভিনয়েও নৈপুণ্যের স্বা(র আছে। শকুন্তলার দ্বিতীয় বারের অভিনয় প্রশংসিত হয়েছে। এই মঞ্চেই বাণভট্টের কাদম্বরী অবলম্বনে 'মহাশ্বেতা' নাটকের অভিনয় হয়েছে। এর এক বছর পূর্বে (1856, 11ই এপ্রিল) ভট্টনারায়ণের বেণীসংহার নাটকের রামনারায়ণ তর্করত্নকৃত বাংলা অনুবাদ 'বেণীসংহার' নাটকের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বিদ্যোৎসাহিনী' মঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কালীপ্রসন্ন স্বয়ং অভিনয়ে অংশগ্রহণ করে এতই উৎসাহিত হল যে, তিনি নিজেই কালিদাসের 'বিত্র(মোর্বশী' বাংলায় অনুবাদ করে 24শে নভেম্বর 1857 স্বীয় মঞ্চে পুররবা'র ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। বহু গণ্যমান্য দেশী বিদেশী ব্যক্তি(দুটি অভিনয়েই দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। সাতুবাবু ও কালীপ্রসন্ন সিংহের মঞ্চে 'শকুন্তলা' ও 'বেণীসিংহার'-এর অভিনয় অভিজাত সমাজে যে তরঙ্গ তুলেছিল, তার অপে(াকৃত পরিণত রূপ 'বেলগাছিয়া নাট্যশালা' মধুসূদনের নাট্যকৃতিগুণে স্মরণীয় হয়ে আছে। এখানে রামনারায়ণের 'রত্নাবলী' নাটক প্রথম অভিনীত হয়। ইতিপূর্বে অবশ্য রামনারায়ণের অপর একটি নাটক 'কুলীনকুলসর্বস্ব' রামজয় বসাকের বাড়িতে (মার্চ, 1857) অভিনীত হওয়ায় সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কুলীনকুলসর্বস্বর জনপ্রিয়তা সমকালীন সমাজসমস্যাকে কাহিনীর বিষয় হিসাবে নির্বাচন করায়, নাটকটির বহু জায়গায় অভিনয় হয়েছে।

রামনারায়ণের মৌলিক নাটক রচনার এই জনপ্রিয়তার জন্যই সম্ভবত বেলগাছিয়া মঞ্চে রত্নাবলী 31শে জুলাই 1858 সমারোহে অভিনয়ের আয়োজন হয়। দশ ল(টাকা ব্যয়ে পাইকপাড়ার রাজভ্রাতাদ্বয়—ঈশ্বরচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্র সিংহের ইচ্ছায় এবং মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পরামর্শে এর প্রতিষ্ঠা। আমন্ত্রিতদের মধ্যে কলকাতার বিশিষ্ট ইংরেজরা থাকায় তাদের বোঝাবার জন্য নাটকের অনুবাদ ও তার সারাংশ ইংরেজিতে লিখবার জন্য মধুসূদনকে অনুরোধ করা হয়। রত্নাবলীর মান সম্পর্কে মধুসূদনের অসন্তোষ তাঁকে শর্মিষ্ঠা রচনায় আগ্রাহান্বিত করে। শর্মিষ্ঠার কাহিনী পৌরাণিক কিন্তু উপস্থাপনায় সংস্কৃত ও পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শের প্রয়োগ বাংলা নাট্যাধারায় অভিনবত্ব নিয়ে আসে। মহাসমারোহে বেলগাছিয়া নাট্যশালায় এর অভিনয় হোল (3রা সেপ্টেম্বর, 1859)। এর কয়েকটি অভিনয়ের পরেই রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের অকাল প্রয়াণে (29শে মার্চ, 1861) নাট্যশালা বন্ধ হয়ে যায়।

পরবর্তী দুটি নাট্যশালা—পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গ নাট্যালয় এবং 'শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি' পারিবারিক উদ্যোগ ও আয়োজনে 1865 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটক এখানে অভিনীত হয়েছে। তার মধ্যে পাথুরেঘাটার যতীন্দ্রমোহন রচিত 'বিদ্যাসুন্দর' এবং রামনারায়ণের 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' নাটক ও প্রহসন প্রায় দশ-বারবার অভিনয় হয়েছিল। রামনারায়ণের অনুবাদ নাটক 'মালতীমাধব', '(ক্মিণীহরণ' এবং আরও দুটি প্রহসন 'চ(দান' ও 'উভয়সঙ্কট' জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। শোভাবাজার মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' (18-7-65) দিয়ে যাত্রা শু(। পরে কৃষ(কুমারীর অভিনয়ও (8-2-67) উচ্চ প্রশংসা লাভ করে।

শোভাবাজারের মত জোড়াসাঁকো নাট্যশালায় (1867) প্রথম মধুসূদনের 'কৃষ(কুমারী' ও পরে 'একেই কি বলে সভ্যতা'র অভিনয় হয়। দুটিতেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অভিনয় করেছিলেন। মঞ্চের ব্যবস্থাপকদের শি(াপ্রদ নাটকের প্রয়োজনীয়তা বোধ থেকে রামনারায়ণকে দিয়ে বহুবিবাহ সম্বন্ধে 'নবনাটক' (1867) রচনা করিয়ে সেটি অভিনয়ের ব্যবস্থার করা হয়। জোড়াসাঁকোর মঞ্চ পরিকল্পনা দৃশ্যাঙ্কন বাস্তবরীতির অনুসরণ এবং অভিনয়ের

অসামান্য নৈপুণ্যের জন্য স্মরণীয় হয়ে আছে। 1867-এর পর এখানে আর অভিনয় হয়নি। এর পরে উল্লেখযোগ্য নাট্যশালা হোল বহুবাজার বঙ্গ নাট্যালয়। এখানে মনোমোহন বসুর 'রামাভিষেক' (1868), 'সতী' (1874) ও 'হরিশ্চন্দ্র' (1875) নাটক অভিনয় হয়। নাটকগুলি জনপ্রিয় হয়েছিল।

উপরিউক্ত নাট্যশালার মত বাগবাজার এ্যামেচার থিয়েটার নামান্তরে শ্যামবাজার নাট্যসমাজ ও সখের রঙ্গালয়। তবে এটি সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রাণের উৎস। 1867 সালে গিরিশচন্দ্র, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধর্মদাস শূর প্রভৃতি কয়েকজন মিলে নাট্যমঞ্চ স্থাপনের সঙ্গতির অভাবে একটি যাত্রাদল গঠন করেন। থিয়েটার করার আগ্রহাতিশয্যে শেষ পর্যন্ত দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' অভিনয়ে উদ্যোগী হন। 1868 খ্রিস্টাব্দে বাগবাজারের প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়িতে প্রথম অভিনয় হয়। নাটকটি সাতবার অভিনীত হয়েছিল। নাট্যকার স্বয়ং অভিনয় দেখে গিরিশচন্দ্র ও অর্ধেন্দু মুস্তাফীর ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। এরাই পরে 'লীলাবতী' অভিনয় করেন। এক্ষেত্রে যেহেতু কোনো অর্থানুকূল্য ছিল না তাই সীমিত পরিসরে বহু দর্শনার্থী টিকিটের বিনিময়ে অভিনয়ের প্রস্তাব দেন। সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ ছাড়াও 1852-1868 সালের মধ্যে বহু মৌলিক নাটকও লেখা হয়েছে। তাই অভিনয়ের জন্য প্রয়োজনবোধ হচ্ছিল সর্বসাধারণের দর্শনোপযোগী সাধারণ রঙ্গমঞ্চের। বাগবাজারের নাট্যমোদীরা 'লীলাবতী'র নীলদর্পণের প্রস্তুতিকালে ন্যাশনাল নবগোপালের পরামর্শে তাঁদের পরিকল্পিত নাট্যশালার নামকরণ করেন 'ন্যাশনাল থিয়েটার'। নিজেদের মধ্যে এ নিয়ে মতবিরোধের ফলে গিরিশচন্দ্র সরে দাঁড়ান। তাঁর বক্তব্য ছিল দর্শনী দিয়ে যেখানে দর্শক নাটক দেখবেন সেই ন্যাশনাল বা জাতীয় রঙ্গমঞ্চে সাধারণ সাজ-সজ্জা মঞ্চোপকরণ নিয়ে তাদের উপস্থিত হওয়া সেক্ষেত্রে বাঞ্ছনীয় হবে না। এজন্য যথেষ্ট প্রস্তুতি নেওয়া দরকার। অপরাপর সদস্যরা সীমিত সামর্থ্য নিয়েই আরম্ভ করার পক্ষপাতী ছিলেন। অবশেষে শ্যামবাজারের থিয়েটারের দল 'ন্যাশনাল থিয়েটার' (The National Theatre) নামে মধুসূদন সান্যালের চিৎপুরের ঘড়িওয়ালা বাড়ির উঠান চল্লিশ টাকায় ভাড়া নিয়ে মঞ্চ তৈরি করে অভিনয়ের আয়োজন করলেন। ক্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহায্যে ধর্মদাস শূর মঞ্চ তৈরি ও দৃশ্য রচনা করলেন। নীলদর্পণ নাটক অভিনয়ের আয়োজন হয়। অভিনয় শিক্ষক ছিলেন অর্ধেন্দুশেখর এবং ব্যবস্থাপক নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁরা প্রত্যেকে অভিনয়ও করেছিলেন। এখানে অর্ধেন্দুশেখর একাধারে মিঃ উড, সাবিত্রী, গোলক বসু এবং রায়তের মতিলাল শূর, তোরাপ, রাইচরণ অমৃতলাল ক্রমনি, মহেন্দ্রলাল পদী ময়রাণী প্রভৃতি চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। প্রথম অভিনয় হোল—শনিবার 7ই ডিসেম্বর 1872। অভিনয়ের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ অভিনয়ের জন্য ব্যয়িত হবে জেনে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' প্রশংসা করে। নাটকটি যশোহর, কৃষ্ণনগর, বহরমপুরে অভিনয় করবার প্রস্তাব দেয়। রোগ, উড চরিত্রের কথা স্মরণ করে ইংলিশম্যান নাটকটি মানহানিকর ও বন্ধ করার পরামর্শ দেয়। নীলদর্পণ অভিনয়ের পরবর্তী শনিবারগুলিতে 14, 21, 28শে ডিসেম্বর 1872 এবং 11ই জানুয়ারি 1873 ক্রমান্বয়ে জামাইবারিক, সধবার একাদশী, লীলাবতীর অভিনয় হয়। এভাবে ন্যাশনাল থিয়েটারে—(1) প্রাসাদ প্রাঙ্গণ থেকে অভিনয়কলাকে সর্বজনের সামগ্রী, অভিজাত ও ইংরেজের মনোরঞ্জন থেকে জনসাধারণের সংস্কৃতি স্পৃহাকে তৃপ্ত ও গড়ে তুলতে সাহায্য করে। (2) বাঙালি পরিচালিত, অভিনীত একমাত্র বাংলা নাটকই এখানে প্রযোজিত হয়েছে। (3) ভাড়া নেওয়া জায়গায় স্থাপিত মঞ্চ ধনীর আনুকূল্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল না। (4) অভিনেতারা কিছু অর্থ পেতেন। এ থেকেই কালক্রমে পেশাদারী অভিনেতার সৃষ্টি হয়। (5) মঞ্চে নিয়মিত অভিনয়সূত্রে নাট্যগোষ্ঠীর সূত্রপাত ঘটে। 'ন্যাশনাল পেপার'ই প্রথম এই নাট্যশালার 'জাতীয় গুরুত্বের কথা স্বীকার করে'। এই স্মরণীয় প্রতিষ্ঠানটিতে শেষ অভিনয় হয় 8ই মার্চ, 1873।

জানা যায় এই পরিণতির জন্য আর্থিক বিষয় নিয়ে আভ্যন্তরীণ কলহ ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় দায়ী। এর পর

ন্যাশনাল থিয়েটার দুটি দলে বিভক্ত(হয়ে যায়—গিরিশচন্দ্রের নেতৃত্বে 'ন্যাশনাল থিয়েটার', অপর দলটি অর্ধেন্দুশেখরের নেতৃত্বে 'হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার' নামে লিন্ডসে স্ট্রিটে 'অপেরা হাউস' ভাড়া নিয়ে অভিনয়ের আয়োজন করে। সে প্রসঙ্গ আপাতত আলোচ্য নয়।

13.7 সারাংশ (দ্বিতীয় অংশ)

. ইংরেজি ও (শ নাট্যপ্রযোজক-পরিচালকদের থিয়েটার বাঙালি বিত্তবান ও নব্যশি(ত মধ্যবিত্তদের আকৃষ্ট করে। ধনী ব্যক্তি(রা ব্যক্তি(দের উদ্যোগে মঞ্চ প্রতিষ্ঠা করে ইংরেজি ও সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ অথবা বিদ্যাসুন্দর, কালক্র(মে কতগুলি মৌলিক নাটক লিখিয়ে অভিনয়ের আয়োজন করাতেন। প্রসন্ন ঠাকুর, নবীন বসু,—তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র প্যারীমোহন, আশুতোষ দেব (সাতুবাবু), কালীপ্রসন্ন সিংহদের পারিবারিক মঞ্চের অভিনয় নানাদিক থেকে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। বেলগাছিয়ায় সিংহ ভ্রাতৃদ্বয় একসময় তো আলোড়ন তুলেছিলেন। পাথুরিয়াঘাটা, শোভাবাজার, জোড়াসাঁকো এবং বহুবাজার রঙ্গনাট্যালয় এই মঞ্চ চতুষ্টয় স্ব স্ব (ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছে। বিশেষত জোড়াসাঁকো নাট্যশালা মঞ্চ পরিকল্পনা, দৃশ্যাঙ্কন ও চরিত্রাভিনয়ে বাস্তবরীতির অনুসরণ করে স্মরণীয় হয়ে আছে।

বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে 'বাগবাজার' পরে 'শ্যামবাজার নাট্যসমাজ' সখের রঙ্গালয় হলেও এর ত(ণ অভিনেতারা তাঁদের উদ্যোগ ও নিষ্ঠায় নাট্যাভিনয়ের একটি ইতিহাস রচনা করেছেন। এঁরাই 7ই ডিসেম্বর, 1872 মধুসূদন সান্যালের বাড়ির উঠানে মঞ্চ স্থাপন করে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' উদ্বোধন করেন। প্রথম অভিনীত নাটক দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ'। থিয়েটার ধনীর ব্যক্তি(গত উদ্যোগ থেকে জনসাধারণের মধ্যে এসে পৌঁছুল।

13.8 অনুশীলনী 2

নীচেব প্র(গুলির উত্তর ক(ন। উত্তর করা হয়ে গেলে 205 পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন

1. নীচের প্র(গুলির সং(পে উত্তর দিন
   (ক) সখের নাট্যশালা বলতে আপনি কী বোঝেন?
   (খ) দর্পনারায়ণ কে?
   (গ) 'বিদ্যাসাগর' কাব্য কার রচনা? কাব্যটির সং(পে পরিচয় দিন।
   (ঘ) মধুসূদন সান্যাল কে? মঞ্চের ইতিহাস তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে সং(পে লিখুন।
   (ঙ) মনোমোহন বসুর দুটি নাটকের নাম লিখুন।
2. সঠিক উত্তরে টিক চিহ্((✓) দিন।
   (ক) নবীন বসুর বাড়ি ছিল বর্তমান
      (1) শ্যামবাজার ট্রামডিপো
      (2) শোভাবাজার
      (3) বাগবাজার
   (খ) রামজয় বসাকের বাড়িতে অভিনীত নাটকের নাম
      (1) রত্নাবলী
      (2) কুলীনকূল সর্বস্ব
      (3) একেই কি বলে সভ্যতা

(গ) বহুবাজার রঙ্গনাট্যালয়ে 'রামাভিষেক' নাটক
(1) মধুসূদন দত্ত
(2) রামনারায়ণ তর্করত্ন
(3) মনোমোহন বসু

(ঘ) 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' প্রহসনটির রচয়িতা
(1) মধুসূদন দত্ত
(2) কালীপ্রসন্ন সিংহ
(3) রামনারায়ণ তর্করত্ন

3. নীচের বক্তব্যটি ঠিক না ভুল নির্দিষ্ট ঘরে টিক (✓) চিহ্ন দিন

	ঠিক	ভুল
(ক) রত্নাবলীর সম্পর্কে মধুসূদন প্রশংসা করেছিলেন।	☐	
(খ) শোভাবাজারে 'কৃষ্ণকুমারী'র অভিনয় উচ্চ প্রশংসা লাভ করে।		
(গ) নবগোপালের পরামর্শে ন্যাশনাল থিয়েটার নামকরণ হয়।		
(ঘ) 1873 সালে ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়।		
(ঙ) সাতুবাবুর বাড়িতে 'বেণী সংহার' নাটক অভিনয় হয়।		

4. শূন্যস্থান পূর্ণ করুন
(ক) সাতুবাবুর দৌহিত্র ——— অভিনয়ে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।
(খ) প্রসন্নকুমার পিতামহ ——— ধনসম্পত্তি পিতা ——— ঠাকুরের ——— পেয়েছিলেন।
(গ) হিন্দু থিয়েটারে প্রথম রজনীতে ——— অনূদিত ভবভূতির ——— প্রথম এবং সেক্সপিয়রের ——— পঞ্চম অঙ্ক ——— অভিনীত হয়।
(ঘ) জোড়াসাঁকো নাট্যশালায় প্রথম ——☐—— ও পরে ——— অভিনয় হবে।

13.9 মূলপাঠ (তৃতীয় অংশ) বাংলা নাট্যসাহিত্যের সূচনা

আমরা যাকে Drama বা নাটক বলি তা বাঙালি সংস্কৃতির স্বাভাবিক বিবর্তন সূত্রে পাওয়া নয়। বাঙালির সংস্কৃতিতে এর আবির্ভাব উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। ইংরেজি নাটকের প্রতি আনুগত্য থেকে বাংলা নাটকের জন্ম, এবং একান্তভাবেই ইউরোপীয় নাট্যশালা বা থিয়েটারের প্রচার প্রচলন থেকে এর মানস সংস্কার গড়ে উঠেছে। থিয়েটারের প্রয়োজনেই নাটকের উদ্ভব। একে যাত্রার বিবর্তিত রূপ বলে ধরলে ভুল হবে।

সংস্কৃত সাহিত্যে দৃশ্যকাব্যের সুপ্রাচীন ইতিহাস থাকলেও বাঙালি জীবনে তার কোনো প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েনি। প্রাগাধুনিক বাঙালি জনসাধারণ লোকায়ত যাত্রা বা নাট্যগীতের রসাস্বাদনেই স্বচ্ছন্দ বোধ করছেন। ইউরোপীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত উনিশ শতকের নাটকে তাই সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য বা যাত্রার কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। এ দুটি শিল্পের আকৃতি ও প্রকৃতিগত কিছু মিল থেকেই কালক্রমে পারস্পরিক কিছু প্রভাব এসেছে মাত্র। ফলে এ সময়ের বাংলা নাটক রচনার প্রেরণা এবং বিকাশের প্রেক্ষিতে দেশীয় যাত্রা সংস্কৃত নাটক ও ইংরেজি নাট্যাদর্শের সম্মিলিত প্রয়াস ও সমন্বয় হিসেবেই গ্রহণ করা যেতে পারে। নাটকের প্রথম যুগে তাই পুরোপুরি পাশ্চাত্য আদর্শকে অনুসরণ একেবারে সম্ভব ছিল না। ফলে যাত্রা ও সংস্কৃত নাটকে রূপরীতির দিকে প্রথম যুগের নাট্যকারদের দৃষ্টি দিতে হয়েছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যখন নতুন ব্যবস্থার গোড়াপত্তন ঘটছে, গ্রামীণ মূল্যবোধে ভাঙন ধরছে, গ্রামীণ সমাজও ভাঙছে, গড়ে উঠছে নাগরিক গোষ্ঠী তখন স্মৃতিমেদুর বাংলার গ্রামে কতগুলি লোক-সঙ্গীত যেমন সৃষ্টি হচ্ছে, সেই সময় যাত্রাগান তার উৎকর্ষ হারিয়ে ভারতচন্দ্রীয় বিদ্যাসুন্দর পালার আদিরসের মধ্যে মজে অনিবার্য পরিণতির দিকে ধাবিত হচ্ছিল। কলিরাজার যাত্রা বা নলদময়ন্তীর যাত্রা অভিনয়ের সমাচার দর্পণে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা সত্ত্বেও উনিশ শতকের নাগরিক জীবনের নতুনতর জীবনবোধ ও আকাঙ্(ার তুষ্টিবিধান করতে পারেনি।

এদিকে ইংরেজ কোম্পানির কর্মচারীদের প্রয়োজনে ইংরেজি নাট্যশালার প্রবর্তন পলাশীর যুদ্ধের পূর্বেই শু(হয়েছিল, ত্র(মে তার প্রসারও ঘটেছে। সেকালের নাগরিক বাঙালির যোগ সৃষ্টি হয়েছে, তাদের নাটক-অভিনয়ের সম্পর্কে কৌতূহলও সৃষ্টি করেছে। এরই ফলশ্রুতিতে প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের মঞ্চ, কিন্তু সেখানেও ইংরেজি নাটকের অভিনয়।

আধুনিক নাটকের প্রতি শি(িত বাঙালির যথার্থ আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে প্রধানত পাশ্চাত্য শি(া প্রবর্তনের পর। হিন্দু কলেজ রিচার্ডসনের সেক্সপিয়র পঠন-পাঠন সে সময়ে একটি ইতিহাস। সেক্সপিয়রের নাট্যসাহিত্যের রস ও নাটকের কাব্যোৎকর্ষের দেশকালাতীত মহিমায় ইংরেজি শি(িত বঙ্গসমাজ আলোড়িত হয়েছিল। ইংরেজি আঙ্গিকের নাটক তখন শি(িত বাঙালির রীতিমত শ্রদ্ধা ও আগ্রহের বিষয়। ইংরেজি মঞ্চ ও সেখানে অভিনীত নাটক বাঙালি নাট্য-সংস্কারকে আরও উদ্দীপিত করে।

এদিকে বাংলায় তখন যে সমস্ত নাটক প্রকাশিত হচ্ছে তা প্রধানত সংস্কৃত নাটক প্রহসনের অনুবাদ— হাস্যার্ণব (1822), ধূর্তনর্তক, ধূর্তসমাগম কৃষ(মিশ্রের ছয় অঙ্কে 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' 'আত্মতত্ত্বকৌমুদী' (1822) রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারের 'কৌতুকসর্বস্ব' (1828), রামতারক ভট্টাচার্যের 'শকুন্তলা' (1848), নীলমনি পালের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' (1849) প্রভৃতি। এঁদের ভাষা ছিল আড়ষ্ট ও প্রাণহীন, অভিনয়ের প(সম্পূর্ণ অযোগ্য। এই পরিস্থিতিতে বাংলা মঞ্চে নাটকের অভাববোধ যথার্থই পীড়িত করেছেন। নবীন বসুর বাড়িতে বিদ্যাসুন্দর অভিনয়ের পর প্রায় 25 বছর কোনো সখের মঞ্চও এদিকে উদ্যোগ নেয়নি। সাতুবাবুর বাড়িতে নন্দকুমার রায়ের শকুন্তলা অভিনয় (30-6-1857) হয়। পেট্রিয়টের ভাষায় "The play was a genuine Bengali one." ইতোমধ্যে শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে 1852 থেকে বাংলা নাটক লেখার জোয়ার এলো।

এ সময় সংস্কৃত ও ইংরেজি নাটকের অনুবাদ এবং মৌলিক নাটক রচনা করতে বহু নাট্যকার এগিয়ে এলেন। ইংরেজি রীতিতে নাটক লিখলেন যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত, তারাচরণ শিকদার এবং হরচন্দ্র ঘোষ। প্রথম দু'জন একটি করে নাটক লিখেছেন দেশীয় ঐতিহ্য থেকে কাহিনী নিয়ে কিন্তু তাদের আঙ্গিক পরিকল্পনায় পাশ্চাত্য প্রভাব সুস্পষ্ট। জি.সি. গুপ্তের কীর্তিবিলাস এ তারাচরণের ভদ্রার্জুন নাটক দুটিই 1852 খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত। 'কীর্তিবিলাস' বাংলা ভাষায় প্রকাশিত প্রথম ট্রাজেডি। সংস্কৃত নাটক কখনই বিয়োগান্তক হয় না, সে হয়তো এ দেশের জীবন সম্পর্কে মূল্যবোধ থেকেই। তাই এই ব্যতিত্র(ম সৃষ্টির জন্য ভূমিকাতে তিনি 'আরিস্টল নামক গ্রিস দেশীয় পণ্ডিত' এবং 'সেক্সপীয়র' নামক ইংলন্ডীয় মহাকবির প্রসঙ্গ উত্থাপন করে যুক্তি(বিন্যাস করেছেন। 'কীর্তিবিলাস'-এর কাহিনী দেশী রূপকথা থেকে নেওয়া হলেও পাশ্চাত্যভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে বিষদান্তক পরিণতি দান ছাড়াও কীর্তিবিলাস চরিত্র পরিকল্পনায় হ্যামলেটের ছায়া আরোপ করেছেন। নাটকটিতে সংস্কৃত নাটকের নান্দী, সূত্রধার এবং দৃশ্য বোঝাতে 'অভিনয়' শব্দ ব্যবহার করেছেন। প্-ট বিন্যাসে শৈথিল্য ভাষায় আড়ষ্টতা, গদ্য সংলাপ কৃত্রিম, পদ্য সংলাপ ঈশ্বর গুপ্তের ছাঁদে ঢালা, চরিত্র

গঠনে দুর্বলতার পরিচয় আছে তথাপি প্রথম বাংলা নাটক রচনায়, বিশেষ ট্রাজেডি রচনায় তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা স্মরণ করতে হবে।

তারাচরণ শিকদারের ভদ্রার্জুন 'কমেডি' বা 'শুভান্তক' নাটক। কাশীরাম দাসের মহাভারত থেকে নেওয়া অর্জুন কর্তৃক সুভদ্রা হরণের কাহিনী নিয়ে লেখা। পাঁচ অঙ্কে এবং প্রতিটি অঙ্ক 'সংযোগস্থল' বা দৃশ্যে বিভক্ত(। নাটকে একটি আভাস বা প্রস্তাবনা আছে। সংলাপ গদ্য-পদ্য মিশ্রিত। আলোচ্য দু'জন নাট্যকারই প-ট গঠনে, চরিত্র সৃষ্টিতে কিংবা সংলাপ রচনায় কোথাও দ(তা দেখাতে পারেননি। বাংলা নাটকের সূচনাপর্বে ইংরেজি নাটকের প্রতি আকর্ষণ সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য আঙ্গিক নিয়ে যে কিছু দ্বিধা ছিল তা তাঁদের রচনার মধ্যেই ফুটে উঠেছে।

বাইশ বছরের ব্যবধানে চারটি নাটক লিখেছেন হরচন্দ্র ঘোষ। ইনি সেক্সপিয়রের নাটকের প্রথম অনুবাদক। তাঁর প্রথম নাটক 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' (1853) The Merchant of Venice-এর "আনুপূর্বিক অনুবাদ না হউক...সম্পূর্ণ আখ্যানের মর্মগ্রহণ" করে রচিত। নাটকটি "ভদ্রসমাজে মনোনীত" হয়নি। সেক্সপিয়রের অপর নাটক Romeo and Juliet-এর অনুসরণে 'চা(মুখ চিত্তহরা' (1860) অনুবাদ করলেও নাটকের সূচনায় সংস্কৃত নাটকের মত নান্দী ও প্রস্তাবনা আছে। মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে কৌরব বিয়োগ (1858) এবং রজতগিরি নন্দিনী (1874) "ব্রহ্মদেশীয় এক মনোহর কাব্য আধুনিক নাটকের প্রণালীতে" রচনা করেন। মধুসূদন, দীনবন্ধুর সমকালে বাস করেও প্রতিটি ে(ত্রে "হরচন্দ্রের উদ্যমের ব্যর্থতা" প্রকাশ পেয়েছে।

বাঙালি জীবনের সে যুগের বাস্তব সমস্যা নিয়ে মৌলিক নাটক রচনার প্রথম কৃতিত্ব রামনারায়ণ তর্করত্নের। ইনিই প্রথম মঞ্চসফল নাটকের নাট্যকার। জনপ্রিয়তার উপহার স্বরূপ 'নাটুকে রামনারায়ণ' নামে সে যুগে পরিচিতি ছিলেন। কৌলীন্য প্রথার বি(দ্ধে প্রচারের উদ্দেশ্যে রামনারায়ণ লঘু ভঙ্গীতে তাঁর প্রথম নাটক 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব' (1853) রচনা করেন। এটি প্রহসন শ্রেণীর রচনা হলেও বিষয়বস্তু, নাটকীয়তা, নাট্যভাষা এবং সার্থক নাটকীয় চরিত্র সৃষ্টির বৈশিষ্ট্যগুণে যথার্থই সার্থকতার অধিকারী। নাটকের কুলপালকের তিন কন্যার চরিত্র সৃষ্টি ও তাদের সংলাপ রচনায় তিনি বিস্ময়করভাবে জীবনবোধের পরিচয় দিয়েছেন। আধুনিক ইংরেজি শি(ার সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় না থাকায় ইংরেজি প্রহসন সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণা ছিল না। তাই নাটকটি সংস্কৃত প্রহসনের মত বিচ্ছিন্ন দৃশ্যের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। এই প্রহসনে সমাজের কৌলীন্যপ্রথা সম্পর্কে তাঁর প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তীকালে সমাজের অপর সমস্যা 'বহুবিবাহ'কে ধিক্কার দিয়ে লেখা 'নবনাটক' (1866) একাধিক মৃত্যুর ঘটনায় অতিনাটকীয় ও তেমন সার্থক প্রতিপন্ন হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে উপরিউক্ত(দুটি নাটকই 'ফরমায়েসী' নাটক। কৌলীন্য প্রথার মত জাতীয় জীবনের জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে শ্রেষ্ঠ নাটক রচয়িতাকে পুরস্কার দেবেন এই ঘোষণা রংপুরের জমিদার সংবাদপত্র মারফত জানিয়েছিলেন। এজন্য 50/- টাকা পারিতোষিকও ঘোষিত হয়েছিল। বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয়ক 'নবনাটক' জোড়াসাঁকো নাট্যশালার পুরস্কার ঘোষণা উপল(্য করে লেখা।

রামনারায়ণের অপরাপর নাটকের মধ্যে 'বেণীসংহার' (1856), বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত রত্নাবলী (1858), অভিজ্ঞান শকুন্তলা (1860), মালতী মাধব (1867) অনুবাদ এবং (ক্মিণীহরণ (1871), কংসবধ (1875) এবং ধর্মবিজয় (1875) পুরাণাশ্রিত মৌলিক নাটক। অনুবাদ নাটকের মধ্যে কোনো বৈশিষ্ট্যের ছাপ নেই। ভাষায় জড়তা আছে। অনুশীলনের জন্যই রচিত। কিন্তু পৌরাণিক নাটকগুলি সংস্কৃত নাটকের আদর্শে রচিত। কাহিনী বা চরিত্র সৃষ্টিতে কোনো বিশেষত্ব নেই। বর্ণনামূলক সংলাপ নাটকে প্রাণসঞ্চার করতে পারেনি। এছাড়াও তিনি 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' (1865), চ(দান (1869) প্রভৃতি লঘু নাটকও রচনা করেন।

যতদূর জানা যায় রামনারায়ণের নাটকগুলি সে সময় সৌখিন নাট্যশালায় বহুবার প্রশংসার সঙ্গে অভিনীত* হয়ে দর্শককে আনন্দ দিয়েছিল। বাঙালির সামাজিক পারিবারিক জীবনকে নাট্যরূপ দিয়ে তা মঞ্চে সার্থকভাবে রূপায়িত করা যায়, এই আত্মবি(্বাস নাট্যকারদের মধ্যে তিনিই প্রথম সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর উচ্চাঙ্গের নাট্যপ্রতিভা না থাকা সত্ত্বেও রচনায় বৈচিত্র্য ও কৌতুকরসের জোগান দিয়ে জীবনের প্রতি গভীর সহানুভূতির যে চিত্র এঁকেছেন, তা পরবর্তী নাট্যকারদের প্রেরণাস্থল হয়েছে। সম্ভবত কৌলীন্য ও বহুবিবাহের মত সমকালীন সমাজের অপর সমস্যা, বিদ্যাসাগর যার বি(দ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, সেই বিধবা বিবাহ নিয়ে এসময় বহু নাটক লেখবার প্রেরণা, রামনারায়ণের কাছ থেকেই এসেছিল। এ(ত্রে উল্লেখযোগ্য নাট্যকার উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা বিবাহ নাটক' (1856) যেমন আছে, তেমনি অন্যান্য নাট্যকার রচিত 'বিধবোদ্বাহ' (1856), বিধবা মনোরঞ্জন (1856), বিধবা পরিণয়োৎসব (1857), বিধবা বিবাহ (1860) প্রভৃতিও উল্লেখ করবার মত।

উপসংহারে একথা বলা যায় যে, নাট্যসাহিত্যের সূচনায় যোগেশচন্দ্র থেকে রামনারায়ণ পর্যন্ত নাট্যকারেরা থিয়েটারি নাটকের অনভ্যস্ত পথে চলতে গিয়ে অনেক দ্বিধা সংশয়ের মধ্য দিয়ে পথের সন্ধান করেছেন এ পর্বে। সখের থিয়েটারের প্রয়োজনে প্রাথমিকভাবে ইংরেজি-সংস্কৃত থেকে অনুবাদ যেমন করা হয়েছে, আঙ্গিকের দিক থেকে অসংশয়িত পদ(েপ নেবার শক্তি(বা প্রতিভা না থাকায় বাংলা নাটককে মধুসূদনের আবির্ভাব পর্যন্ত অপে(া করতে হয়েছে। তবে একথা ঠিক সূচনাকালেই বাংলা নাট্যসাহিত্যে ট্রাজেডি, কমেডি এবং প্রহসন রচনা যেমন হয়েছে, তেমনি পৌরাণিক এবং সামাজিক নাটকও নতুন যুগের নতুন দৃষ্টি দিয়ে নাট্যকারেরা সৃষ্টি করেছেন।

13.10 সারাংশ (তৃতীয় অংশ)

ইংরেজি নাটকের অনুসরণেই বাংলা নাটকের জন্ম। দেশীয় ঐতিহ্য সূচনাপর্বে কখনো কখনো নাট্যকারদের দ্বিধান্বিত করেছে। প্রধানত মঞ্চের প্রয়োজনেই নাটক। সংস্কৃত বা ইংরেজি নাটকের অনুবাদ সেদিক থেকে রসপরিতৃপ্তি ঘটাচ্ছিল না। হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠায় রিচার্ডসনের সেক্সপিয়র পঠন-পাঠন নব্যশি(িত বাঙালি সমাজে নূতন পথের দিশা দিয়েছে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা নাটকের যাত্রা শু(। 1852 খ্রিস্টাব্দে জি. সি. গুপ্ত 'কীর্তিবিলাস' ট্রাজেডি ও তারাচরণ শিকদার 'ভদ্রার্জুন' কমেডি নাটক লেখেন। প্রথমোক্ত(জন সেক্সপিয়রকে স্মরণ করেও নাটকে 'নান্দী', 'সূত্রধর' এনেছেন। হরচন্দ্র সেক্সপিয়রের নাটকের অনুবাদ দিয়ে শু(করেন। রামনারায়ণের আবির্ভাব সমাজচেতনা সম্পন্ন নাটক নিয়ে। 'কুলীনকূল সর্বস্ব', 'নবনাটক' দুটিই ফরমায়েসি নাটক, পুরস্কারও পেয়েছিল। তাঁর ইংরেজি বিদ্যাচর্চা তেমন কিছু ছিল না, তথাপি নাটককে রূপায়িত সমাজের সে সময়ের জীবন্ত সমস্যা নাট্যকারের গভীর সহানুভূতিতে দর্শক-পাঠককে উদ্বুদ্ধ করেছে।

---

* **পাদটীকা** কুলীনকূল সর্বস্ব (চার বার), রত্নাবলী (সাত বার), যেমন কর্ম তেমনি ফল (নয় বার), মালতীমাধব (এগার বার), (ক্মিণী হরণ (এগার বার), বেণী সংহার ও নবনাট্য (একবার) অভিনীত হয়েছিল।

13.11 অনুশীলনী 3

নীচের প্র(গুলির উত্তর ক(ন। উত্তর করা হয়ে গেলে 205 পৃষ্ঠার উত্তর সংকেত দেখুন।

1. শূন্যস্থান পূর্ণ ক(ন
   (ক) ইউরোপীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত ———নাটকে ——বা ——কোনো প্রত্য(সম্পর্ক নেই।
   (খ) হিন্দু কলেজে —— পঠন-পাঠন একটি ইতিহাস।
   (গ) জি. সি. গুপ্তের —— ও তারাচরণ শিকদারের ——নাটক দুটিই ——খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত।
   (ঘ) বাঙালি জীবনের সে যুগের ——নিয়ে ——নাটক রচনার প্রথম কৃতিত্ব——।
   (ঙ) বহু বিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয়ক —— জোড়াসাঁকো নাট্যশালার ——ঘোষণাকে উপল(্য করে লেখা।
   (চ) বাঙালি সামাজিক ——জীবনকে —— দিয়ে তা মঞ্চে যথার্থভাবে ——যায়, এই —— মধ্যে তিনিই প্রথম সৃষ্টি করেছিলেন।

2. সঠিক উত্তরে টিক ( ) চিহ্(দিন

	ঠিক	ভুল
(ক) থিয়েটারের প্রয়োজনেই নাটকের উদ্ভব।	☐	
(খ) 'কুলিরাজার পালা' বা 'নলদময়ন্তীর যাত্রা' অভিনয়ের প্রশংসা হয়েছিল।		
(গ) 'ধূর্ত নর্তক', 'ধূর্তসমাগম' দুটি উল্লেখযোগ্য মৌলিক নাটক।		
(ঘ) 'ভানুমতী চিত্তবলাস' একটি পৌরাণিক নাটক।		
(ঙ) রামনারায়ণ তর্করত্নের 'ধর্মবিজয়' নাটক সংস্কৃত থেকে অনুবাদ।		

3. সং(েপে উত্তর দিন
   (ক) সেক্সপিয়রের দুটি অনুবাদ নাটকের নাম ক(ন।
   (খ) 'কীর্তিবিলাস নাটকটি সম্পর্কে সং(েপে আলোচনা ক(ন।
   (গ) রামনারায়ণ তর্করত্নের দুটি করে সামাজিক, পুরাণমিশ্রিত মৌলিক এবং পুরাণাশ্রিত অনুবাদ নাটকের নাম উল্লেখ ক(ন।
   (ঘ) 'রজতগিরি নন্দিনী' নাটকটি সম্পর্কে সং(প্ত পরিচয় দিন।

13.12 মূলপাঠ (চতুর্থ অংশ) নাট্যসাহিত্যের বিকাশ—প্রতিষ্ঠা

কলকাতার সমাজের অনেকটাই যখন 'অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে' আছেন সেই সময় আকস্মিক একটি ঘটনার সূত্র ধরে পাশ্চাত্য সাহিত্যরসস্নাত মাইকেল মধুসূদন দত্ত (1824-1873)-র নাট্যজগতে আবির্ভাব। মহাভারতের শমিষ্ঠা-দেবযানী কাহিনী অবলম্বনে তাঁর প্রথম নাটক 'শমিষ্ঠা' (1859) প্রকাশ পায়।

তাঁর এই আবির্ভাব এমন একটি সময়ে যখন নাটকে চলছিল ইতস্তত পথ খোঁজার পর্ব। যাত্রার ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে সংস্কৃত ও ইংরেজি নাট্যকলার মধ্যে নাটকের অনুসন্ধান চলতে থাকে। এর পরিচয় শর্মিষ্ঠাতেও

আছে। এখানে তিনি সংস্কৃতের প্রভাব এড়িয়ে যেতে পারেননি। প্রথম সংস্করণে প্রস্তাবনা সঙ্গীত ও উপসংহারগীতি ছিল, পরে বাদ দেওয়া হয়েছে। নাটকের প-টে গতির অভাব—ঘটনায় দ্বন্দ্বের তুলনায় বিবৃতি ও বর্ণনার প্রাধান্য। চরিত্র পরিকল্পনায় কিছু অভিনবত্ব আছে। তিনি মহাভারত কাহিনীর নায়িকা দেবযানীর পরিবর্তে শর্মিষ্ঠাকে তাঁর নাটকে নায়িকা করেছেন। মহাভারতে দেবযানী মহিমময়ী ব্যক্তি(ত্বসম্পন্না, শর্মিষ্ঠা ঈর্ষাপরায়ণ, কলহপ্রিয়(মধুসূদনে দেবযানী ক্রে(াধ ও ঈর্ষাপরায়ণ, শর্মিষ্ঠা অনকটা নমনীয়।

পরবর্তী নাটক 'পদ্মাবতী'তে (1860) গ্রিক কাহিনী অ্যাপল অফ ডিসকর্ড (Apple of discord)-এর আখ্যান ভারতীয় পৌরাণিক পরিবেশে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে এ এক নূতন পরী(া বলা যায়। মধুসূদন প্রতিভার সার্থক স্ফূরণ এখানে ঘটেনি। দৃশ্যসংস্থান, চরিত্র সৃষ্টি প্রভৃতিতে অনেকটা দুর্বলতা থেকে গেছে। নারদ চরিত্রের কৌতুককর রূপ এবং য়ুরোপীয় 'ভিলেন' হিসেবে কালপু(ষ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত(চরিত্র সৃষ্টিতে খ্রিস্টিয় আদি অকল্যাণ ও পাপকে যেন নাট্যকার ধরতে চেয়েছেন। চমকপ্রদ আখ্যান-সন্নিবেশ ও বহিরাগত বিপদজালের মধ্যে যতটুকু নাটকীয় রস পরিস্ফুট করা সম্ভব তার বেশি যেন তিনি এখানে আর কিছু চাননি। দেবনির্ভর, অলৌকিকতা-পিয়াসী বাঙালি (চির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তিনি তাঁর নাট্যকলাকে এখানে নিয়মিত করেছেন মাত্র। এই নাটকের দু'একটি সংলাপে মধুসূদন অমিত্রা(র ছন্দের ব্যবহার করেছেন। ছন্দের ইতিহাসে তথ্যটি গু(ত্বপূর্ণ।

'পদ্মাবতী' রচনার বছরেই— 1860 খ্রিস্টাব্দে মধুসূদন দুটি প্রহসন—'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' রচনা করেন। ইতিপূর্বে রচিত কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বাবু' (1855) বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রহসন হলেও রচনাটি হুতোমের দুর্বলতার সংস্করণ। প্রহসন দুটি সমকালে তো বটেই অদ্যাবধি উৎকৃষ্টতর রচনা হিসেবে মান্য। রচনা দুটিতে বিষয়-ভাবনা, বি(্রাস, নাটকীয় রস ও সংলাপে কোথাও সংস্কৃত প্রহসনের আদর্শের অনুকরণ নেই। ইংরেজি 'কমেডি অফ ম্যানারস'-ই এদের আদর্শ। এদিক থেকে প্রহসন দুটির ঐতিহাসিক মূল্য অছে। বাংলা নাটকে এই প্রথম ইংরেজি নাট্যশৈলীর আদর্শ রূপ পরিস্ফুট হয়েছে। একটি উদ্দেশ্য সামনে রেখে প্রহসন দুটি রচিত হলেও অভ্রান্ত জীবনবোধ তী(্র ব্যাঙ্গের আঘাত এবং নাটকীয় একমুখীনতা রচনা দু'টির সাহিত্যিক আবেদন ও রস-সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে। ইংরেজি শি(িত যুব সমাজের যে উচ্ছৃঙ্খলতা ও পরানুকারিতা এবং প্রবীণ সমাজপতিদের লাম্পট্য ও ভণ্ডামি ব্যাপক হয়ে পড়েছিল, মধুসূদন তার মর্মমূলে নাড়া দিয়েছেন। তিনি ব্যক্তি(গত ব্যভিচার বা সমষ্টিগত উচ্ছৃঙ্খলতা কোনটিকেই সমাজের প(মঙ্গলজনক মনে করেননি, তাই প্রহসন দুটির প্রথমটিতে মেকি নীতিবাদ ও (চিবোধের এবং দ্বিতীয়টিতে ব্যঙ্গের মাধ্যমে ধর্মধ্বজ দুশ্চরিত্রদের মুখোশ খোলবার চেষ্টা ল(করা যায়। প্রহসনের চরিত্রসৃষ্টিতে মধুসূদন সফল। প্রথমটিতে ছোট ছোট সংলাপের মধ্য দিয়ে চরিত্রগুলি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। বুড় সালিকের দরিদ্র কৃষক হানিফের বলিষ্ঠতা ও ক্রে(াধ তার কৃষক স্বভাবের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। প্রহসন দুটির ভাষা সহজ, সরস বিশুদ্ধ কথ্যভাষা। সংলাপ চরিত্রানুযায়ী। প্রথমোক্ত(টিতে কলকাতার কথ্যভাষা, তার উচ্চারণভঙ্গি এবং ইংরেজি বুলি, শেষোক্ত(টিতে ফারসি মেশানো গ্রাম্য কথ্যবুলি মানুষগুলিকে চিনতে যথেষ্ট সাহায্য করে। প্রহসন দুটিতে সেকালের নব্যতন্ত্রী ও প্রাচীন-পন্থীদের সমালোচনা থাকায়, মধুসূদন তাঁদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। তথাপি আজও এ দুটি রচনাকে পরবর্তীকালের কোনো প্রহসনই অতিক্র(ম করতে পারেনি।

মধুসূদনের কৃষ(কুমারী (1861) বাংলা সাহিত্যের প্রথম ঐতিহাসিক নাটক। টডের রাজস্থান কাহিনীর এক ভাগ্যহত রাজকুমারীকে অবলম্বন করে এর দ্বন্দ্বময় নাট্য(ক্র তৈরি করা হয়েছে। মধুসূদনের এই নাটকটি নানা

কারণে বাংলা নাট্যসাহিত্যের যুগান্তকারী সৃষ্টি। প্রথমত এটিই প্রথম ঐতিহাসিক নাটক। এ নাটকে নাট্যকারকে স্বদেশপ্রীতি ও স্বাজাত্যবোধের প্রকাশ আছে(দ্বিতীয়ত সংস্কৃত নাট্যরীতির আদর্শমুক্ত(। প্-ট নাট্যোপযোগী, গতিশীল, পরিণতি স্বাভাবিক। রচনাটিতে গ্রিক ট্রাজেডির ছায়াপাত ঘটেছে(তৃতীয়ত চরিত্রসৃষ্টিতেও সম্পূর্ণ গতানুগতিকতা মুক্ত(ও মৌলিক। এ সব বৈশিষ্ট্যের জন্য 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' মন্তব্য করেছিল, 'কৃষ(কুমারী বাংলা ভাষায় সর্বশ্রেষ্ঠ এবং একমাত্র মৌলিক নাটক।...নাট্যমঞ্চে এই নাটকটির বিচিত্র ঘটনাবলির অভিনয় কম কৃতিত্বের কথা নয়। সম্পূর্ণ গদ্যে লেখা এই নাটকের সংলাপ রচনায় মধুসূদন গদ্যশিল্পের নূতন পরী(া করেছেন। তখনও নাট্য সংলাপ রচনার কোনো আদর্শ প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় মধুসূদন দুর্বল ও জড়তাগ্রস্থ এক ভাষা নিয়ে যে দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়েছিলেন, তা থেকেই ভবিষ্যতে নাট্যকারগণ নূতন পথের সন্ধান পেয়েছেন। তাই সংলাপ রচনার নানা ত্রুটি সত্ত্বেও এ বিষয়ে তাঁকে সাধুবাদ দিতে হয়।

মধুসূদনের সর্বশেষ নাটক 'মায়াকানন'। তখন তাঁর প্রতিভার সামান্যই অবশেষ রয়েছে। নেহাতই অর্থের প্রয়োজনে মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে রোগশয্যায় একটি কাল্পনিক অতীতাশ্রয়ী কাহিনী নিয়ে এটি লেখা। রচনাটি সংস্কারের প্রয়োজন ছিল। 1875 খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর এটি প্রকাশিত হয়। প্রতিকূল দৈবের কাছে মানুষের সমস্ত আকাঙ(া কেমন করে ধ্বংস হয়, গভীর ভালবাসা কেমন করে বিপর্যস্ত হয়, তারই মর্মান্তিক রূপ ফুটে উঠেছে এই নাটকে। এতে মধুসূদনের শেষ জীবনের আত্মগ্-ানির দহনজ্বালা প্রকাশিত হয়েছে বলে মনে হয়। মায়াকাননের ট্রাজেডি 'নিষ্ক(ণ ও শোকাবহ'। পরিশেষে 'রিজিয়া' নামে একটি নাটক লেখবার আয়োজন করেও শেষ করতে পারেননি।

মধুসূদনের নাট্যকার জীবন 1859-1861 তিন বৎসরের। এই সময়ে প্রকাশিত হয়েছে নাটক ও প্রহসন পাঁচটি ('মায়াকানন' মৃত্যুর পর প্রকাশিত)। কৃষ(কুমারী রচনার পর অন্তরের তাগিদে তিনি আরো নাটক রচনায় হাত দেননি। পেছনে মনে হয় একটি অভিমান সক্রি(য় ছিল। বেলগাছিয়া 'শর্মিষ্ঠা' অভিনয়ের পর তিনি আশা করেছিলেন, তাঁর প্রহসন দুটির সেখানে অভিনয় হবে, অন্তত 'কৃষ(কুমারী' সেখানে স্থান পাবে, তাও হয়নি। মধুসূদন "সমস্ত আশা নষ্ট" হওয়ায় মর্মাহত হন। নাটক লেখাও একরকম শেষ হয়। কিন্তু তাঁর বিবিধ ভাষা-সাহিত্য রস-রসিক প্রতিভার আবির্ভাব বাংলা নাটক অনিশ্চিত পরী(ার উদ্দেশ্যহীন গতি থেকে সুনির্দ্দিষ্ট পথের সন্ধান পেয়েছে।

দীনবন্ধু মিত্র (1830-1873)-র প্রথম নাটক 'নীলদর্পণ' (1860) সেকালের কৃষক সমাজের দুষ্টগ্রহ নীলকরদের অত্যাচারের ঘটনাবলী অবলম্বনে রচিত। দীনবন্ধু সরকারি চাকরি করতেন—ডাক বিভাগে উচ্চপদে আসীন ছিলেন। তিনি রাজরোষের আশঙ্কায় একটি সংস্কৃত (-াকে আত্মপরিচয় দিয়েছিলেন। যার অর্থ বিষধর নীলকরদের দংশন-কাতর প্রজাদের উদ্ধারের জন্য জনৈক পথিক কর্তৃক রচিত। নাটকটির নানা কারণে ঐতিহাসিক ভূমিকা আছে। নাটকটির ইংরেজি অনুবাদ পাদরি লঙ 1861 খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেন। নাটকে দরিদ্র অসহায় কৃষকদের অর্থনৈতিক শোষণের যে বীভৎস চিত্র ফুটে উঠেছে, তা দেখে দেশে-বিদেশে নীলকর বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে ওঠে। এ নাটক সমস্ত দেশের বিবেকবান মানুষকে (ুব্ধ করে তুলেছিল, তেমনি নাট্যকারদেরও প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। তথাপি নাটকটি দুর্বল—ভদ্র চরিত্র সৃষ্টিতে ব্যর্থতা, তাদের সংলাপের ভাষা আড়ষ্ট ও কৃত্রিম, নাটকের শেষে মৃত্যুর ঘনঘটা এই দুর্বলতার জন্য দায়ী। ভদ্রেতর চরিত্রগুলি জীবন্ত। এ(েত্রে দীনবন্ধুর 'সহানুভূতি প্রবল ছিল'। তাই দেখি গ্রাম্য মেয়ে-পু(ষের আচার-আচরণ কথাবার্তা বাস্তবসম্মত।

নীলদর্পণের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা কাহিনী-গঠনে সংহতির অভাব। বসু পরিবারের সঙ্গে সাধুচরণ রাইচরণের

অর্থাৎ সম্পন্ন মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র চাষি পরিবারের মধ্যে অচ্ছেদ্য নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলা হয়নি। বৃহৎ কৃষকগোষ্ঠীর সর্বব্যাপী সর্বনাশের ট্রাজেডি আঁকতে গিয়ে বসু পরিবারের ক(ণ পরিণতির ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। দীনবন্ধুর নীলদর্পণ সচেতন বাঙালি মনে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল তারই সূত্র ধরে যে সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টি হয়, তার অনুষঙ্গ হিসেবে মীর মোশারফ হোসেনের 'জমিদার দর্পণ' রচিত হয়। এছাড়াও দ(ণারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের 'চা-কর দর্পণ' (1875), জেল দর্পণ, পল্লীগ্রাম দর্পণ প্রভৃতি অন্যান্য দর্পণ-নাটক প্রকাশিত হয়।

এর পর দীনবন্ধুর 'নবীন তপস্বিনী' (1863), 'লীলাবতী' (1867) এবং 'কমলেকামিনি' (1873) প্রকাশিত হয়। কোনোটিই যথার্থ ট্রাজেডি হয়নি। এমন কি নীলদর্পণের সমক(নয়। এই সব নাটক রচনার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর সৃষ্টি প্রত্রি(য়াকে সচল রেখেছেন, তা সত্ত্বেও কোনোটি উজ্জ্বল রচনা নয়। বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধু সম্পর্কে বলেছিলেন প্রকৃত ঘটনা, জীবিত ব্যক্তি(, প্রাচীন উপন্যাস ইংরেজি বই এবং প্রচলিত খোসগল্প থেকে সং(প্তসার নিয়ে তিনি নাটকের চরিত্র সৃষ্টি করেন। 'নবীন তপস্বিনীতে'—এ রকমটি দেখা গেলেও, 'লীলাবতী'-তে দেখা যায়নি। অপরিমিত আয়াস সহকারে 'লীলাবতী' রচনা করলেও সুদীর্ঘ সংলাপ ও আড়ষ্ট ভাষা নাটকটির ব্যর্থতার জন্য দায়ী। বীররস প্রতিপাদন ল(্য হলেও 'কমলে কামিনী' নাট্যকারের কোনো গৌরব বৃদ্ধি করেনি।

দীনবন্ধু তিনটি প্রহসন রচনা করেছিলেন—'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (1866), 'সধবার একাদশী' (1866) এবং 'জামাই বারিক' (1872)। এদের মধ্যে 'সধবার একাদশী' মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় বর্ণিত অব(য়ের আরও বিস্তৃত ও সার্থক রূপায়ণ। এই নাটকের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ এবং হাস্যরস দীনবন্ধুকে উচ্চশ্রেণীর কমেডি লেখকরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রহসনের প্রধান চরিত্র নিমচাঁদ। নিমচাঁদ প্রহসনের সর্বস্ব। নিমচাঁদ দীনবন্ধুর অপূর্ব সৃষ্টি—শুধু এই প্রহসনই নয় সমস্ত বাংলা সাহিত্যে এই চরিত্রটি "(রধার মনীষা ও অভাবনীয় নৈতিক অধঃপতন, আকাশস্পর্শী কল্পনা ও তার শোচনীয় বাস্তব পরিণতি, নির্লজ্জ মোসাহেবী ও মর্মভেদী অনুশোচনার সমন্বয়ে" উনিশ শতকের যোগ্য প্রতিনিধিরূপে বিরাজ করছে।

বিয়ে পাগলা বুড়ো ও জামাই বারিক-এ সামাজিক ব্যঙ্গের পরিবর্তে ব্যক্তি(চরিত্রের দুর্বলতাকে কেন্দ্র করে স্থূলহাস্যরস সৃষ্টি করা হয়েছে। বাড়িতে বিধবা মেয়ে ও নাতনি আছে। বৃদ্ধ পুনর্বিবাহের আয়োজন করলে ছেলেদের হাতে কীভাবে অপদস্থ হল তার কাহিনী। এতে 'বুড় সালিকে'র প্রভাব থাকলেও বুড় সালিকের মত তী্ব সমাজ চেতনার পরিচয় নেই। জামাইবারিক ঘরজামাই এবং বহুবিবাহ প্রথাকে ব্যঙ্গ করে লেখা। কাহিনী সুগঠিত। ভাষায় কৌতুকরসের সহজ প্রকাশ আছে।

দীনবন্ধুর নীলদর্পণ নিয়ে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের আত্মপ্রকাশ (1866)। এটি তাঁর নাট্যকৃতির অন্যতম স্বা(র। নীলদর্পণ শহর-গ্রামে বহুবার অভিনীত হয়েছে। এই অভিনয় জাতীয় জীবনে বিরাট আলোড়ন তুলেছিল বোঝা যায় বিদ্যাসাগরের মত স্থিতধী মানুষের আবেগ-চঞ্চল হওয়ার ঘটনা থেকে। জাতীয়-নাট্যশালার সাফল্য পেশাদার নট-নাট্যশালার প্রসার ঘটাতে সাহায্য করেছে যেমন, তেমনি এই সাফল্য নাট্যরচনার (ে ত্রেও বহু প্রতিভাধর ব্যক্তি(কে নাটক লেখায় উদ্বুদ্ধ করেছে। সাধারণ রঙ্গমঞ্চের চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে বাংলা নাটক দর্শকের (চি অনেকটা নিয়ন্ত্রিত করতে থাকে। এই পরিবেশে মনোমোহন বসু (1831-1912) আবির্ভাব। ইনি হিন্দু মেলার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হওয়ায় স্বাদেশিকতা তাঁর অন্তরের বস্তু ছিল। বাংলা নাট্যসাহিত্যকে সেই স্বাদেশিকতার দৃষ্টি দিয়ে দেখতে চেয়েছেন। ফলে পুরানো দেশজরীতির দিকে বাংলা মঞ্চ ও নাটকের চোখ ফেরাতে চেয়েছিলেন। তিনি একদিকে কবি এবং জাতীয় সঙ্গীত রচনা করে জনপ্রিয় হয়েছেন, তেমনি যে যাত্রার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে নাটকের সৃষ্টি হয়েছিল, সেই যাত্রার অনুপ্রবেশও তিনি নাটকে ঘটালেন। তাঁর নাটকে বেশি বেশি করে গান যুক্ত(

করে নাটককে গীতাভিনয়ের পর্যায়ে নিয়ে যান। এই বৈশিষ্ট্য তাঁকে নাটকের সাধারণ ধারা থেকে একটি স্বতন্ত্র পথে নিয়ে গিয়েছিল। মনোমোহনের প্রথম নাটক 'রামাভিষেক বা রামের অধিবাস বা বনবাস' (1867)। অন্যান্য নাটকের মধ্যে 'সতী' (1873), 'হরিশ্চন্দ্র' (1875) উল্লেখযোগ্য। এগুলি পৌরাণিক নাটক। এতে ভক্তি(রসের প্রাচুর্য আছে। হরিশ্চন্দ্রে ভক্তি(র সঙ্গে হিন্দুমেলার বাণীটিও অত্যন্ত স্পষ্ট। মনোমোহনের নাটক আলোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রথমত ইংরেজি নাট্যসাহিত্যের সঙ্গে তাঁর তেমন যোগাযোগ ছিল না(দ্বিতীয়ত তিনি সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের কোনো কোনো বৈশিষ্ট্য তাঁর নাটকে যুক্ত(করেছিলেন(তৃতীয়ত যাত্রার আবেগময় অতিনাটকীয় ভক্তিকে তিনি নাটকে বহুল ব্যবহার করেছেন। এ সমস্ত আদর্শ নাটক (Drama) রচনার পরিপন্থী হলেও বাঙালির সে সময়ের জীবনভাবনা ও (চির অনুগামী হওয়ায়, দেশের সর্বস্তরের সাধারণ মানুষের সঙ্গে বাংলা নাটক, নাট্যমঞ্চ ও নাটকাভিনয়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য স্থাপন করে বাংলা নাট্যসাহিত্যের ভবিষ্যতকে সুনিশ্চিত করেছিল।

জাতীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার বছরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (1849-1925) 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' (1872) নাটক নিয়ে বাংলা নাট্যসাহিত্যের (ে ত্রে অবতীর্ণ হন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তেত্রিশটি নাটক ও প্রহসনের লেখক। এর বাইশটি অনুবাদ, না হয় ভাবানুবাদ। এই অনুবাদ নাটকগুলি তাঁর স্বাধীন, মৌলিক নাটকগুলিকে প্রায় আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ইনি সরোজিনী (1875), অশ্রুমতী (1879), মালতীমাধব (1900) প্রভৃতি নাটক রচনা করেন। প্রহসন অলীকবাবু (1900)—ফরাসি নাট্যকার মলিয়েরের কৌতুক নাটকের অনুবাদ(হঠাৎ নবাব (1884) 'দায়েপড়ে দারগ্রহ' (1902) ইত্যাদি বাংলা নাট্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর কৌতুক রসাশ্রিত নাটকগুলি সু(চিসম্মত স্মিতহাস্যের জন্য সবিশেষ উপভোগ্য হয়েছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক নাটকগুলিকে ইংরেজি নাটকের গঠনরীতির অনুসরণ আছে। দেশাত্মবোধ ও রোমান্টিক প্রেম কাহিনী অনেক (ে ত্রেই তাঁর নাটকের ঘটনাকে শিথিলবন্ধ করেছে। সরোজিনী আলাউদ্দিনের চিতোর আত্র(মণের পটভূমিতে রচিত। অশ্রুমতী (প্রতাপ সিংহের কন্যা) বাই শক্ত(সিংহ, মোগল সম্রাট সেলিমকে নিয়ে রাষ্ট্রদ্বন্দ্ব, দেশপ্রেম প্রণয়-সংঘাত প্রভৃতির সমবায়ে তীব্র জটিল আবর্ত সৃষ্টি করেছে। ইতিহাস পুরাণ ফরাসি নাটকের অনুবাদ ইত্যাদি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পরিশীলিত নাট্যবোধ ও চর্চার বিষয় হলেও, সাধারণ পাঠক ও দর্শক-এর মধ্যে প্রাণের আরাম মনের তৃপ্তি পায়নি। জাতির প্রত্য(ও বাস্তব জীবনকে অবলম্বন না করার ফলে কালান্তরে তাঁর নাটক বাংলা নাট্যসাহিত্যের গবেষকদের বিষয়মাত্র হয়েছে।

একজন প্রতিভাবান নাট্যাভিনেতা হিসাবে বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে যিনি বাংলা থিয়েটারের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে মঞ্চাভিনয় সম্পর্কে সংস্কৃতিপ্রেমী জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন তিনি প্রখ্যাত নট ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ (1844-1912)।

বাগবাজার থেকে জাতীয় নাট্যশালা এবং পেশাদার মঞ্চের অভিনেতা হিসেবে গিরিশচন্দ্র বুঝেছিলেন দেশের নাট্যমোদি জনসাধারণের কী চাহিদা। দেশের চলিত গীতাভিনয় গ্রামীণ মানুষের বা পাশ্চাত্যরীতির নাটক বিদগ্ধজনের মনোরঞ্জনের সমর্থ হলেও শহর-কলকাতার মধ্যবিত্ত জনসমষ্টি এতে পরিতৃপ্ত হতে পারেনি। তাই তিনি এই দুয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে, বাংলা নাটককে সার্থকতার পথে অনেকদূর এগিয়ে দিয়েছেন। এভাবে তিনি বাংলার নাট্যদর্শকদের সঙ্গে নাট্যশালা ও নাটকের একটি সেতুবন্ধন করে দেশের প্রবাদপ্রতিম বরণীয় নাট্যকার ও নাট্যশালার জনপ্রিয় সংগঠক-পরিচালক-অভিনয় শি(ক হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

নাট্যকার গিরিশচন্দ্র প্রায় একশ'টি নাটক লিখেছেন। বিষয়বস্তু হিসেবে— পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক চরিত ও রোমান্টিক প্রভৃতি শ্রেণীতে নাটকগুলিকে বিন্যস্ত করা যায়। তিনি সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে কয়েকটি

প্রহসনও রচনা করেছেন। বিষয়বস্তু ও নাটক পরিবেশনে নানা ধরনের আঙ্গিক নিয়ে পরী(া-নিরী(ার মধ্য দিয়ে বাঙালি দর্শকের মনোরঞ্জনে প্রয়াসী হয়েছেন। যে বিষয় ও আঙ্গিক পরিকল্পনা জনচিত্ত জয়ে সমর্থ হয়েছে, তার অভিনয় পুনরাভিনয়ের মাধ্যমে সেদিনের নাট্যশালাকে সঞ্জীবিত রেখেছেন। বহু অকিঞ্চিৎকর নাটক রচনার জন্য গিরিশচন্দ্র আধুনিক সমালোচকদের কঠোর সমালোচনার পাত্র হয়েছেন। মনে রাখা দরকার সে সময়ে সমাজ-জীবনে নানা উত্থান-পতনের পর্ব চলছে। এর ওপর অন্ধ বিদেশী অনুসরণ ও খ্রিস্টধর্মের প্রচার আন্দোলনের পাশাপাশি, ব্রাহ্মধর্মের কলহ বিভ্রম নাগরিক জীবনকে বিপন্ন ও সংশয়াকুল করে তুলেছে। সেই সময় বাঙালির পারিবারিক জীবনের ভাঙনের ছবি তুলে ধরে এবং ভক্তি(রসের সহজ পথে আকর্ষণ করে তিনি সাহিত্যিক দায়িত্ব পান করেছিলেন। ইংরেজ নীলকরদের বি(দ্ধে দীনবন্ধু যেমন নিপীড়িত মানুষের প্রতি সহানুভূতি জাগ্রত করেছিলেন, গিরিশচন্দ্র তেমনি ভক্তি(রসাপ্-ুত নাটক লিখে আত্মবিমুখ বাঙালিকে আত্মস্থ করার মহান কর্তব্য পালন করেছিলেন।

গিরিশচন্দ্রের কলকাতার মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবন সম্পর্কে ব্যাপক অভিজ্ঞতা থাকায়, তাদের সামাজিক-পারিবারিক জীবনের সমস্যা সম্যক অবহিত ছিলেন। তাই সামাজিক নাটক রচনা করতে গিয়ে সমাজের প্রকৃত সমস্যার দুর্বলতম স্থানটিকে স্পর্শ করতে স(ম হয়েছিলেন। মদ্যপান ও তার অপরিণামদর্শিতা, কন্যাদায়, বিধবা বিবাহ, বি(াসঘাতকতা ইত্যাদি বিষয়গুলি বাঙালি সেন্টিমেন্ট যুক্ত(হয়ে রচিত হওয়ায় তাঁর সামাজিক নাটকগুলি পাঠক এবং দর্শকদের অনুভূতি স্পর্শ করতে পেরেছিল।

গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে যে অহৈতুকী ভক্তি(-বৈভব ল(্য করা যায় তা বহুলাংশে রামকৃষে(র প্রভাবজাত। এই ভক্তি(রস তাঁর প্রথম জীবনের যাত্রা-সংস্কারের পোষকতা করেছিল বলে, নাটকগুলির মধ্যে একটি সহজ স্বাচ্ছন্দ্য ল(্য করা যায়। অধিকন্তু গিরিশচন্দ্র তাঁর পৌরাণিক নাটকগুলির সাহায্যে বাংলার একান্ত আপন যে ধর্মবোধ তাকেই প্রতিফলিত করতে চেষ্টা করেছেন।

তাঁর পৌরাণিক নাটকে পুরাণ তাঁর নিজস্ব মননজাত। তিনি আপন অন্তরে ভক্তি(ও শ্রদ্ধার যে কল্যাণদীপটি অনির্বাণ রেখেছিলেন, সমগ্র নাট্য রচনার ভিতর দিয়ে দেশের মানুষের হৃদয়ে তারই উত্তাপস্পর্শ দান করতে চেষ্টা করেছিলেন—যাতে তাদের শুভ হয়, মঙ্গল হয়।

প্রসঙ্গত্র(মে গিরিশচন্দ্রের মহাপু(ষ-চরিত নাটকের উল্লেখ করতে হয়। তিনি এখানেও তাঁর হৃদয়ে নিয়তধ্বনিত রামকৃষ(ভক্তি(র সুরকে বিস্মৃত হতে পারেননি। ফলে তাঁর নির্বাচিত ধর্মপ্রাণ মানুষগুলি সম্পর্কে যে সমস্ত অতিরঞ্জিত ও অলৌকিক জনশ্রুতি সমাজে সহজেই জন্মলাভ করে, তার ওপর ভিত্তি করে সেগুলি লিখেছেন। অলৌকিকতা ও ভক্তি(র অতিরঞ্জিত চিত্রে সেগুলি ভারাত্র(ান্ত।

ঐতিহাসিক নাটকে বিশেষ দেশ-কালের পটভূমিকায় গিরিশচন্দ্র অস্পষ্ট ও অস্বচ্ছভাবে কালোপযোগী স্বাদেশিকতার মন্ত্র প্রচার করেছেন। সেখানেও দেশপ্রেমের উচ্ছ্বাসকে তিনি, সংযত করতে পারেননি। এ সময় পর পর কয়েকটি স্বদেশপ্রেমমূলক নাটক রচনা করতে দেখা যায়। গিরিশচন্দ্রের মধ্যে যে সহজাত ভক্তি(প্রাণতার সঞ্চার হয়েছিল, তা এ শ্রেণীর নাটকে ভগবদভক্তি(র পরিবর্তে অতি উৎসাহে স্বদেশ-ভক্তি(রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।

গিরিশচন্দ্র গীতি-প্রধান রোমান্টিক নাটকগুলিতে তাঁর যাত্রাদলের পুরানো সংস্কারকে কোনো মতেই কাটিয়ে উঠতে পারেননি। সমসাময়িক বিষয়বস্তু ও ঘটনা নিয়ে বিদ্রূপাত্মক নক্শা বা 'পঞ্চরং' এবং লঘু ব্যঙ্গ-কৌতুক মিশ্রিত প্রহসনগুলিতে তাঁর কোনো রকম সাহিত্যিক দ(তার পরিচয় পাওয়া যায়নি। এগুলি রচনার পেছনে কতকগুলি ঘটনার তাৎ(ণিক প্রতিত্রি(য়া নাট্যকার প্রকাশ করেছেন মাত্র। গিরিশচন্দ্রের নাটকের সংখ্যা প্রায় একশ। শ্রেণী বিন্যস্ত করে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটকের পরিচয় দেওয়া হল।

'নট' হিসেবে খ্যাতির ব্যাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চের জন্য কিছু নাটক লেখার প্রয়োজন দেখা দেয়। মঞ্চাভিনয়ের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে প্রাথমিকভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাস কপালকুণ্ডলা-মৃণালিনীকে তিনি নাট্যরূপ দেন। পরে 'মেঘনাদবধ কাব্য', পলাশির যুদ্ধেরও নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। এগুলি অভিনয় শেষে পালার যাত্রার অভিজ্ঞতা নিয়ে কয়েকটি গীতিনাট্য আগমনী (1877), অকালবোধন (1877), দোললীলা (1878) লেখেন। প্রথম দুটি ছদ্মনামে লেখা। গিরিশচন্দ্রের নাট্যসাধনার প্রথম পর্বের নাট্যরূপ—গীতিনাট্যের মধ্যে বেশিদিন আবদ্ধ থাকেনি। তিনি মৌলিক নাটক রচনায় আগ্রহী হন। প্রথম মৌলিক নাটক 'আনন্দ রহো' (1881) —ইতিহাসের ছায়া থাকলেও নাটক হিসেবে দুর্বল। দুটি অসফল প্রচেষ্টার পর তিনি পৌরাণিক নাটক রচনায় ব্রতী হন। 'রাবণবধ' (1881), 'সীতার বনবাস' (1882), 'জনা' (1894) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'রাবণবধ' তাঁর পৌরাণিক নাটক। সামগ্রিক বিচারে 'জনা' পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে সর্বাপে(া উল্লেখযোগ্য। এটি হরিভক্তি(, গঙ্গাভক্তি(ও মাতৃভক্তি(প্রচার করেছে সত্য, তথাপি চরিত্র সৃষ্টি, নাটকীয় সংঘাত রচনায় এটি সমগ্র গিরিশ সাহিত্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। জনাচরিত্র পরিকল্পনায়, মধুসূদনের বীরাঙ্গনা কাব্যের 'নীলধ্বজের প্রতি জনা' পত্র, মহাভারতের গান্ধারী, বৃত্রসংহারের ঐন্দ্রিলার অংশত প্রভাব আছে।

গিরিশচন্দ্র কয়েকজন ধর্মপ্রবর্তক ও ধর্মব্যাখাতা মনীষীর জীবন নিয়ে ভক্তি(ভাবমূলক নাটক লিখেছেন। এদের মানুষ হিসেবে চেনা যায় না, অধিকাংশই কল্পনাশ্রিত ও অলৌকিকতায় আচ্ছন্ন। চৈতন্যলীলা (1885), নিমাই সন্ন্যাস (1885), বুদ্ধদেব চরিত (1885), বিল্বমঙ্গল (1886) উল্লেখযোগ্য রচনা। চৈতন্যলীলা নাটকটির অভিনয় দেখে রামকৃষ(নাট্যকার অভিনেতাকে অভিনন্দিত করেছিলেন। ভাঙা অমিত্রা(রে লেখা বুদ্ধদেব চরিত এডুইন আর্নল্ডের লাইট অব এশিয়া কাব্য অবলম্বনে রচিত। বিল্বমঙ্গল অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ভক্ত(মাল অনুসরণে বিল্বমঙ্গল কাহিনীর সঙ্গে সুরদাসের জীবনী মিশিয়ে নাটকটি রচিত। ফলে নাটকে ভক্তি(রসের প-াবন বয়ে গেছে।

বাঙালির নৈমিত্তিক ও সমাজ জীবনের নানা স্তরে যে নাট্যবস্তু ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, তা নিয়ে নাটক লেখার অনুরোধ থেকেই তিনি কয়েকটি সামাজিক নাটক লিখেছেন। এর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তি(গত (চি ও আন্তরিক আবেগ যুক্ত(ছিল না, তাই বিষয়গুণে কয়েকটি জনপ্রিয় হলেও শিল্পবিচারে নাট্যরসিকের প্রিয় হতে পারেনি। এ নাটকগুলিতে সমকালীন কলকাতার মধ্যবিত্ত জীবনের ছবি আছে। তাই নাটকগুলিকে সমাজচিত্ররূপে গ্রহণ করা যায়। এ পর্যায়ের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটক হোল—প্রফুল্ল (1889), হারানিধি (1890), বলিদান (1905)। শতাব্দীশেষের সমাজব্যবস্থার চাপে যৌথ একান্নবর্তী পরিবারে সে সময় ভাঙন ধরেছে, তারই ভয়ঙ্কর অনিবার্য পরিণতির চিত্র তুলে ধরা এ নাটকের প্রতিপাদ্য হলেও, জাল-জুয়াচুরি, মামলা-মোকদ্দমা প্রভৃতি পরম্পরা অতিত্র(ম করে শেষ পর্যন্ত ট্রাজেডির পরিবর্তে নাটকটি হয়েছে মেলোড্রামা। নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র যোগেশের ক(ণ আর্তনাদ আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল'—বাঙালির কাছে এখন প্রবাদ বাক্যের মত। 'বলিদানে'র বিষয় মধ্যবিত্ত বাঙালির ঘরের কন্যাদায়, পণপ্রথা। সমসাময়িক একটি ঘটনাসূত্রে নাটকের পরিকল্পনা। সময় ও বিষয় গৌরবে নাটকটি একাধিকবার অভিনয় হয়েছে। প্রফুল্লর মত এ নাটকের সীমাহীন দুর্যোগ ও পরিণতিতে সমষ্টিগত মৃত্যুদৃশ্যের সমাবেশ, অতিনাটকীয়তার চরম পরিচয় পাওয়া যায়। নাট্যশিল্প হিসাবে উল্লেখযোগ্য না হলেও বিষয় গৌরবে জনপ্রিয় হয়েছিল।

ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে 'সিরাজদ্দৌলা' (1906), 'মীরকাশিম' (1906), 'ছত্রপতি শিবাজী'র (1907) নাম করা যায়। নাটকগুলিতে ইতিহাসের কিছুটা অনুসৃতি আছে। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের প্রে(াপটে এগুলির

রচনা। স্বদেশচেতনার প্রকাশ ল(ণীয়ভাবে ফুটে উঠেছে। প্রথম দুটি নাটক অ(য়কুমার মৈত্রের ইতিহাসগ্রন্থ অবলম্বনে রচিত। করিমচাচা সিরাজদ্দৌলার স্মরণীয় চরিত্র সৃষ্টি। ঘটনার ঘনঘটা প্রতিটি নাটককেই আচ্ছন্ন করেছে।

গিরিশচন্দ্র আগে নট পরে মঞ্চাধ্য(-পরিচালক-প্রযোজক-নাট্যশি(ক-শেষে নাট্যকার। তাঁর নাটক রচনার পেছনে মঞ্চের তাগিদ—দর্শক (চি সেখানে প্রধান নির্দেশক শক্তি(। তিনি আধুনিক পাঠ্য নাটক (Reading Drama) লেখেননি। দেশ-কাল সমাজ সচেতন কবি মনীষী তিনি ছিলেন না। তাই তাঁর শতাধিক নাটক আদর্শমানে না পৌঁছুলেও, অগণিত দর্শকমণ্ডলিতে অভিনয়ের গৌরবে মনোরঞ্জন যেমন করেছে, তাদের সুস্থ (চি নির্মাণে ও নাট্যরসের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করতেও স(ম হয়েছে। এখানেই তাঁর সিদ্ধি, তাঁর স্থায়িত্ব।

গিরিশচন্দ্রের সমসময়ে যাঁরা নাটক নিয়ে মঞ্চকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের মধ্যে অমৃতলাল বসু, রাজকৃষ(রায়, অতুলকৃষ(মিত্র, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত অন্যতম। এঁরা মোটামুটি ভক্তি(রস রঙ্গ-ব্যঙ্গ নিয়ে নাটক রচনায় অনুরক্ত(ছিলেন। রচনায় আধুনিক যুগ-ল(ণের কোনো পরিচয় নেই। এঁদের মধ্যে অভিনেতা নাট্যকার অমৃতলাল-সর্বাধিক জনপ্রিয় ছিলেন। এখানে অমৃতলালের নাটকের সং(প্ত পরিচয় দেওয়া হোল।

অমৃতলালের (1853-1929) একটি সরস মন ছিল। তিনি রচয়িতার প্রতিভা নিয়ে নাট্য জগতে এসেছিলেন। জীবনবোধে র(ণশীল হওয়ায় তাঁর রচনায় প্রগতি বিরোধী মনোভঙ্গির পরিচয় আছে। তিনি রঙ্গ-ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মধ্য দিয়ে তাঁর বক্ত(ব্যকে তুলে ধরেছেন। লঘুনাট্যে তাই তিনি স্বচ্ছন্দ। লঘু হাস্যরসাত্মক প্রহসন ও নক্শা জাতীয় রচনার জন্য তিনি 'রসরাজ' রূপে আখ্যাত হয়েছেন। তিনি কোথাও কোথাও হাসির সঙ্গে ক(ণ রস বা ব্যঙ্গের ঝাঁজ মিশিয়েও হৃদয় বা বুদ্ধিকে তৃপ্ত করতে পারেননি। বরঞ্চ কোথাও বা তিনি হাসাতে গিয়ে শি(ত নারী বা স্ত্রী-শি(াকে ব্যঙ্গ করেছেন, ব্রাহ্মণ মাত্রকেই ভি(াজীবী বা পণ্ডিতমূর্খ বলেছেন, কলু, নাপিত ইত্যাদি জাত ব্যবসার কথা তুলে বিদ্রূপ করেছেন। এ-সব ত্রুটি সত্ত্বেও অমৃতলাল গিরিশচন্দ্রের সহযোগী বা এককভাবে সাধারণ মঞ্চের সমৃদ্ধির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। নাটক লেখা ছাড়াও অভিনয় নৈপুণ্যে তিনি নাট্য জগৎকে যেভাবে সমৃদ্ধ করেছেন, সেজন্যও তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

অমৃতলালের জনপ্রিয় বিদ্রূপাত্মক ও কৌতুকনাট্যের মধ্যে তিলতর্পণ (1881), চাটুজ্জে-বাড়ুজ্জে (1884), বাবু (1893) এবং ব্যাপিকা বিদায় (1926) উল্লেখযোগ্য। 'তিলতর্পণে' গিরিশচন্দ্রের উপর কটা(আছে। প্রতিদ্বন্দ্বী মঞ্চের অভিনয় পদ্ধতি ও ঐতিহাসিক রোমান্টিক নাটকের প্রতি ব্যঙ্গ আছে। চাটুজ্জে-বাড়ুজ্জে ইংরেজি প্রহসন (Cox and Box) অনুসরণে রচিত। 'বাবু' রাজনৈতিক ও ধর্মঘটিত আন্দোলনে সাধারণত যে ভণ্ডামি ও স্বার্থপরতা থাকে, তাকে আত্র(মণ করে লেখা। 'ব্যাপিকা বিদায়' অপেরার ঢঙে লেখা একটি ভালো প্রহসন। গাঢ়বদ্ধ গল্প ও মধুর রোমান্টিকতা, মাঝে মাঝে ছন্দোবদ্ধ সংলাপ ব্যবহারে রচনাটি সার্থক। পরিশেষে বলা যায় লঘু নাট্যে অমৃতলাল যতখানি সফল গভীর গম্ভীর জীবনরসকে প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি ততটাই ব্যর্থ। এ(ত্রে 'হীরকচূর্ণ' (1875) তাঁর প্রথম নাটক। পূর্ণাঙ্গ কমেডি 'খাস দখল' (1912)। এখানে ডাক্ত(ার ও বিধবা বিবাহের সমর্থকদের প্রতি কটা(আছে। চরিত্র চিত্রণে, সংলাপ রচনায় কৃত্রিমতা আছে। এ(ত্রে তাঁর অবদান সামান্যই। অমৃতলাল গিরিশচন্দ্রের অনুসরণে তাঁর কোনো কোনো রচনাকে 'পঞ্চরং' বলেছেন। এর অর্থ যদি পাঁচ রকম বিষয় নিয়ে তামাশা করা হয় তবে পঞ্চরং সংজ্ঞাটি অমৃতলালের সকল রচনার (ত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে।

ীরোদপ্রসাদ (1863-1927) ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (1863-1913) দু'জন নাট্যকারই রবীন্দ্র সমসময়ে জন্মগ্রহণ করে তাঁর পরিমণ্ডলে বাস করে নাটক রচনা করেছেন। এদিক থেকে তাঁদের রবীন্দ্রযুগের লেখক বলা যায়। আবার উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যে নাট্যধারার বিকাশ ঘটেছে, সে সময়েই এঁদের আবির্ভাব। এঁদের মধ্যে তাই

গিরিশচন্দ্র মনোমোহনের পৌরাণিক ভক্তি(রসের মলয়স্পর্শ লাভ করা গেলেও বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও নাটকীয় পাত্র-পাত্রীর মনোবি(-ষণ প্রবণতাও দেখা যায়। 1905-এর 'বঙ্গভঙ্গ' আন্দোলন দেশপ্রেমের যে জোয়ার এনেছিল, এঁদের ঐতিহাসিক নাটকেও তার পরিচয় আছে। এছাড়া সমাজ সমস্যা ও ব্যঙ্গমূলক নাট্যধারায় প্রহসন রচনা, পুরাতন অপেরাধর্মী গীতিনাট্য তো আছেই।

ীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ উনিশ শতকের শেষে (প্রথম নাটক ফুলশয্যা, 1894) নাটক রচনা শু(করে দেশের নাট্যরসিক সমাজকে পরিতৃপ্ত করেন। তাঁর নাটক প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত(— পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও রোমান্টিক। বাংলা নাটকের উদ্ভব থেকে যে পৌরাণিক নাট্যধারা সূচনায় দেশের ভক্তি(রস-তৃষ(াকে চরিতার্থ করছিল ীরোদপ্রসাদ সেই সংস্কারের স্রোতেই গা ভাসিয়েছেন। তাঁর পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে ভীষ্ম (1913) নরনারায়ণ (1925) উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত(নাটকে ীরোদপ্রসাদের প্রতিভার চরমোৎকর্ষ ঘটেছে। অহৈতুকী ভক্তি(কে যুক্তি(ও বিচারের বন্ধনে বেঁধে নাটকটিকে যথার্থ নাট্য গুণান্বিত করেছেন। গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকের প্রভাবকে স্বীকার করেও তিনি তাঁর মধ্যে গ্রহণযোগ্যতার মাত্রা সংযোজন করেছেন।

দেশাত্মবোধের উন্মাদনায় ও কল্পনাপ্রধান দেশপ্রেমের বাষ্পোচ্ছ্বাসের প্রভাবে ীরোদপ্রসাদ কয়েকটি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেন। 'বঙ্গের প্রতাপ-আদিত্য' (1903), আলমগীর (1921) বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। নাটকগুলির মধ্যে ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে অবাস্তব কাল্পনিকতা ও ভাবালুতার জন্য নাটকীয়তা যুক্ত(হলেও সামগ্রিক অবদান ব্যর্থ হয়নি।

ীরোদপ্রসাদের রোমান্টিক নাট্যকাব্য 'কিন্নরী' (1918) রঙ্গনাট্য 'আলিবাবা' (1897) খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। শেষোক্ত(রচনাটি আজও চির নতুন, চির আনন্দদায়ক নাটকের আসনে সমাসীন। এটি তাঁকে দীর্ঘজীবী করেছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকের সংখ্যা প্রায় কুড়ি। তাঁর সাহিত্য জীবনের শু(কবিতা দিয়ে। তাঁর গানগুলি বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। কবি স্বভাবের জন্য তাঁর নাটকের সংলাপের সঙ্গে অতি আবেগের সুর মিশে থাকে। ভাবপ্রবণতার উচ্ছ্বাস তাঁর নাটকগুলিতে অতিনাটকীয়তার সঞ্চার করলেও তাদের অনুভববেদ্য আবেদনকে অস্বীকার করা যায় না। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকগুলিকে— ঐতিহাসিক, সামাজিক, প্রহসন ও পৌরাণিক নাট্যকাব্য শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এর মধ্যে ঐতিহাসিক নাটক রচনাতেই তাঁর কৃতিত্ব সর্বাধিক, সেটি অনেকটা যুগ বৈশিষ্ট্যের কারণেই। স্বদেশী আন্দোলনের ভাবাদর্শ তাঁর নাটকের মধ্যে তীব্র ও প্রত্য(ভাবে প্রকাশিত হওয়ায় নাটকগুলি ব্যাপক লোকপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। সেক্সপিয়রের রস-প্রভাব ও বাঙালির জাতীয় ভাবাবেগকে কাব্যময় রূপ দেওয়ায় তাঁর বিশেষ নৈপুণ্য ছিল। তাঁর প্রথম ঐতিহাসিক নাটক 'তারাবাই' (1903) হলেও 'মেবার পতন' (1908), 'শাজাহান' (1909), 'চন্দ্রগুপ্ত (1911) অত্যন্ত পরিচিত। এই সমস্ত নাট্য-কল্পনার মধ্যে বাস্তবাতিশায়ী মহনীয় উন্মাদনা, বাঙালির স্বাধীনতার অদম্য আকাঙ(াকে রূপ দিয়েছে। এর প্রভাবকে সেদিন কেউ অস্বীকার করতে পারেননি। 'মেবার পতন' রাজপুত ও মোগল সাম্রাজ্যের সংঘর্ষ নিয়ে লেখা। ইতিহাস অনুসরণের সঙ্গে কল্পনার ও আদর্শবাদের প্রশ্রয় আছে। ফলে মানবিক কাহিনী দ্বিধাগ্রস্ত। এ নাটকে তিনি জাতীয় ভাবাদর্শ ও মানবমৈত্রীর আদর্শকে তুলে ধরেছেন। 'শাজাহান' মোগলজীবন নিয়ে লেখা। ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব, সিংহাসন অধিকারের লোভ, কামনা-বাসনা-ঈর্ষা রূপতৃষ(া নাটকের বিষয়। শাজাহানের ট্রাজেডি তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আত্ম(য়ে। ঔরঙ্গজেব নিষ্ঠুর, শঠ এবং অত্যন্ত জটিল চরিত্র। 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে চাণক্য অমর সৃষ্টি। ইতিহাসেরও অনুসরণ আছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল ব্যক্তি(গতভাবে দেশের, সমাজের কাছ থেকে অনেক অন্যায় ও অবিচার পেয়েছিলেন, তারই

প্রতিত্রি(য়া তাঁর সামাজিক নাটক ও প্রহসনগুলির মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্ট। জাতিভেদ, বিলাত যাওয়ায় একঘরে হওয়া অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রভৃতির প্রতি দ্বিজেন্দ্রলালের জাতত্রে(াধ ছিল। কোনো মেকিকে দ্বিজেন্দ্রলাল সহ্য করতে পারতেন না। রচনায় তারই প্রতিবাদ ব্যঙ্গে-বিদ্রূপে-প্রহসনে হাসির গানে ফুটে উঠেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যক্তি(ত্ব ও সাহিত্যাদর্শ বিচারে বিষয়টি বিশেষ গু(ত্বপূর্ণ। তাঁর সামাজিক নাটক ও প্রহসনগুলির মধ্যে 'কল্কি অবতার' (1895), 'বিরহ' (1897), 'পুনর্জন্ম' (1911) উল্লেখযোগ্য। প্রহসনের বিষয় 'সমাজব্যঙ্গ'—সামাজিক কুসংস্কারকে তিনি আত্র(মণ করেছেন। 'বিরহ', 'পুনর্জন্ম', '(চিপূর্ণ' কৌতুকে পরিচ্ছন্ন রচনা। চরিত্র ও হাসিতে ভাঁড়ামি নেই। হাসির গানগুলি উপভোগ্য। নাট্যকার 1912 খ্রিস্টাব্দে 'আনন্দবিদায়' প্যারডি প্রহসনে সামান্য মতবিরোধকে অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথকে ব্যক্তি(গত আত্র(মণ করেন। তিক্ত(বেদনার স্মৃতি বিজড়িত রচনাটি সে যুগে যথেষ্ট নিন্দিত হয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর পৌরাণিক নাটকের বিষয়বস্তু ও উপস্থাপনায় আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তাঁর 'পাষাণী' (1900), 'সীতা' (1908) এবং 'ভীষ্ম' (1915) কোথাও যাত্রা বা ভক্তি(রসের স্পর্শ নেই। রামায়ণ-মহাভারতের ঘটনার যুক্তি(গ্রাহ্য ব্যাখ্যা দিতেও তিনি চেষ্টা করেছেন। যেমন সীতার চরিত্রে রোমান্টিক প্রকৃতিপ্রীতি, রামচন্দ্রের কর্তব্যনিষ্ঠা, বশিষ্ঠ্যে ব্রাহ্মণ সংস্কার ফুটিয়ে তুলেছেন। অনুরূপ পরিচয় পাষাণী ও ভীষ্মতেও পাওয়া যাবে।

পরিশেষে বলা যায় বাংলা নাটকে গিরিশচন্দ্র থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল পর্যন্ত যে বিবর্তন রেখাটি স্পষ্ট তা থেকে ধারণা করা যায় নাটক ত্র(মশ সমাজ বাস্তবতার প্রতি যেমন আকৃষ্ট হচ্ছে, তেমনি তাঁর সাহিত্যিক মূল্যও ত্র(মশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই প্রে(াপটেই রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার অন্যতম সৃষ্টি তাঁর নাটকের বিষয়বস্তু, বক্ত(ব্য ও আঙ্গিকের অভিনবত্ব বাংলা সাহিত্যকে আন্তর্জাতিক সীমায় পৌঁছে দিয়েছে।

13.13 সারাংশ (চতুর্থ অংশ)

মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা বাংলা নাট্য সাহিত্যে নূতন মাত্রা যোগ করেছে। পুরাণের বিষয়কে পরিবেশন করলেও, উপস্থাপনায় আধুনিকতার ছাপ আছে। পদ্মাবতীর গল্প বিদেশী, উপস্থাপনায় পূর্ববৎ। প্রহসন দুটি ও কৃষ(কুমারী ইংরেজি আদর্শে রচিত। প্রহসন দেশী ভাঁড়ামি বর্জিত। বিষয়বস্তু ও চরিত্রসৃষ্টি অনন্য। কৃষ(কুমারীর ট্রাজেডি স্বতন্ত্রতর। দীনবন্ধুর স্মরণীয় নাটক 'নীলদর্পণ' শিল্প হিসেবে দুর্বল হলেও সামাজিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। নাটকটি জাতীয় নাট্যশালায় প্রথম অভিনীত হয়। তিনি সধবার একাদশীর মত প্রহসন রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ধনী মধ্যবিত্তের চেয়ে ভদ্রেতর চরিত্র সৃষ্টিতে সাফল্যের স্বা(র আছে। মনোমোহন বসুর পুরাণাশ্রিত নাটকে ভক্তি(রসের প্রাবল্যের সঙ্গে যাত্রা-আঙ্গিকের ব্যবহার প্রবণতা ল(্য করা যায়। সংস্কৃত ফরাসি ইংরেজি নাটকের অনুবাদে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় যেমন আছে, তেমনি ইতিহাসাশ্রিত দেশপ্রেম ও রোমান্টিক প্রণয়ের নাটকও নিখেছেন। ইনি প্রধানত ইংরেজি রীতির অনুসরণ করেছেন। প্রহসনগুলি মার্জিত(চি ও কৌতুকরসে পূর্ণ।

গিরিশচন্দ্র নট, অভিনয় শি(ক, পরিচালক ও নাট্যকার। নাট্য জগৎকে দীর্ঘদিন নিয়ন্ত্রণ করেছেন। আধুনিক সমাজ মধ্যযুগীয় ভক্তি(রস প্রচার তাঁর ল(্য। পুরাণ এবং মহাপু(ষ চরিত্র অবলম্বনে ভক্তি(রসসিক্ত(নাটক রচনা করেছেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় রচিত ইতিহাসাশ্রিত নাটকে স্বাদেশিকতার প্রচার করেছেন। জন(চি ও অভিনেতাদের দ(তার দিকে ল(রেখে নাটক রচনা করতেন। নিচুতলার চরিত্রসৃষ্টিতে অনেকটা সার্থক।

প্রধানত প্রহসন রচয়িতা হিসেবে অমৃতলাল বসু খ্যাত। তিনি প্রগতিশীল আন্দোলন ও ভাবধারার বিরোধী ছিলেন। ীরোদপ্রসাদ সঙ্গীতবহুল রঙ্গনাট্যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। পৌরাণিক নাটকের মধ্যে 'নরনারায়ণ' স্মরণীয় রচনা। এ (ে ত্রে গিরিশচন্দ্রের প্রভাব প্রবল। ঐতিহাসিক নাটকে স্বদেশপ্রেম প্রধান। সমাজ সম্পর্কে উদাসীন। কোনো সামাজিক নাটক লেখেননি। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ঐতিহাসিক নাটকে স্বদেশপ্রেম প্রধান। সমাজ সম্পর্কে উদাসীন। কোনো সামাজিক নাটক লেখেননি। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ঐতিহাসিক নাটকে স্বদেশপ্রেম প্রচার করেছেন। এ পর্বের নাটকীয় চরিত্র 'শাজাহান' অন্তর্দ্বন্দ্বে পূর্ণ ও সার্থক। পৌরাণিক নাটকে নূতনতর ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হয়েছে। সংলাপে কাব্যগুণ আছে। সামাজিক নাটক গতানুগতিক। প্রহসনের গান উল্লেখযোগ্য। আনন্দ-বিদায় বহু সমালোচিত।

13.14 অনুশীলনী 4

নীচের প্র(গুলির উত্তর দিন। উত্তর করা হয়ে গেলে 206 পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

1. শূন্যস্থান পূর্ণ ক(ন
   (ক) তিনি (মধুসূদন) মহাভারত কাহিনীর —— —— পরিবর্তে —— তাঁর নাটকে —— করেছেন।
   (খ) কৃষ(কুমারী ——বাংলা সাহিত্যের প্রথম ——নাটক। — — কাহিনীর এক ভাগ্যহত — অবলম্বন করে এর —নাট্য(ে ত্র তৈরি করা হয়েছে।
   (গ) নিমচাঁদ দীনবন্ধুর অপূর্ব সৃষ্টি। এই চরিত্রটি (ুরধার —— ও অভাবনীয় —— —— আকাশস্পর্শী —— ও তার ——বাস্তব পরিণতি প্রভৃতির সমন্বয়ে যোগ্য প্রতিনিধিরূপে বিরাজ করছে।
   (ঘ) অমৃতলালের জনপ্রিয় বিদ্রূপাত্মক ও —— নাট্যের মধ্যে ——'চাটুজ্জে বাড়ুজ্জে', 'বাবু' এবং —— উল্লেখযোগ্য।
   (ঙ) ীরোদপ্রসাদের —— নাট্যকাব্য ——রঙ্গনাট্য —— খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল।

2. সঠিক উত্তরে টিক ( ) চিহ্(দিন

(ক) 'সধবার একাদশী'র রচনা	(1) 1872
	(2) 1866
	(3) 1867
(খ) সাধারণ রঙ্গমঞ্চে নীলদর্পণের অভিনয়	(1) 1873
	(2) 1872
	(3) 1862
(গ) 'কিঞ্চিৎ জলযোগ'-এর রচনাকাল	(1) 1872
	(2) 1866
	(3) 1880
(ঘ) 'শাজাহান' নাটকের রচনাকাল	(1) 1906
	(2) 1908
	(3) 1909

(ঙ) 'অ্যাপল অফ ডিসকর্ড'-এর আখ্যান সূত্রকে ভারতীয় পৌরাণিক পরিবেশে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে কোন্ নাটকে?

(1) হীরক চূর্ণ
(2) পদ্মাবতী
(3) হঠাৎ নবাব

3. নীচের নাটকগুলির রচয়িতা কে লিখুন।
   (ক) মায়াকানন
   (খ) লীলাবতী
   (গ) হরিশ্চন্দ্র
   (ঘ) দায়ে পড়ে দারগ্রহ
   (ঙ) আনন্দ বিদায়
4. নীচের নাটক/প্রহসনগুলির প্রকাশকাল উল্লেখ ক(ন।
   (ক) 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'
   (খ) 'রামাভিষেক'
   (গ) 'হঠাৎ নবাব'
   (ঘ) 'খাস দখল'
   (ঙ) 'নরনারায়ণ'
5. সং(পে উত্তর দিন।
   (ক) 'নীলদর্পণ' নাটকটির নানা কারণে ঐতিহাসিক ভূমিকা আছে। কারণগুলি সং(পে লিখুন।
   (খ) কয়েকটি 'দর্পণ' নাটকের নাম উল্লেখ ক(ন।
   (গ) দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের তিনটি সামাজিক নাটকের নাম উল্লেখ ক(ন।
   (ঘ) 'বলিদান' নাটকের বিষয়বস্তু সং(পে লিখুন।
   (ঙ) 'অশ্রুমতী' নাটক সম্পর্কে সং(পে লিখুন।
6. (ক) বাংলা নাটকে মধুসূদনের অবদান আলোচনা ক(ন।
   (খ) দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ঐতিহাসিক নাটকগুলির সাধারণ পরিচয় দিন।
   (গ) "মনোমোহন বসু অপ্রধান নাট্যকার হলেও বাংলা নাটকে তাঁর অবদান আছে।" মন্তব্যটি সম্পর্কে আপনার অভিমত লিখুন।
   (ঘ) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদ নাটকের পরিচয় দিন।

13.15 উত্তর সংকেত

13.5 অনুশীলনী **1**

1. (ক) লালবাজারের, 1753, পে–হাউস।
   (খ) দি ক্যালকাটা থিয়েটার, নিউ পে–হাউস।
   (গ) হেস্টিংস, ইম্পে।
   (ঘ) চৌরঙ্গী থিয়েটার, দ্বারকানাথ ঠাকুর, ক্লার্ক, বার ও পার্কারের।
   (ঙ) বৈষ(বচরণ ওথেলো নাটকের।
   (চ) এম. জড্রেল-এর দ্য ডিসগাইস।
   (ছ) গ্যালারি, আট টাকা।

2. (ক) 1776, (খ) ডালহৌসীতে, (গ) 27শে নভেম্বর, 1795
   (ঘ) অধ্যাপক রিচার্ডসন/দ্বারকানাথ ঠাকুর।
3. (ক) এম. জড্‌রেল মলিয়ের, দ্য ডিসগাইস, লভ ইজ দ্য বেস্ট ডক্টর
   (খ) ম্যাকবেথ/ কোরিওলেনাস/স্কুল ফর স্ক্যান্ডাল
   (গ) হেস্টিংস, ইম্পে।
4. প্রশ্নগুলির উত্তর সংকেত নিষ্প্রয়োজন।

13.8 অনুশীলনী 2

1. প্রশ্নগুলির উত্তর সংকেত নিষ্প্রয়োজন।
2. (ক) শ্যামবাজার ট্রাম ডিপো, (খ) কুলীনকুল সর্বস্ব, (গ) মনোমোহন বসু, (ঘ) রামনারায়ণ তর্করত্ন।
3. (ক) ভুল, (খ) ঠিক, (গ) ঠিক, (ঘ) ভুল, (ঙ) ভুল।
4. (ক) শরচ্চন্দ্র ঘোষ, শকুন্তলা।
   (খ) দর্পনারায়ণের, গোপীমোহন মৃত্যুর পর।
   (গ) উইলসন, উত্তর রামচরিত, জুলিয়াস সিজার, ইংরেজিতে।
   (ঘ) মধুসূদনের, কৃষ(কুমারী, একেই কি বলে সভ্যতা।

13.11 অনুশীলনী **3**

1. (ক) উনিশ শতকের, সংস্কৃত দৃশ্যকাব্য, যাত্রার।
   (খ) সেক্সপিয়র, পঠন-পাঠন
   (গ) কীর্তিবিলাস, ভদ্রার্জুন, 1852।
   (ঘ) বাস্তব সমস্যা, মৌলিক, রামনারায়ণ তর্করত্নের।
   (ঙ) নব নাটক, পুরস্কার।
   (চ) পারিবারিক, নাট্যরূপ, রূপায়িত করা, আত্মবিশ্বাস, নাট্যকারদের।
2. (ক) ঠিক, (খ) ঠিক, (গ) ভুল, (ঘ) ভুল, (ঙ) ভুল।
3. উত্তর সংকেত এ(ে ত্রে নিষ্প্রয়োজন।

13.14 অনুশীলনী **4**

1. (ক) নায়িকা, দেবযানী, শর্মিষ্ঠাকে, নায়িকা।
   (খ) 1861, ঐতিহাসিক, টডের, রাজস্থান, রাজকুমারীকে, দ্বন্দ্বময়।
   (গ) মনীষা, নৈতিক, অধঃপতন, কল্পনা, শোচনীয়, উনিশ শতকের।
   (ঘ) কৌতুক, তিলতর্পণ, ব্যাপিকা-বিদায়।
   (ঙ) রোমান্টিক, 'কিন্নরী', আলিবাবা।
2. (ক) 1865, (খ) 1872, (গ) 1872, (ঘ) 1909, (ঙ) পদ্মাবতী।

3. (ক) মধুসূদন দত্ত, (খ) দীনবন্ধু মিত্র, (গ) মনোমোহন বসু, (ঘ) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। (ঙ) দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।
4. (ক) 1860, (খ) 1867, (গ) 1884, (ঘ) 1912, (ঙ) 1925
5. এবং 6 নম্বর প্র(গুলির উত্তর সংকেত পাঠ্যবস্তু অনুসরণে তৈরি ক(ন।

13.16 গ্রন্থপঞ্জি

1. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড) ড. সুকুমার সেন।
2. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (তৃতীয় খণ্ড) ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
3. বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস ড. (ে(ত্র গুপ্ত।
4. সাহিত্য টীকা ড. সনৎ মিত্র
5. কলকাতার বিদেশী রঙ্গালয় অমল মিত্র
6. বাংলা নাটকের ইতিহাস অজিতকুমার ঘোষ
7. বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

একক 14 ❑ উপন্যাস—সূচনা-প্রতিষ্ঠা

গঠন

14.0 উদ্দেশ্য
14.1 প্রস্তাবনা
14.2 উপন্যাসের সূচনা
14.2.1 ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
14.2.2 প্যারীচাঁদ মিত্র
14.2.3 হানা ক্যাথেরীন ম্যুলেন্স
14.2.4 কালীপ্রসন্ন সিংহ
14.2.5 ভূদেব মুখোপাধ্যায়
14.3 উপন্যাসের প্রতিষ্ঠা
14.2.1 বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
14.2.2 রমেশচন্দ্র দত্ত
14.2.3 তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
14.2.4 যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু
14.2.5 ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়
14.2.6 স্বর্ণকুমারী দেবী
14.4 সারাংশ
14.5 অনুশীলনী
14.6 গ্রন্থপঞ্জি

14.0 উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়বার পর আপনি যা জানতে পারবেন তা হল

- কোন্ পটভূমিকা এবং আদর্শে বাংলা উপন্যাসের সৃষ্টি হল।
- বাংলা রঙ্গ-ব্যঙ্গ-নক্শার গোড়াপত্তন।
- বঙ্কিমচন্দ্র-সহ এই পর্বের উল্লেখযোগ্য রোমান্স ও উপন্যাস রচয়িতাদের রচনার পরিচয়।

14.1 প্রস্তাবনা

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নক্শাধর্মী রচনা থেকে আরম্ভ করে বঙ্কিমচন্দ্র এবং সেই পর্বের কয়েকজন উল্লেখযোগ্য ঔপন্যাসিকদের রচনার বিবরণ এর মধ্যে রয়েছে।

নির্বাচিত লেখকদের মধ্যে আছেন ভবানীচরণ, ম্যুলেন্স, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, হুতোম

(কালীপ্রসন্ন সিংহ), বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু এবং স্বর্ণকুমারী দেবী।

14.2 উপন্যাসের সূচনা

গল্প শুনবার আকাঙ(া মানুষের চিরকালের। প্রাগৈতিহাসিক বর্বর মানুষের পর্ব থেকে বিচিত্র বিবর্তন পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে মানুষের যে অগ্রগতির ইতিহাস তার সঙ্গে ওতপ্রোত রয়েছে এই অবিচ্ছেদ্য স্বভাবধর্ম। অনুন্নত সভ্যতা এবং মানসিকতা একই সঙ্গে তাকে অতিপ্রাকৃতে বি(াসী করে তুলেছিল। প্রাচীনকালের গল্প-কাহিনীতে তাই এত ভূত-প্রেত, দৈত্য-দানবের আসা-যাওয়া। কিন্তু এ কথাও একই সঙ্গে বলবার যে সভ্যতার বিপুল অগ্রগতি সত্ত্বেও মানুষ এই জগতের রস তথা আকর্ষণ বিস্মৃত হতে পারেনি। রাজপুত্র-রাজকন্যা আমাদের চেতনার নিত্য সহচরের মতো। আজকের গল্প-কাহিনীতেও অনায়াসেই তার পরো(ছায়া চলে আসে।

পারিভাষিক পরিচিতিকে সরল করে বললে দাঁড়ায়—আধুনিক উপন্যাসের মূল নিহিত রয়েছে রোমান্স'-এর মধ্যে। 'রোমান্স' বলতে বোঝায়, যেখানে কল্পনার প্রাধান্য অবারিত এবং বাস্তবের স্থান রীতিমত সংকুচিত। প্রাচীনকালে প্রেম, যুদ্ধবিগ্রহ, সাহসিকতা ইত্যাদির আতিশয্যপূর্ণ কাল্পনিক কাহিনী নিয়ে অনেক 'রোমান্স' রচিত হয়েছিল। তবে তা পদ্যে। পরবর্তীকালে গদ্যেও এধরনের প্রচুর লেখা হয়েছে। অবশ্য সময় যত অগ্রসর হয়েছে, 'কল্পনাকে' তত সংযত হতে হয়েছে, সেই জায়গায় এসেছে মানুষের বাস্তব জীবন অভিজ্ঞতারই ছবি।

ইউরোপে আজ থেকে আড়াইশো বছরেরও বেশি সময় আগে জন্ম নিয়েছে আধুনিক উপন্যাস। ইতিহাসের পরম্পরা বা ধারাবাহিকতা অনুসরণ করলে দেখা যায়, এরও দু'শো বছর আগে থেকে (অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দী) নবজাগরণের (রেনেসাঁস) প্রভাবে ইংরেজি, ফরাসি ইত্যাদি লোকভাষাগুলি রীতিমত সমাদর ও প্রতিষ্ঠা শু(হয়ে গিয়েছিল। মুদ্রণযন্ত্রের কল্যাণে অনেক কম দামে বই গিয়ে পৌঁছেছিল সাধারণ মানুষের কাছে। এই সাধারণ মানুষকে তুষ্ট করার জন্যই ইউরোপের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার গদ্যরীতিতেও গল্প-কাহিনী লেখা শু(হল। এই পর্বের মানুষ আগের থেকে অনেক বেশি বাস্তববাদী। সেই বাস্তবজীবন খুব স্বাভাবিকভাবে সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। রবিন্সন ক্রু(শো, ডন্ কুইক্জোট, গালিভার্স ট্রাভেল্স বা ক্যান্ডিড্-এর মতো রোমান্স, উদ্ভট বা রোমান্সের ব্যঙ্গধর্মী রচনা পাঠকমনকে আনন্দ দিয়েছিল। কিন্তু পরে রিচার্ডসন, গোল্ডস্মিথ বা গ্যেটের মতো সাহিত্যপ্রতিভার আবির্ভাব জীবন সম্পর্কে নতুন চেতনা বা মূল্যবোধে পাঠককে প্রাণিত করে। এই মূল্যবোধ সেদিন অনিবার্য ছিল। একদিকে শিল্পযুগ অন্যদিকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র বিস্তার—অন্য কোনও পিছন ফেরা মানসিকতাকে নিশ্চয়ই প্রশ্রয় দিত না।

উপন্যাসের পূর্বসূত্র অন্বেষণ করতে গিয়ে ইতিহাসের পরম্পরা অনুসরণ করে, আরো পিছনে গেলে দেখা যায়, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে গ্রিক বা রোমান সাহিত্যের মতো রোমান্টিক আখ্যান রচিত হয়েছিল। গুণাঢ্য-এর 'বৃহৎকথা' অবশ্য পাওয়া যায়নি। যা পাওয়া গেছে তার মধ্যে আছে সোমদেব-এর 'কথাসরিৎসাগর', (েমন্দ্র-র 'বৃহৎকথামঞ্জরী', শিবদাস-এর 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', দণ্ডী-র 'দশকুমারচরিত', সুবন্ধু-র 'বাসবদত্তা', বাণভট্ট-এর 'কাদম্বরী', বিষ্ণু(শর্মা-র 'পঞ্চতন্ত্র' বা 'হিতোপদেশ'-এর মতো রচনা। প্রাচীন

বাংলা সাহিত্য দেবকাহিনী-নির্ভর হলেও 'মৈমনসিংহ গীতিকা'-য় বাস্তবজীবনরসের রীতিমত প্রতিফলন রয়েছে। আমাদের আখ্যান বা রোমান্টিক গল্প-গাথায় এ ঐতিহ্য তাই কোনো না কোনো আকারে থেকেই গিয়েছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে ইংরেজি শি(া-সংস্কৃতি ধীরে ধীরে বাঙালিকে প্রভাবিত করেছে। ভগীরথের মতো একে আহ্বান জানিয়েছেন ভারতপথিক রামমোহন। পশ্চিমের যুক্তি(বাদকে তিনি আমাদের সামাজিক ও ধর্মীয় আলোচনায় প্রয়োগ করেছেন। সব্যসাচীর মতো তিনি একদিকে খ্রিস্টান মিশনারী, অন্যদিকে র(ণশীলদের অন্ধতা ও মূঢ়তার বি(দ্ধে সংগ্রাম করেছেন। এ(ত্রে তাঁর অস্ত্র ছিল মুক্ত(চিন্তা, জোরালো যুক্তি(বাদ এবং গভীর বাস্তববোধ। পরবর্তীকালের বাংলাদেশের সাহিত্যিক এবং সাংস্কৃতির ঐতিহ্য একে স্বীকার করেই অগ্রসর হয়েছে।

বাংলা উপন্যাসের সূচনা এইরকম এক কোলাহল সং(ব্ধ পরিবেশেই। নতুন কাল পুরনো কালের ধর্মবি(াস, সংস্কার, আচার-বিচার সমস্ত কিছুকেই প্র(করছে। আলোচনায় তখন শুধু যুক্তি(যথেষ্ট নয়, হৃদয়াবেগও সে(ত্রে অবধারিতভাবে যুক্ত(হয়ে থাকে। এরই ফাঁকে ফাঁকে চলে আসে ব্যঙ্গবিদ্রূপের তী(তা। সেটাই হয়ে দাঁড়ায় একটা সামাজিক মূল্যবোধের মতো ব্যাপার। এই মূল্যবোধই দেখতে শেখায় সমাজের অসুখ কোথায়, বিকৃতি কিসে, আতিশয্য-অসঙ্গতিইবা কোন্‌খানে কেন প্রকাশ পাচ্ছে। উপন্যাস রচনার ঠিক পূর্ববর্তী স্তর বা অঙ্কুরোদ্‌গমের পর্বে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-নক্‌শাই সাহিত্য সৃষ্টির অন্যতম অবলম্বন হয়ে থাকে। আমাদের সাহিত্যেও তার অন্যথা কিছু ঘটেনি।

সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠায় এই ব্যাপারটিই আত্মপ্রকাশের জোরালো মাধ্যম খুঁজে পেল। সংবাদপত্রের সঙ্গে উপন্যাসের সম্পর্ক এমনিতেই অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। জীবনের বিচিত্র সংবাদ আর ছবি তো এখানেই এসে ছাপার হরফে সকলের কাছে পৌঁছে যায়। সে সংবাদ আর ছবির বিচিত্র বিবরণ বা রূপ জীবনেরই প্রতিরূপ। মানুষ এরই মধ্যে খুঁজে পায় নিজেকে—নিজের কালকে। উপন্যাস সৃষ্টির সূচনা এখানেই। যদিও, বলাই বাহুল্য যে সংবাদপত্রের সংবাদ, তা যত তথ্যনিষ্ঠই হোক না কেন, কোনোভাবেই উপন্যাস বা ছোটগল্প নয়। না হলেও আমরা দেখি যে, সমাজের বিশেষ কোনো শ্রেণীর জীবনের টুকরো টুকরো দিকগুলিই কেমনভাবে একটা পুরো চরিত্রের আদল পেয়ে যায়। এরকমই একটি দৃষ্টান্ত হল 'তিলকচন্দ্র'। ধনী মানুষের আদুরে, দাম্ভিক সন্তান। মোসাহেব পরিবেষ্টিত এবং 'বাবু' সংস্কৃতির আদিপু(ষ। 'সমাচারদর্শন'-এর দুটি সংখ্যায় (24 ফেব্রুয়ারি, 9 জুন—1821) এর বর্ণনা ছিল। ভবানীচরণ থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ—তার দীর্ঘ ছায়া পড়েছে আমাদের সাহিত্যে। এমনকী বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে শরৎচন্দ্র 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে যে নতুনদা চরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন তা কোনো না কোনো অর্থে সেই তিলকচন্দ্রেরই প্রেতাত্মা।

14.2.1 ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (1787-1848)

সাহিত্যের ইতিহাসকারেরা বলেছেন যে, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ই সম্ভবত এই ধরনের নক্‌শাধর্মী রচনার সূচনা করেন।

বাংলা গদ্যের প্রস্তুতি পর্বে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত-মুন্সি, রামমোহন এবং বিভিন্ন সাময়িকপত্রের ভূমিকাই সাধারণত সবিস্তারে আলোচিত হয়ে থাকে। তুলনায় এই পর্বেরই ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ

কিছুটা উপে(ত থেকে যায়। এ কথা বিশেষভাবে বলবার যে সাময়িকপত্র সম্পাদনা এবং সাময়িকপত্রের মধ্যে দিয়ে সাহিত্যসাধনায় তিনি তাঁর সময়ের মাপে ও ধারায় যথেষ্টই কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। রঙ্গ-ব্যঙ্গের নক্শা রচনায় পথিকৃৎ হিসেবেই যে সিদ্ধি তিনি অর্জন করেছিলেন তাও বলবার মত।

সম্ভবত মার্শম্যান সম্পাদিত 'সমাচারচন্দ্রিকা' মাসিক পত্রিকাতে নানারকম ব্যঙ্গাত্মক সামাজিক নক্শা লিখেই তাঁর সাহিত্যজীবনের সূচনা হয়েছিল। 'সমাচার দর্পণ'-এ প্রকাশিত 'বাবুর উপাখ্যান', 'শৌকীন বাবু', 'বৃদ্ধের বিবাহ' বা 'ব্রাহ্মণ পণ্ডিত'-এর মত নক্শার রচয়িতা ছিলেন ভবানীচরণ।

এই সব প্রচেষ্টারই পরিণতি হল 'নববাবুবিলাস' গ্রন্থ। এটি প্রকাশিত হয়েছিল 1825 খ্রিস্টাব্দে। অনুমান করা হয় যে, 'প্রমথনাথ শর্মন'—ছদ্মনামে অনেক আগেই বইটি তিনি লিখেছিলেন। অর্থের অহঙ্কারে স্ফীত হঠাৎ বাবুদের ব্যক্তি(গত ও পারিবারিক জীবনের নানারকম স্খলন-পতন-ত্রুটিই এর বিষয়বস্তু তথা অবলম্বন। 'আলালের ঘরে দুলাল' এবং 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'-র অঙ্কুর এই বইতেই আমরা প্রথম দেখি। নীরস শাস্ত্রীয় বিচার-বিতর্কের কালে তিনি আমাদের ভাষায় এইভাবেই লালিত্য এবং রসসঞ্চারের চেষ্টা করেছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি অবশ্যই পথিকৃৎ।

ভবানীচরণের প্রথম প্রকাশিত বই কিন্তু 'কলিকাতা কমলালয়' (1823 খ্রিঃ)। কলকাতায় যে সব মানুষ থাকেন না বা যাঁরা গ্রামের মানুষ, তাদের কলকাতা সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত করার জন্যই এই বইটি তিনি রচনা করেন। রঙ্গ-ব্যঙ্গ এতে ছিল না, ছিল সমকালীন 'কলিকাতা মহানগরের স্থূল বৃত্তান্ত'। তাঁর 'দূতীবিলাস' প্রকাশিত হয়েছিল এই বইয়ের দু'বছর পরে (1825 খ্রিঃ)।

'নববাবুবিলাস'-এরই পরিপূরক রচনা হ'ল 'নববিবিবিলাস' (1831 খ্রিঃ)। ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছদ্মনামে এটি লেখা হয়েছিল। স্বয়ং লেখক মন্তব্য করেছিলেন, 'অদ্যাপি নববাবু বিলাসে নববাবুদিগের স্বভাব সুপ্রকাশ আছে। কিন্তু সে গ্রন্থের ফলখণ্ডে লিখিত ফলের প্রধান মূল বাবুদিগের বিবি। সেই বিবিরূপ প্রধান মূলের অঙ্কুরাবধি শেষ তাহাতে সবিশেষ ব্যক্ত(হয় নাই। এ নিমিত্তে তৎ-প্রকাশে, প্রয়াসপূর্বক নববিবিবিলাস নামক এই গ্রন্থ রচনা করিলাম।'

মোট কথা 'নববাবুবিলাস', 'কলিকাতা কমলালয়', 'দূতীবিলাস' এবং 'নববিবিবিলাস'—এই সমস্ত নক্শা শ্রেণীর রচনার জন্যই ভবানীচরণের প্রতিষ্ঠা। সে সময়ের কলকাতার নাগরিক সমাজের কদাচারগুলিকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেই এই আখ্যানগুলি তিনি রচনা করেন। এই ধরনের ব্যঙ্গাত্মক নক্শাগুলি থেকেই বাংলা উপন্যাসের উন্মেষ। প্রত্যেকেই স্বীকার করেছেন যে (চির স্থূলতার দিকটি বিবেচনার মধ্যে না রাখলে লেখক ভবানীচরণের শক্তি(কে স্বীকার করতেই হবে।

14.2.2 প্যারীচাঁদ মিত্র (1814-1883)

ইংরেজি 1800 সাল থেকে 1914 অর্থাৎ একশো বছরেরও বেশি সময় ধরে বাংলা গদ্যের (ে ত্রে সাধুরীতির অবিসংবাদিত প্রতিষ্ঠা থাকলেও চলিতরীতিতে গদ্যরচনার চেষ্টা অল্প হলেও পাশাপাশি চলেছে। সেই সঙ্গে এ সংত্র(ান্ত বিবাদ-বিতর্কও। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যাঁরা লেখক ছিলেন তাঁরা অধিকাংশই সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। এঁদের মধ্যে রামরাম বসু এবং উইলিয়ম কেরি মুখের ভাষাকে গদ্যে ব্যবহারের চেষ্টা করেন। প্রথম জনের 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' এবং দ্বিতীয় জনের 'কথোপকথন' এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য রচনা। এ অবশ্য ব্যতিত্র(মই। কারণ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের গদ্য লেখকরা সাধারণভাবে সাধু গদ্যরীতির ওপরেই নির্ভর

করেছিলেন। রামমোহনের গদ্যরচনার সমকালে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নক্শাগুলিতে কথ্যভঙ্গি ব্যবহারের চেষ্টা চালিয়েছেন। পরবর্তীকালে বিতর্কমূলক বা আত্র(মণাত্মক রচনার বি(দ্ধে লেখনী ধারণ করতে গিয়ে স্বয়ং বিদ্যাসাগরমশাই পর্যন্ত কয়েকটি রচনায় ব্যঙ্গাত্মক কথ্যভঙ্গি অবলম্বন করেছিলেন। যদিও একই সঙ্গে এ কথাও নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত যে বিদ্যাসাগর-অ(য়কুমার-দেবেন্দ্রনাথ বা ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মত লেখকদের চেষ্টায় সাধুভাষার আদর্শ যে পর্যায়ে পৌঁছেছে তার তুলনায় কথ্য বা শিষ্ট চলিত গদ্যরীতির কোনো স্থির আদর্শ গড়ে ওঠেনি। চলিত গদ্যের গু(ত্ব বা শক্তি(নিয়েও রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দের আগে কোনো পরী(া-নিরী(া হয়নি।

এই পটভূমিকাতেই প্যারীচাঁদ মিত্রের সাহিত্য রচনার ইতিহাস বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ভাষা বিষয়ে সচেতনতা এবং মৌলিক সৃষ্টি প্রতিভা—প্যারীচাঁদের এই দুটি বিশেষত্ব সম্পর্কে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত ছিল যে— সেই সময়ে বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগরের হাতে যে ভাষা গড়ে উঠেছিল তা সুন্দর হলেও সর্বজনের বোধগম্য হয়ে উঠতে পারেনি। সেই সঙ্গে ছিল ইংরেজি অথবা সংস্কৃত গ্রন্থের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা। বাঙালি লেখকেরা গতানুগতিকের বাইরে যাবার সাহস করতেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, এই দুটি গু(তর বিপদ থেকে প্যারীচাঁদ মিত্রই বাংলা সাহিত্যকে উদ্ধার করেন। যে ভাষা প্রত্যেক বাঙালি বুঝতে পারে, ব্যবহার করে, তিনিই প্রথম তা তাঁর বইয়ে প্রয়োগ করেন। ইংরেজি এবং সংস্কৃতের দ্বারস্থ না হয়ে 'স্বভাবের অনন্ত ভাণ্ডার' থেকেই নিজের রচনার উপাদান সংগ্রহ করেন। 'আলালের ঘরের দুলাল' লিখে প্যারীচাঁদ দুটি প্রয়োজনই সিদ্ধ করেন।

1854 সালে প্যারীচাঁদ তাঁর বন্ধু রাধানাথ শিকদারের সহযোগিতায় 'মাসিক পত্রিকা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছিল যে এই পত্রিকায় যে ভাষায় আমাদের সচরাচর কথাবার্তা হয়, তাতেই সমস্ত প্রস্তাব রচনা করা হবে। আরও সরলভাষায়, কথ্যরীতির গদ্যই হবে এই পত্রিকার সবরকম রচনার ভাষা। মোট কথা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র শাখার সঙ্গে সাধারণ বাঙালি পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য প্যারীচাঁদ বাংলা সাহিত্যে এক অভিনব আবহাওয়ার সৃষ্টি করেন। এই পত্রিকাতেই তিনি 'টেকচাঁদ ঠাকুর' ছদ্মনামে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করলেন—'আলালের ঘরের দুলাল'। এই বই বাংলা সাহিত্যে প্রথম উপন্যাস (যদিও সফল পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের জন্য আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত অপে(া করতে হয়েছে)। প্রকাশকাল 1854 সাল।

বঙ্কিমচন্দ্র এই বইয়ের কথাতেই বললেন যে, প্যারীচাঁদই প্রথম সার্থকভাবে প্রমাণ করলেন যে— বাঙালির প্রতিদিনকার ব্যবহারের ভাষায় বই লেখা যায়। এই ভাষা সুন্দর, সকলের কাছেই পৌঁছে যায়। ভাষার এই সামর্থ্যের কথা জানবার পর থেকে বাংলা সাহিত্য দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে।

এ কথাও সর্বজনস্বীকৃত যে 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর ভাষা আদর্শ ভাষা নয়। কিন্তু এই বইয়ের দ্বারা প্রথম প্রমাণিত হল যে, কথ্যচলিতভাষা সংস্কৃতনির্ভর সাধুভাষার চেয়ে কম শক্তি(শালী নয়। পরবর্তীকালের গদ্যলেখকেরা এরই প্রভাবে সংস্কৃতরীতি এবং কথ্যরীতির গদ্যের মধ্যে সামঞ্জস্য করেই গদ্য লিখবার চেষ্টা করেছেন। বাংলা গদ্যের ইতিহাসে 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর যে গু(ত্ব তা এই জন্যই। মুখের ভাষাভঙ্গিকে আশ্রয় করে প্যারীচাঁদ সত্যিই সেদিন আশ্চর্য বাস্তবতায় কলকাতার নাগরিক জীবনকে ধরতে পেরেছিলেন। যেমন 'রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে—কলুরা ঘানি জুড়ে দিয়েছে—গ(লইয়া

চলিয়াছে—ধোপার গাধা ধপাস ধপাস করিয়া যাইতেছে—মাছের ও তরকারির বাজরা হু হু করিয়া আসিতেছে—ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা কোশা লইয়া স্নান করিতে চলিয়াছেন— মেয়েরা ঘাটে সারি হইয়া পরস্পর মনের কথা কহিতেছে।'

বা, 'বাবুরামবাবু চৌগোঁপপা...ইতস্ততঃ বেড়াইয়া চাকরকে বলছেন—ওরে হরে। শীঘ্র বালি যাইতে হইবে, দুই-চার পয়সায় একখানা চল্‌তি পান্‌সি ভাড়া কর তো। বড়মানুষের খানসামারা মধ্যে মধ্যে বেআদব হয়, হরে বলিল, মোসায়ের যেমন কাণ্ড। ভাত খেতে বস্তেছিনু—ডাকাডাকিতে ভাত ফেলে রেখে এস্তেছি।...চল্‌তি পান্‌সি চার পয়সায় ভাড়া করা আমার কর্ম নয়—এ কি থুতকুড়ি দিয়ে ছাতু গোলা?'

প্যারীচাঁদ আরও কিছু আখ্যান রচনা করেছিলেন। কিন্তু তা ঠিক উপন্যাস হয়ে উঠতে পারেনি। যেমন 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়' (1859)। এখানে দশটি আখ্যান আছে। আখ্যানগুলিতে আমারে হিন্দুসমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি বা না-বাচক দিকগুলিই উপস্থাপিত করা হয়েছে। গল্পগুলি ঠিক জমে ওঠেনি। কিন্তু লেখকের সরসকৌতুক বলবার মত।

'রামরঞ্জিকা' (1860) মেয়েদের জন্য সংলাপের ঢঙে লেখা। গল্পের ইঙ্গিত আছে, কিন্তু সে অত্যন্ত সামান্য। তাছাড়া রয়েছে নীতি উপদেশের আধিক্য। 'যৎকিঞ্চিৎ' (1865) আখ্যানে ঈশ্বরতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন লেখক গল্পের আকারে। 'অভেদী' (1871) এবং 'আধ্যাত্মিকা' দুটি রচনাই রূপকধর্মী উপন্যাস। সাহিত্যের ঐতিহাসিক-সমালোচকদের বিবেচনায় অধ্যাত্ম-তাত্ত্বিক প্যারীচাঁদ বড় হয়ে উঠেছেন। গল্পরস আড়ালে চলে গেছে। কোনো কোনো জায়গায় সরস রসিকতা থাকলেও 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর কাছাকাছি এসব রচনা আসে না। বিজ্ঞান বা কৃষি বা অন্যান্য কিছু বিষয়ে তিনি বিশেষভাবে লিখেছিলেন, এমনকী ব্রহ্মসংগীত। কিন্তু এসব উল্লেখ করার মত রচনা নয়। সাহিত্যগুণেরও সে অর্থে অবকাশ নেই। মোটকথা প্যারীচাঁদ প্রতিদিনের চেনা জীবন আর ঘরের কথাকেই সরস নৈপুণ্যে পরিবেশন করেছেন। আর সেইজন্যেই তার এত আদর। বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, 'তিনিই (প্যারীচাঁদ) প্রথম দেখাইলেন যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে, তাহার জন্য ইংরাজী বা সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা চাহিতে হয় না। তিনি প্রথম দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে তেমনই সাহিত্যে, ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর, পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় না।' প্যারীচাঁদ প্রসঙ্গে এ সিদ্ধান্ত সর্বাংশে প্রযোজ্য।

অধ্যাপক সুকুমার সেনের মতে, 'বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে মাইকেল মধুসূদনের দান যেরকম, বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে প্যারীচাঁদের দান প্রায় সেইরকমই।' প্যারীচাঁদের রচনায় ব্যাকরণগত দৌর্বল্য ও আভিধানিক শব্দের বাহুল্য থাকা সত্ত্বেও তাঁর রচনায় মৌলিকত্ব ছিল। প্যারীচাঁদের গ্রন্থ প্রকাশের আগে বাংলা উপন্যাস বলতে সংস্কৃত ফারসি উর্দু ও ইংরেজি থেকে নেওয়া গল্প-কথা ও রোমাঞ্চ কাহিনীই বোঝাত। প্যারীচাঁদের সম্বন্ধে সমালোচক রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেছিলেন যে, নীরস ছাঁদে ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গদ্যে রচিত প্রচলিত রোমাঞ্চ কাহিনীর ঊষর অন্ধকার থেকে প্যারীচাঁদ বাংলা উপন্যাসের বীজ আলোকে এনেছেন। (বাংলার সাহিত্য ইতিহাস, সাহিত্য আকাদেমি, 1987 সংস্করণ)

14.2.3 হানা ক্যাথেরীন ম্যুলেন্স

প্যারীচাঁদের উপন্যাসের আগে প্রকাশিত একটি রচনা এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করবার। যদি উপন্যাস হিসেবে বিচার করতে হয় তাহলে একেও বিবেচনার মধ্যে রাখতে হবে। এই রচনাটির নাম 'ফুলমণি ও

ক(ণার বিবরণ'। 1852 সালে কলিকাতা ত্রি(শ্চিয়ান ট্র্যাক্ট অ্যান্ড বুক সোসাইটির উদ্যোগে হানা ক্যাথেরীন ম্যুলেন্স নামে এই মিশনেরই এক ফরাসি মহিলা এটি রচনা করেন। অবশ্যই এটি মৌলিক কোনো রচনা নয়। ইংরেজি থেকে বাংলা রূপান্তর। দেশীয় খ্রিস্টান পরিবারের বর্ণনাই এতে স্থান পেয়েছে। মিশনারি খ্রিস্টানদের মতই ম্যুলেন্স বি(্বাস করতেন যে, যিশুই পরম পরিত্রাণের একমাত্র অবলম্বন। এই সব কথা প্রচারের জন্যই তিনি মূল ইংরেজি আখ্যান "The Week"-এর গল্পাংশ বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। প্রসঙ্গত বিশেষভাবে বলতে হয় যে, ম্যুলেন্স-এর জন্ম, জীবন এবং মৃত্যু এ দেশেই। সাধু বাংলা ভাষার সঙ্গে কথ্য বাংলাও তিনি রীতিমত আয়ত্ত করেছিলেন।

আগেই বলা হয়েছে যে প্যারীচাঁদের গ্রন্থ প্রকাশের আগেই ম্যুলেন্স-এর এই রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। আখ্যান অংশ, চরিত্র বা ভাষা কোনোদিক দিয়েই একে সে সময়ের তুলনায় পিছিয়ে-পড়া রচনা বলে চিহ্নি(ত করা যায় না। বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট ইতিহাসকার অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, এর ভাষা এত সহজ এবং সরল, যে আখ্যানটি কোন বিদেশিনী লিখেছেন বলে মনেই হয় না। (*দ্রষ্টব্য* আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সং(িপ্ত ইতিবৃত্ত) তবে খ্রিস্টধর্মের মহিমা প্রচারের জন্যই বইটি লেখা হয়েছিল বলে সে যুগে এবং পরবর্তীকালের বাঙালিসমাজে এর প্রচার হয়নি।

14.2.4 কালীপ্রসন্ন সিংহ (1840-1870)

নক্শাধর্মী রচনায় পরম সিদ্ধি কালীপ্রসন্ন সিংহের। খুব অল্প বয়স থেকেই ধনীর দুলাল কালীপ্রসন্ন নানারকম সাহিত্যিক এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন। একটিমাত্র বই লিখেই বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্থায়ী আসন। সেই বইটির নাম 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' (1864)। একটু আগেই যে 'বাবু' সম্প্রদায়ের কথা বলা হয়েছে 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'-য় তাদেরই বিকৃত জীবনযাত্রা এবং সেই সঙ্গে কলকাতার সে সময়কার নাগরিক জীবনের ছবি বিদ্রূপাত্মক ঢঙে আঁকা হযেছে। শুধু মুখের ভাষার ভঙ্গি নয়, তাঁর ব্যবহৃত শব্দের উৎসও লোকায়ত বাক্-রীতি। এই বইয়ের কোথাও সাধুরীতির অনুসরণ নেই। যাকে কলকাতার 'কক্নি' বলে, হুতোম তাই ব্যবহার করেছেন।

মোটকথা কলকাতার বিচিত্র পাল-পার্বণ, উৎসব, বারোয়ারি পুজো, নানারকম হাস্যকর হুজুগ, কপটতা, হঠাৎ পয়সায় ফেঁপে ওঠা, 'বাবু'-দের বিচিত্রলীলা, মাহেশের রথযাত্রা থেকে আরম্ভ করে রেলের টিকিটবাবু—সব কিছুরই তির্যক বর্ণনা আমাদের সাহিত্যে প্রকৃতই অভিনব। কালীপ্রসন্নের ব্যক্তি(গত জীবন নিয়ে একালে যতই প্র(্ন তোলা হোক না কেন তিনি যে আন্তরিকভাবেই দেশপ্রেমিক ছিলেন এতে সন্দেহ নেই। দেশের মানুষের কল্যাণের জন্য অর্থব্যয়ে তাঁর কোনো কার্পণ্য ছিল না। আমাদের নাগরিক জীবনের বিচিত্র ব্যভিচার বা ইতরতা কালীপ্রসন্ন বা হুতোমের একেবারেই পছন্দ হয়নি আর সেইজন্যই দুই খণ্ডের এই নক্শা। এতে তিনি প্রকৃতই সাহস এবং বাক্-নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন। বাঙালির নীচতাকে সে সময়ে এভাবে কেউ আত্র(মণ করতে পারেননি। তাঁর ভাষা অবশ্য এইজন্য যে কোনো কোনো সময় অমার্জিত এবং (চিবিরোধী হয়েছে এতেও সন্দেহ নেই। সেই সময়কার ভিক্টোরিও নীতিবোধে পুষ্ট আমাদের বুদ্ধিজীবী শ্রেণী এ ভাষা পছন্দ করেননি। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের মতো সাহিত্যরথীর বক্তব্য ছিল যে হুতোমের ভাষা দরিদ্র, এতে শব্দসম্পদ নেই, তেজ বা বাঁধনেরও খুব অভাব। সব মিলিয়ে এ ভাষা অসুন্দর এবং যেখানে অ(ীল নয়, সেখানে পবিত্রতার

কোনও স্পর্শ নেই। সবচেয়ে বড় কথা হল 'হুতোমি ভাষায় কোন গ্রন্থ প্রণীত হওয়া কর্তব্যে নহে। যিনি হুতোম পেঁচা লিখিয়াছিলেন, তাঁহার (চি বা বিবেচনার আমরা প্রশংসা করি না' ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো সাহিত্যের ঐতিহাসিক সমালোচক মন্তব্য করেছেন, 'হুতোমি ভাষার মত শক্তি(শালী তী্র ভাষা পরবর্তীকালে চলিতভাষার প্রবর্তক প্রমথ চৌধুরীও সৃষ্টি করিতে পারেন নাই।'

হুতোমি ভাষার উদাহরণ

"এদিকে চড়কতলায় টিনের ঘুরঘুরি, টিনের মুহুরি দেওয়া তল্‌তা বাঁশের বাঁশী, হলদে রং করা বাঁখারির চড়কগাছ, ছেঁড়া ন্যাকড়ার তৈরি গুরিয়া পুতুল, শোলার নানাপ্রকার খেলনা, পেল্লাদে পুতুল, চিত্তির করা হাঁড়ি বিত্রি(কত্তে বসেছে, 'ড্যানাক ড্যানাক ড্যাডাং ড্যাং চিঙ্গিড়ি মাছের দুটো ঠ্যাং' ঢাকের খোল বাজে, গোলাপিখিলির দোনা বিত্রি(হচ্ছে।"

একালের প্রায় সমস্ত বিদগ্ধ বাঙালি সাহিত্যরসিকই 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'-কে বাংলা সাহিত্যের অসামান্য কীর্তি বলে স্বীকার করেছেন।

প্যারীচাঁদ মিত্রের ভাষার সঙ্গে হুতোমের ভাষার একটি তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথম জন প্রধানত সাধুভাষাই ব্যবহার করেছিলেন। সেই সঙ্গে কলকাতার 'কক্‌নি' ভাষা এমনকী গ্রাম্যভাষাও তিনি পর্যাপ্তভাবে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তাঁর ভাষায় সাধু-চলিতের মিশ্রণও ঘটেছে যথেচ্ছভাবে। অবশ্য এ ত্রুটি স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রেরও ছিল। কালীপ্রসন্ন কিন্তু সেদিক দিয়ে দেখলে পুরো কলকাতার চলিতভাষাই ব্যবহার করেছেন, কোথাও তাকে সাধুভাষার সঙ্গে মিশিয়ে বা গুলিয়ে ফেলেননি। মুখের ভাষাকে লেখায় আনবার ব্যাপারে ব্যক্তি(গত উচ্চারণের রীতি, মুদ্রাদোষ—সমস্ত বানানই তিনি এনেছেন ধ্বনি অনুসারে। শুদ্ধ বানান সেসব ে(ত্রে তিনি অনুসরণ করেননি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এ ভাষার প্রতিস্পর্ধী কোনো লেখার পরিচয় কিন্তু নেই। বিংশ শতাব্দীতে প্রমথ চৌধুরীও এই ধরনের কথ্য গদ্য লিখতে পারেননি। তাঁর চলিত গদ্য এতই মার্জিত এবং শিষ্ট যে তাকে সাধুভাষার মতোই অনেক সময় কৃত্রিম এবং গু(ভার মনে হয়।

যাই হোক, প্যারীচাঁদের সঙ্গে হুতোমের সাদৃশ্যের দিকটিও বিশেষভাবে বলবার। সেটি হ'ল, দুজনেই বাঙালিসমাজের উন্নতি চেয়েছিলেন। দুজনেই আমাদের সে সময়কার সামাজিক জীবনের কদর্যতার নিন্দা করেছেন। প্যারীচাঁদ হাসির রসে মিশিয়ে তাঁর নিন্দা-কটা(কে উপস্থাপিত করেছেন। হুতোম এরকম কোনো তির্যক পথ অবলম্বন করেননি। সেদিনকার কলকাতার নাগরিক জীবন ও সমাজের না-বাচক দিকগুলিকে তিনি নির্মমভাবেই আঘাত করেছিলেন। তাঁর ভাষাও যে অনেক সময় অমার্জিত এবং অশিষ্ট হয়েছে তা এইজন্যই।

14.2.5 ভূদেব মুখোপাধ্যায় (1827-1894)

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্যসৃষ্টির উপত্র(মণিকা হিসেবে তাঁর চরিত্রের মৌলিক দিকটির কথা বিশেষভাবে বলতে হয়। ইউরোপীয় সাহিত্য ও সভ্যতায় পূর্ণ অভিনিবেশ সত্ত্বেও আত্মবিস্মৃত হয়ে সে পথের পথিক হননি। স্বদেশের প্রায় সব কিছুতেই ছিল তাঁর অখণ্ড আস্থা। যদিও অন্ধবিশ্বাসের কোনো প্র(ই ওঠে না। পাশ্চাত্য বা স্বদেশী—ভূদেব কোনো দিকেই চরমপন্থী ছিলেন না। বিচারবুদ্ধি দিয়ে যার যেটুকু গ্রহণ করবার, যেটুকু অবলম্বন করলে নিজের স্বাতন্ত্র্য এবং গতিশীল সময়ের সঙ্গে সর্ব অর্থে যুক্ত(থাকা যায়—

গ্রহণবর্জনের সেই কঠিন সামঞ্জস্যসাধন নিজের জীবনচর্চায় তিনি সম্ভব করে তুলতে পেরেছিলেন। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান হয়েও তিনি পড়াশুনো করেছিলেন হিন্দু কলেজে(কিন্তু নতুন কালের শি(া বা সভ্যতায় আলোকিত মন নিয়ে আমাদের প্রাচীন আদর্শগুলি কতটা গ্রহণযোগ্য এ ব্যাপারেই তাঁর অভিনিবেশ ছিল বেশি। এককথায় আধুনিক হয়েও আধুনিকতার নামে নির্বিচারে তার সবকিছু গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন না ভূদেব। সেজন্য তাঁকে বাইরের দিক দিয়ে অবশ্যই কিছুটা র(ণশীল মনে হয়েছে। যদিও সামগ্রিকভাবে ভুদেবের রচনা পর্যালোচনা করলে এ কথা মানতে হবে যে, যুক্তি(নিষ্ঠ এবং অন্ধ সংস্কারের বশবর্তী হয়ে কোনো কিছু তিনি করেননি। বিচার-বি(ে-ষণাত্মক রচনায় ভূদেব যে সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন তা বিশেষভাবে স্মরণীয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর অনেক প্রবন্ধকারই ভূদেবের এই সার্বিক যুক্তি(মনস্কতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। সাহিত্যের বিশিষ্ট ঐতিহাসিক লিখেছেন, 'যুবশক্তি(কে সমন্বয়ধর্মী জীবনপথে পরিচালিত করা—সর্বোপরি ব্যক্তি(জীবনকে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সঙ্গে অন্বিত করিয়া দেখার নৈতিক আদর্শ স্থাপন তাঁহার জীবনাদর্শ ছিল। কিন্তু তাই বলিয়া বাস্তব জ্ঞান বিসর্জন দিয়া একটা রক্ত(মাংসহীন পাণ্ডুর নীতি ও আদর্শ তাঁহাকে কোন দিন প্রলুব্ধ করে নাই। বাঙালিকে বৃহৎ জীবনের স্বাদ গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার জন্য তাহাকে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য উভয় জীবনাদর্শে দী(ত হইতে হইবে, কিন্তু পায়ের তলার মাটি ভুলিলে চলিবে না। সে মাটির অর্থ বাঙালি যে বৃহৎ ভারত সংস্কারের অন্তর্ভুক্ত(, তাহার প্রতি অবিচল নিষ্ঠা। এ বিষয়ে তিনি আশ্চর্য অসাম্প্রদায়িক উদার মনের পরিচয় দিয়াছেন'। (আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সং(প্ত ইতিবৃত্ত—ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)।

ভূদেব প্রধানত শি(াব্রতী। তাঁর শি(াসংক্র(ান্ত গ্রন্থগুলি হল 1. 'শি(াবিষয়ক প্রস্তাব' (1856), 2. 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞান' প্রথম ও দ্বিতীয় (1858-59),। 3. 'পুরাবৃত্তসার' (1858), 4. 'ইংলণ্ডের ইতিহাস' (1862), 5. 'ে(ত্রতত্ত্ব' (1862), 6. 'রোমের ইতিহাস' (1863), 7. 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (1904)। ইতিহাস, পদার্থবিদ্যা এবং গণিতশাস্ত্রের এই গ্রন্থগুলি একসময় স্কুল-কলেজের অপরিহার্য পাঠ্য হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। ইতিহাস ভূদেবের প্রিয় প্রসঙ্গ। কেবল ছাত্র নয়, সাধারণ পাঠকের দিকেও তাঁর অভিনিবেশ ছিল অতন্দ্র। 'বিবিধ প্রবন্ধ'-এর দুটি খণ্ডে সংস্কৃত সাহিত্যের উত্তরচরিত, রত্নাবলী, মৃচ্ছকটিক এবং তন্ত্রশাস্ত্র সম্পর্কিত আলোচনায় তিনি সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন। যদিও এব্যাপারে তাঁর সাফল্যকে কখনোই বিদ্যাসাগরের সমগোত্রীয় বলে বিবেচনা করা যায় না। বি(ে-ষণের সামর্থ্যে তিনি এব্যাপারে কিছুটা পিছনেই ছিলেন। এছাড়া রয়েছে 'পারিবারিক প্রবন্ধ' 'সামাজিক প্রবন্ধ' এবং 'আচার প্রবন্ধ'-এর মত রচনা। সামাজিক আদর্শ তথা নৈতিকতা, ব্যক্তি(মানুষের অধিকার বা কর্তব্যপালন ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে যে ধরনের চিন্তামূলক আলোচনা তিনি এইসব রচনায় করেছিলেন তার গু(ত্ব ঊনবিংশ শতাব্দী তো বটেই আজ পর্যন্ত বিদ্যমান। অবশ্য কালের পরিবর্তনের কথা মনে রেখেই এ কথা বলা হচ্ছে। এখানেও তিনি উদার, অসাম্প্রদায়িক এবং সময়ের তুলনামূলক বিবেচনায় অবশ্যই আধুনিক।

এ হল ভূদেবের গদ্যরচনায় প্রবন্ধের দিক। কিন্তু তিনি তো রসস্রষ্টাও বটে। প্রথম যৌবনে ইতিহাসকে অবলম্বন করে চেষ্টা করেছিলেন ইতিহাস-নির্ভর রোমান্স রচনার। তাঁর দুটি ঐতিহাসিক রোমান্স অবশ্যই উল্লেখ করার মত। 1. 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' (1857) এবং 2. 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস' (প্রথম ধারাবাহিক প্রকাশ—এডুকেশন গেজেট, 1875(গ্রন্থাকারে প্রকাশ 1895)। ইংরেজি 'রোমান্স অফ হিস্ট্রি'

নামের কাল্পনিক কাহিনীর আদর্শে প্রথম গ্রন্থটির পরিকল্পনা করা হয়। 'সফল স্বপ্ন' এবং 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' নামের দুটি বড় গল্প নিয়ে এটি রচিত। পটভূমি ভারত-ইতিহাসের মুসলমান যুগ। অনেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'-এর প্রভাব অনুমান করেন। তবে এরকম তুলনার একটা অসুবিধে এই যে, বঙ্কিমের সাহিত্যিক বা ঔপন্যাসিক প্রতিভার সামর্থ্য ভূদেবের (ে ত্রে অকল্পনীয়। দুটি উপন্যাসের ঘটনার মধ্যে কিছুটা মিল আছে, এইমাত্র। তাঁর পরবর্তী ঐতিহাসিক রোমান্স 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস'-এর পরিকল্পনা-কৌশল উল্লেখের দাবি রাখে। লেখক স্বপ্ন দেখেছেন তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে বালাজী বাজীরাওয়ের নেতৃত্বে মারাঠাশক্তি(পরাজিত করেছে মুসলমানশক্তি(র নেতা আহমদ শাহ আবদালিকে। এর ফলে ভারতবর্ষের কী ধরনের পরিবর্তন ঘটতে পারে তারই এক কাল্পনিক এবং সরস বিবরণ এই রোমান্সের মূল আখ্যান অংশ। ভূদেবের ইতিহাসবোধ, দেশপ্রেম এবং কল্পনাশক্তি(সমস্ত এক সঙ্গে মিশে গিয়ে রচনাটিকে তাৎপর্যমণ্ডিত করেছে।

জীবন এবং ভাষা ব্যবহার—ভূদেব উভয়(ে ত্রেই সংযত। অনেকে তাঁর ভাষায় সরসতা খুঁজে পান না। এ কথা সত্য নয়। যেখানে তিনি প্রবন্ধকার সেখানে তাঁর কাছ থেকে রম্য বা রস রচনার স্বাদ ও মেজাজ প্রত্যাশা করা অনুচিত। মননশীল রচনায় তাঁর ভাষা বিষয় অনুসারেই বিন্যস্ত—তা যুক্তি(পূর্ণ এবং পরিচ্ছন্ন। আড়ম্বর ও অহেতুক আবেগবর্জিত। অন্যদিকে যেখানে তিনি রোমান্স রচয়িতা, 'উপন্যাস' রচনায় যত্নবান, সেখানে তাঁর ভাষা অবশ্যই আখ্যানোপযোগী এবং সাহিত্য রসাশ্রয়ী।

14.3 উপন্যাসের প্রতিষ্ঠা

14.3.1 বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (1838-1894)

বাংলা উপন্যাস যথার্থ পরিণতি লাভ করেছে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতে। প্যারীচাঁদ মিত্র বা ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মত লেখকেরা এ ব্যাপারে চেষ্টা করেছিলেন আন্তরিকভাবেই। কিন্তু আধুনিক বাস্তবধর্মী মানসিক বিচিত্র টানাপোড়েননির্ভর যে কাহিনী তা রচনা করা তাঁদের সামর্থ্যের অতীত ছিল। ঠিকই যে, প্রথম জন 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর মত রচনায় উপন্যাসের একটা পটভূমি তৈরি করতে চেয়েছেন, কিন্তু চরিত্রে যে ব্যক্তি(ধর্ম বা অন্তর্দ্বন্দ্ব একটি কাহিনী-নির্ভর রচনাকে উপন্যাস করে তোলে বঙ্কিমচন্দ্রের আগে আমাদের কোনো সাহিত্যপ্রতিভাই তার সার্থক রূপায়ণ ঘটাতে পারেননি।

সাহিত্যের ঐতিহাসিক-সমালোচকদের কাছে তাই এ সিদ্ধান্ত সর্ববাদিসম্মত যে, বঙ্কিমের হাতেই বাংলা উপন্যাস পূর্ণ যৌবনের সামর্থ্য এবং সৌন্দর্য অর্জন করেছে। তাঁর প্রত্যেক উপন্যাসের মধ্যেই সতেজ ও সমৃদ্ধভাবের উজ্জ্বল প্রকাশ। গভীর জীবনরস ও রহস্য অনন্য সাহিত্যিক শক্তি(তে বঙ্কিম উপস্থাপিত করেছেন তাঁর সৃষ্টির জগতে। এ বস্তুর স্বাদ বাঙালিকে প্রথম তিনিই দিয়েছেন। তাঁর মর্যাদা শুধু পথিকৃতের নয়, অসাধারণ সিদ্ধিতেও।

ইংরেজি ভাষায় গদ্যকাহিনী 'রাজমোহন্স্ ওয়াইফ' (রাজমোহনের স্ত্রী) বঙ্কিমের উপন্যাস রচনার প্রাথমিক প্রয়াস। দ্রুত তিনি ফিরে আসেন বাংলাভাষা ও সাহিত্য রচনায়। সব মিলিয়ে উপন্যাস লিখেছেন চোদ্দোটি। গুণগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সেগুলির বিভাজন এইরকম

1. ইতিহাস ও রোমান্স 'দুর্গেশনন্দিনী' (1865), 'কপালকুণ্ডলা' (1866), 'মৃণালিনী' (1869), 'যুগ-লাঙ্গ ুরীয়' (1874), 'চন্দ্রশেখর' (1875), 'রাজসিংহ' (1882) এবং 'সীতারাম' (1887)।

2. সামাজিক উপন্যাস, বড় গল্প 'বিষবৃ(' (1873), 'ইন্দিরা' (1873), 'যুগলাঙ্গুরীয়' (1874), 'রাধারাণী' (1875), 'রজনী' (1877) এবং 'কৃষ(কান্তের উইল' (1878)।

3. তত্ত্ব এবং দেশপ্রেমমূলক উপন্যাস 'আনন্দমঠ' (1882), 'দেবী চৌধুরাণী' (1884), সীতারাম।

এই বিভাজন থেকেই বঙ্কিম-প্রতিভার বৈচিত্র্য ও ব্যাপ্তি অনুমান করা যায়। পরবর্তী বাঙালি ঔপন্যাসিকেরা এই গোত্রীয় বৈচিত্র্য সৃষ্টিতে সফলকাম হননি, সাহিত্যের ঐতিহাসিক অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, 'স্কটের অর্ধ ঐতিহাসিক রোমান্টিক আখ্যান এবং ডিকেন্সের দৈনন্দিন জীবনের গল্পরসের অনুরূপ বৈশিষ্ট্য বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় উপন্যাসেই ল(্য করা যাইবে। তাই তাঁহার উপন্যাসে যেমন রোমান্সের বিচিত্র ঐ(র্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, তেমনি বাস্তব জীবনও পুরাপুরি উপে(ত হয় নাই।' (আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সং(প্ত ইতিবৃত্ত)।

1. ইতিহাস ও রোমান্সধর্মী উপন্যাস ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার প্রাথমিক শর্তই হল ইতিহাসকে আশ্রয় করে মানুষের বিচিত্র জীবনকথা ঔপন্যাসিককে ফুটিয়ে তুলতে হবে। শুধু ইতিহাসের নীরস তথ্যের পুনরাবৃত্তি নয়। সময়কে রূপ দিতে হবে ইতিহাস-রস সৃষ্টি করে। তা যদি না হয় তাহলে তাঁর সাহিত্যে শিল্পগত কোনো মূল্য থাকে না। ইতিহাস এবং কল্পনাকে মিশিয়ে ঘটল বাংলা সাহিত্যে প্রথম যথার্থ ঐতিহাসিক রোমান্সের সৃষ্টি। 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে তার সূত্রপাত। মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহের সঙ্গে পাঠানদুহিতা আয়েষা এবং গড়মান্দারণ দুর্গের অধী(রের বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা তিলোত্তমার প্রেমের বর্ণময় চিত্রই এই উপন্যাসের প্রধান বক্ত(ব্য। এর আগে প্রকাশিত ভূদেবের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'ও ঐতিহাসিক রোমান্স। কিন্তু তার সাফল্য এই মাত্রায় একেবারেই নয়। স্কটের 'আইভ্যান্হো' উপন্যাসের সঙ্গেও এর কিছু মিল আছে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যে তাঁর নিজের মতই, অন্য কারোর দীপ্তিতে উজ্জ্বল নন, এই উপন্যাস থেকেই সে কথা স্থির হয়ে গেল। এও ঠিক, যেসব চরিত্র লেখক এই উপন্যাসে সৃষ্টি করেছেন, সেখানে উপন্যাসের মত স্বাতন্ত্র্য, বিশিষ্টতা বা পরিণামকে সংবদ্ধ করার অবকাশ তিনি পাননি— রোমান্সে তা ঠিক করাও যায় না। তবে বিমলা চরিত্রটির মধ্যে বাস্তবের স্পর্শ আছে। গজপতি-আশমানীর ছবি অবশ্য এই উপন্যাসে মানানসই হয়নি। এ(ত্রে তিনি ইংরেজি নয়, সংস্কৃত আদর্শ প্রভাবিত।

'দুর্গেশনন্দিনী'-র পরবর্তী রচনা 'কপালকুণ্ডলা'। উপন্যাস এবং রোমান্সের এ এক তুলনাহীন দ্বিবেণীসংগম। অরণ্যনিবিড় সমুদ্রের জনহীন পরিবেশে সঙ্গী-পরিত্যক্ত(নবকুমারের সঙ্গে কাপালিক প্রতিপালিতা ত(ণী কপালকুণ্ডলার সা(াৎ, নবকুমারের জীবন র(া এবং বিবাহ—এই উপন্যাসের প্রথম পর্ব। স্বগ্রামে ফিরবার পরে এক বিচিত্র জটিল দাম্পত্যজীবনের আবর্তে নি(প্ত হয়েছে এই দুজন। অরণ্যদুহিতা কপালকুণ্ডলা প্রতিদিনের পারিবারিক জীবন তথা দিনযাপনের মধ্যে দায়িত্ব বা মাধুর্য কোনোটাই খুঁজে পায়নি। ঘটনা জটিলতর হয় যখন নবকুমারের সঙ্গে তারই পরিত্যক্ত(া প্রথমা পত্নী পদ্মাবতীর সা(াৎ হয়। এসময় মুসলমান হয়ে যায় মতিবিবি। নবকুমারকে আবার পাবার আকাঙ(া বা বাসনা তার তখন প্রবল। অন্যদিকে কপালকুণ্ডলা তার নিজের মধ্যে শুনতে পায় অরণ্য-সমুদ্রের আহ্বান। একই সঙ্গে অদৃষ্ট-নিয়তির হাতছানি। সব মিলিয়ে শোকাবহ পরিণামের এক অসামান্য শিল্পিত রূপায়ণ। ঘটনার বুনন, চরিত্রসৃষ্টি, ভাষা, বর্ণনারীতি— সব মিলিয়ে এ উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্রের এক তুলনাহীন সৃষ্টি।

পরবর্তী উপন্যাস 'মৃণালিনী'-তে লেখকের শিল্পসিদ্ধির কিছুটা অবনতি ল(্য করা যায়। মুসলমান শক্তি(র হাতে বাঙালির পরাজয়ের পটভূমিকায় হেমচন্দ্র-মৃণালিনীর প্রণয়কথা উপস্থাপিত করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। ইতিহাস, রোমান্স বা জীবন কোনোটিই এতে সুগ্রথিত হতে পারেনি। তবে পশুপতির কাহিনী— যেখানে মুসলমানশক্তি(র বঙ্গবিজয়ের কাহিনী বিবৃত হয়েছে, সেখানে বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাসবোধ তথ্যসম্মত।

'যুগলাঙ্গুরীয়' আসলে একটি বড় গল্প। গল্পের গ্রন্থন নৈপুণ্যে লেখক একেবারেই সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। যে ব্যক্তি(স্বাতন্ত্র্য চরিত্রকে মর্যাদা দেয়, এখানে তার একান্ত অভাব।

'চন্দ্রশেখর', 'রাজসিংহ' এবং 'সীতারাম' উপন্যাসে এই বিফলতা একেবারেই আড়ালে পড়ে গেছে। এই ত্রয়ী উপন্যাস শুধু বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস—সাহিত্য নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেই চিরকালের সম্পদ। বিশেষ করে প্রথম দুটি উপন্যাস। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে ঐতিহাসিক চরিত্র মীরকাশিম এবং ইংরেজবণিকের দ্বন্দ্বের পটভূমিকায় কাহিনী উপস্থাপিত হয়েছে। উপন্যাসের প্রধান অবলম্বন কিন্তু চন্দ্রশেখর, প্রতাপ এবং শৈবলিনীর মত অনৈতিহাসিক সাধারণ মানুষের জীবনবৃত্তান্ত। শৈবলিনীর প্রাক্-বিবাহপর্বের ভালবাসা তার বিবাহিত জীবনের উপর কীভাবে দীর্ঘ ছায়া ফেলে তাকে প্রতিদিনের স্বাভাবিক জীবন থেকে ভ্রষ্ট করেছে, চন্দ্রশেখরের (মা এবং প্রতাপের আত্মবিসর্জন কীভাবে তাকে দৃশ্যত আগের জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে এল— এই উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র সেই কথাই বলেছেন। তাঁর নীতিশাসিত মন বাইরের দিক দিয়ে যে কথাই বলুক না কেন, তিনি যে শিল্পীও, শৈবলিনীর যন্ত্রণা এবং প্রতাপের আত্মত্যাগে সে কথাও প্রতিষ্ঠা পায়।

'রাজসিংহ'-কে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর একমাত্র যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে অভিহিত করেছেন। এ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র 'রাজসিংহ' ইতিহাস থেকেই গৃহীত। ঘটনাও ঐতিহাসিক। চঞ্চলকুমারীকে কেন্দ্র করে রাজসিংহ এবং ঔরঙ্গজেবের বিরোধই এই উপন্যাসের কাহিনীর অবলম্বন। জেবউন্নিসা-মবারক এবং দরিয়াবিবির কাহিনী ইতিহাস থেকে গৃহীত না হলেও ইতিহাসের পটভূমিকা বা পরিবেশের সঙ্গে খুবই সঙ্গতিপূর্ণ হয়েছে। এ কথা নির্মলকুমারী-ঔরঙ্গজেবের অনৈতিহাসিক অন্তরঙ্গ মুহূর্ত সম্পর্কেও প্রযোজ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বশেষ উপন্যাস 'সীতারাম'-এতেও ইতিহাসের সামান্য প্রসঙ্গ এসেছে। তবে জোর পড়েছে বেশি লোকশ্রুতি বা কিংবদন্তীর ওপরেই। প্রবৃত্তিধর্ম একজন শক্তি(, চরিত্র ও সম্ভাবনাময় পু(ষের কতটা (তিসাধন করতে পারে, সীতারাম রায়ের জীবনকাহিনী সে কথাই উপস্থাপিত করেছে। শিল্পের থেকে এখানে প্রাধান্য পেয়েছে—প্রচারধর্ম।

2. সামাজিক উপন্যাস, বড় গল্প ইতিহাস ও রোমান্স নির্ভর উপন্যাসের মত সামাজিক, পারিবারিক উপন্যাসেও বঙ্কিমচন্দ্রের সিদ্ধি অবিসংবাদিত। এগুলির মধ্যে 'ইন্দিরা' এবং 'রাধারাণী' বড় গল্প (Novelette)। 'ইন্দিরা'-র গল্প বা গল্প বলার ভঙ্গিটি নতুন। 'রাধারাণী' প্রেমের গল্প কিন্তু শিল্পসিদ্ধির বিচারে তেমন উঁচু মাপের কিছু নয়। দুটি গল্পের নায়িকাই নানান প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে প্রেমের সার্থকতায় পৌঁছেছে। একসময় এই গল্প দুটি পাঠকসমাজে খুবই সমাদর লাভ করেছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালির সামাজিক তথা পারিবারিক জীবনের বাস্তব ছবি রয়েছে 'বিষবৃ(', 'রজনী' এবং 'কৃষ(কান্তের উইল' উপন্যাসে। বঙ্কিম প্রতিভার অসামান্যতা কোথায়, সে পরিচয়ও এখানে উপস্থাপিত। এ উপন্যাস ত্রয়ীতে রয়েছে বাঙালি উচ্চ-মধ্যবিত্ত জীবনের কিছু পারিবারিক সমস্যার তির্যক রূপায়ণ। 'বিষবৃ(' এবং 'কৃষ(কান্তের উইল'—এই উপন্যাস দুটি বক্তব্য বিষয়ের প্রে(িতে কিছুটা এক। প্রথম উপন্যাসে

নগেন্দ্রনাথ এবং সূর্যমুখীর যে দাম্পত্যজীবন, সেখানে অশান্তি বা অতৃপ্তির কোনো অবকাশ ছিল না। তা সত্ত্বেও কুন্দনন্দিনীর প্রতি আকাঙ(া অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে—যার ফল কুন্দের সঙ্গে বিবাহ, সূর্যমুখীর গৃহত্যাগ এবং কুন্দনন্দিনীর মর্মান্তিক জীবনপরিণতি। নগেন্দ্রনাথ সূর্যমুখীর আবার মিলন হয়েছে(কিন্তু মাঝখানে থেকে গিয়েছে এক অকালে ঝরে যাওয়া বালিকার দীর্ঘ ছায়া।

'কৃষ(কান্তের উইল'-এও দেখি গোবিন্দলাল ভ্রমরের তৃপ্ত দাম্পত্য জীবনবৃত্তের মধ্যে বিধবা রোহিণীর অতৃপ্ত জীবন আকাঙ(ার গাঢ় ছাড়া কীভাবে তিনজনকেই শেষ পর্যন্ত ধ্বংস করেছে। গোবিন্দলাল রোহিণীর রূপ-যৌবনের প্রতি তীব্র আকাঙ(াতেই ত্যাগ করেছেন প্রণয়িনী-পত্নী ভ্রমরকে। রূপতৃষ(া নিবৃত্ত হবার পর রোহিণীর কাছ থেকে অতিরিক্ত(আর কিছু পাবার ছিল না। তার ক(ণ পরিণামে সেই কথাই আভাসিত। তবে বঙ্কিম যে একধরনের নৈতিক শুচিবাগীশের দৃষ্টিতেই এই পরিণতির দিকে তাঁর লেখনীকে প্ররোচিত করেছেন—একথাও শরৎচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে আধুনিকতমকালের অনেকেই সত্য বলে বি(্বাস করেন। 'বিষবৃ('-এর কুন্দনন্দিনী বা 'কৃষ(কান্তের উইল'-এর রোহিণী কারোর মৃত্যুই উপন্যাসের প(ে অনিবার্য ছিল না। সবটাই যেন আকস্মিকতাত্র(ান্ত। এমনকী গোবিন্দলালের সন্ন্যাস গ্রহণও। কিন্তু এইসব ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও 'কৃষ(কান্তের উইল' যে বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

শিল্পসিদ্ধির দিক দিয়ে দেখলে 'রজনী'ও অত্যন্ত সফল উপন্যাস। একদিকে শচীন-রজনী, অন্যদিকে লবঙ্গ লতা এবং অমরনাথ উভয়ে(ত্রেই প্রেমের বিচিত্ররূপ বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা আত্মপ্রকাশ করেছে। এর কাহিনী অংশে লিটন-এর 'দি লাস্ট ডেজ্ অফ পম্পেয়াই'-এর ছায়াপাত ঘটলেও 'রজনী'র গঠন, লিখনশৈলীর নতুনত্ব এবং অমরনাথ-লবঙ্গলতার চরিত্রসৃষ্টি—এই উপন্যাসকে দিয়েছে এক অসাধারণ স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা। সেই স্বাতন্ত্র্য অবশ্যই ইতিবাচক।

3. তত্ত্ব ও দেশপ্রেমমূলক উপন্যাস 'আনন্দমঠ' এবং 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাস দুটি এই বিভাজনের মধ্যে পড়ে। দুটি উপন্যাসই ঊনবিংশ শতাব্দীর আটের দশকে রচিত এবং প্রকাশিত। এই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুর ধর্ম, সমাজ ইত্যাদি সম্পর্কে বিশেষভাবে অভিনিবিষ্ট ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সংঘটিত উত্তরবঙ্গের সন্ন্যাসীবিদ্রোহকে এই উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। দেশাত্মবোধ জাগরণের (ে ত্রে এই উপন্যাস অসামান্য ভূমিকা পালন করেছে। 'বন্দেমাতরম্' গান এই গ্রন্থেই সংযোজিত হয়েছিল। তবে গল্পের বুনন ত্রুটিপূর্ণ। চরিত্রচিত্রণের (ে ত্রেও সে কথা প্রযোজ্য। কিন্তু সব ত্রুটিকেই আড়াল করেছে এই উপন্যাসের দেশাত্মবোধ—যা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের আকাঙ(া ও আবেগকে দীর্ঘকাল প্রাণিত করেছে। 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র জোর দিয়েছেন গীতার নিষ্কাম ধর্মসাধনার ওপর। প্রফুল্লর মত একটি অতি সাধারণ স্বামীপরিত্যক্তা(া গৃহবধূ কেমনভাবে দস্যুদলনেত্রী দেবী চৌধুরাণীতে পরিণত হ'ল—এ উপন্যাসের বিষয়বস্তু তাই। এ কাহিনীতে সে সময়ের বাস্তব ছবিও গাঢ়ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। সেই সঙ্গে রয়েছে গল্পরসের আবেদন। তবে এ কথাও সমানভাবে সত্যি যে, প্রফুল্ল শেষ পর্যন্ত মানবী থাকেনি, পরিণত হয়েছে অবতারে। "বঙ্কিমচন্দ্রের মূল্যচেতনায় ঈ(্বরানুকূল আত্মসংযমই মানুষের পরমধর্ম, 'দেবী চৌধুরাণী'-তে তার পরিচয় প্রফুল্ল জীবনের পরিণামে" (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস -কথা—ড. ভূদেব চৌধুরী)। মোট কথা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে রয়েছে এক বিপুল পরিসর ও বৈচিত্র্য সমন্বিত জীবন। ঘটনার বুনন এবং চরিত্রসৃষ্টি দুয়েতেই তিনি সিদ্ধকাম। রোমান্টিক, ঐতিহাসিক, পারিবারিক

সমস্যামূলক—প্রায় সমস্ত বিষয়ই এসেছে তাঁর উপন্যাসরচনার পরিধিতে। এই বিশালতা রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রের মত স্রষ্টার ￼(েত্রেও অনারব্ধ ছিল। প্রচলিত সমাজনৈতিকতাকে মান্যতা দেওয়ায় তাঁর উপন্যাস নিয়ে কিছু বিতর্ক থেকেই গেছে। কিন্তু এ কথাও বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখবার মত, যে নাগরিক বা মফঃস্বল সমাজের মধ্যে থেকে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস রচনা করেছিলেন তার উচ্চবিত্ত জীবনের নৈতিক মান খুব সমুন্নত কিছু ছিল না। বহু না হোক একাধিক বিবাহ, বাল্যবিবাহ, বৈধব্যজীবনের বিচিত্রগ্লানি, কৌলীন্যপ্রথা সে সমাজের নিত্যচিত্র। কলকাতার বাবু-সংস্কৃতির নাগরালি তো আছেই এইরকম এক সামাজিক পরিপ্রে(িতে শুধু ঔপন্যাসিকই নয়, বাংলার নবজাগরণেরও উল্লেখ্য অগ্রণী নায়ক হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র এক আদর্শ জীবনের প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন। সেই আদর্শের সঙ্গে মিশেছিল রোমান্টিকতার ধারণা। এ ব্যাপারে সমকালীন ফরাসি উপন্যাস নয়, ইংরেজি উপন্যাস, বিশেষ করে স্কট এবং ডিকেন্সই তাঁকে প্রাণিত করেছে সমধিক। যাই হোক, কিছু আদর্শগত এবং কালোচিত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেই যে বাংলা উপন্যাসের সীমানা এবং সম্ভাবনা বহুদূর প্রসারিত হয়ে গেছে এতে সন্দেহ নেই।

14.3.2 রমেশচন্দ্র দত্ত (1848-1909)

রমেশচন্দ্র দত্ত বঙ্কিমচন্দ্র প্রভাবিত ঔপন্যাসিকদেরই একজন। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের সদস্য এই কৃতী বঙ্গ সন্তান নানা বিদ্যায় বিদ্বান হলেও বাংলা রচনায় আত্মনিয়োগ করেন প্রধানত বঙ্কিমচন্দ্রেরই প্রেরণায়। তাঁর উপন্যাস রচনার (েত্রেও সে কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

রমেশচন্দ্রের উপন্যাসের সংখ্যা মোট ছয়। 'বঙ্গবিজেতা' (1874), 'মাধবীকঙ্কণ' (1877), 'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত' (1878) এবং 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা'—কমবেশি ইতিহাস বা ঐতিহাসিক পটভূমিকা-নির্ভর। শেষের দুটি তো বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাস। সমকালীন বাঙালি জীবন নিয়ে দুটি কাহিনীও রচনা করেছিলেন তিনি। গ্রন্থ দুটির নাম—'সংসার' (1886) এবং 'সমাজ' (1894)। প্রথম চারটি উপন্যাসে মুঘলযুগের একশো বছরের ইতিহাস পটভূমিকা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে বলে এদের একত্রে শতবর্ষ বলা হয়।

'বঙ্গবিজেতা'-র কাহিনী আকবরের সময়কার বঙ্গদেশের ইতিহাসের পটভূমিকায় রচিত। প্রধান ভূমিকা টোডরমল্লের। রমেশচন্দ্র তাঁর সাধ্যমত ইতিহাসকে এখানে অনুসরণের চেষ্টা করেছেন। এর সঙ্গে রয়েছে অনৈতিহাসিক চরিত্র অবলম্বন করে রোমান্টিক প্রেম-প্রণয়ের অবকাশ। যদিও ইতিহাসের ভারই এখানে বেশি।

'মাধবীকঙ্কণ'-এ রমেশচন্দ্র কিছুটা ভিন্ন পথের পথিক। এ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র এবং জীবন অনৈতিহাসিক। নরেন্দ্র, হেমলতা এবং প্রতিনায়ক শ্রীশচন্দ্রের ত্রিভুজ প্রণয়ের বিচিত্র আবর্তই এ উপন্যাসের অবলম্বন। মুঘলসম্রাট শাজাহানের শেষ জীবনে তাঁর সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে যে বিচিত্র রাজনৈতিক ঝঞ্ঝা, আবর্তের সৃষ্টি হয়, নায়ক নরেন্দ্র ঘর ছেড়ে বার হয়ে সেই আবর্তেই জড়িয়ে যায়। সমকালীন ইতিহাস তার জীবনের বেদনাদায়ক পরিণামের সঙ্গে যেন অদ্ভুতভাবে মিশে গেছে। কিন্তু এও বিশেষ করে দেখবার যে 'বঙ্গবিজেতা' এবং 'মাধবীকঙ্কণ'—দুটি উপন্যাসের একটিতেও রমেশচন্দ্র ইতিহাস, জীবন এবং সৃজনী কল্পনাশক্তি(কে ঠিকভাবে সমন্বিত করতে পারেননি, যেমনটা বঙ্কিমচন্দ্র অসামান্যভাবে পেরেছিলেন 'রাজসিংহ' উপন্যাসে।

'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত'-এর মূল কাহিনী ইতিহাস থেকেই নেওয়া। কল্পিতকাহিনী এখানে ইতিহাসের বিশুদ্ধতাকে প্রভাবিত করতে পারেনি। তবে ইতিহাসের ঘটনাধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ একটি কাল্পনিক চরিত্রকে অবলম্বন করে যেভাবে প্রেম-প্রণয়ের জটিলতার অবকাশ সৃষ্টি করা হয়েছে তাতে জীবন এবং ইতিহাস খুব কাছাকাছি এসে গিয়েছে বলে মনে হয়। 'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত' শিবাজীর জীবনের বিচিত্র ঘটনা এবং সেই সঙ্গে মধ্যযুগের পরিমণ্ডলে জাতীয় ভাব উদ্দীপনে এক অত্যন্ত নিষ্ঠাশীল প্রয়াস। ইতিহাসের নিজস্ব তথ্য বা সত্যধর্মিতার পাশে মানুষ শিবাজীর প্রসঙ্গও এসেছে। কিন্তু রমেশচন্দ্র সেই মানুষের ছবি তেমনভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেননি। এসেছে শিবাজীর অন্তরঙ্গ পরিকর রঘুনাথ এবং তার প্রণয়িনী সরযূর রোমান্টিক জীবনকথাও। কিন্তু ইতিহাসকে বলার তাগিদে সে প্রসঙ্গও তেমনভাবে বিকশিত হতে পারেনি।

অতঃপর 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা'। এখানে বর্ণিত হয়েছে রাজপুত-শক্তি(র অবসানের কথা। এখানে লেখকের সব ঝোঁকটুকু ইতিহাসের ওপরেই। প্রতিদিনের চেনা মানবজীবনের কথা তেমন নেই। আছে ইতিহাসের বীর চরিত্রদের প্রসঙ্গই। সেই সঙ্গে তেজসিংহ-পুষ্পকুমারীর রোমান্টিক প্রণয়কথা। তেজসিংহ কিন্তু কাল্পনিক চরিত্র নয়। সেও ইতিহাসের অংশ। তবুও একথা স্বীকার করতে বাধা নেই যে, তার ব্যক্তি(জীবন তেমন স্পষ্ট হয়নি।

ইতিহাসকে তার বিচিত্ররূপ বা ঘটনাতেই ধরবার আন্তরিক চেষ্টা করেছেন রমেশচন্দ্র। পাঠক-পাঠিকার জ্ঞানের সীমানাও তার ফলে যে প্রসারিত হয়েছে এতেও সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি অসম্পূর্ণ, অসফল থেকে গেছেন মানবজীবন রহস্যের উদ্‌ঘাটনে, ইতিহাসের শরীরে জীবনের স্পন্দন সঞ্চারে। সং(পে, ইতিহাস এবং জীবনকে তিনি একরেখায় মিলিয়ে দিতে পারেননি। রমেশচন্দ্র এব্যাপারে যথেষ্ট সতর্ক ছিলেন না। আর সেইজন্যই তাঁর উপন্যাসের শিল্পকলাও হয়েছে দুর্বল।

রমেশচন্দ্রের দুটি রচনা 'সমাজ' ও 'সংসার' সামাজিক উপন্যাস নামে পরিচিত। প্রকৃতপ(, এ হ'ল সমাজচিত্র। সেকালের সামাজিক তথা পারিবারিক জীবনের পরিচয় এই আখ্যান দুটিতে রয়েছে। 'সংসার'-এ প্রাধান্য পেয়েছে সেকালের কৃষক জীবন। তাদের আবেদন ছবি হিসেবেই। জীবন ও ব্যক্তি(চরিত্রের সজীবতার জন্য নয়।

'সমাজ'-এ পটভূমিকা হিসেবে গ্রাম এবং শহর দুই-ই রয়েছে। এ হ'ল অপে(াকৃত শি(ত মধ্যবিত্তের জীবনকথা। বিধবাবিবাহকে দ্বিধাহীন অন্তরে সমর্থন করেছেন রমেশচন্দ্র। কিন্তু একথাও বিশেষভাবে বলবার যে, চরিত্রগুলি তেমন জীবন্ত হয়ে উঠতে পারেনি। যাই হোক, আলোচ্য আখ্যান দুটিতে উপন্যাসের শিল্পরূপ বিশেষ সিদ্ধি অর্জন না করলেও গ্রামবাংলার জীবনকে রমেশচন্দ্র যেভাবে এখানে ফুটিয়ে তুলেছেন তাতেও বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে তাঁর স্থান সুনির্দিষ্ট হয়ে থাকবে।

14.3.3 তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (1843-1891)

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার অসাধারণ শিল্পসিদ্ধি সত্ত্বেও বাঙালি পাঠকের একটা ব্যাপারে অতৃপ্তি রয়ে গিয়েছিল। তাঁর রচনায় আমাদের প্রতিদিনকার জীবন সাধারণভাবে প্রতিফলিত হয়নি। সেই আকাঙ(ার কিছুটা পূরণ হয়েছিল তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসে।

'স্বর্ণলতা' (1874) এই পরিপ্রে(তেই বিশিষ্ট। 1279 বাংলা সনে 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রিকায় রচনাটি প্রথম ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণে লেখক তারকনাথের নাম ছিল না, ছিল শুধু এইটুকু উল্লেখ—

'শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত'। তিনভাবে এর আকর্ষণ-সূত্র শিথিল গ্রন্থনে পরস্পরযুক্ত(হয়েছে। যেমন, পারিবারিক জীবনে ভাইয়ে ভাইয়ে বিরোধ এবং স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের বিপরীতমুখী প্রকাশ। দ্বিতীয়ত, পথিকজীবনের নানান আকস্মিকতা এবং উদ্ভট অভিজ্ঞতা। তৃতীয়ত, অনুকূল দৈব-সংঘটনের সাহায্যে পাপের শাস্তি এবং ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। এই দিক দিয়ে দেখলে একদিকে বাস্তব, অন্যদিকে নীতিবোধ ও রোমান্স—দুয়েরই মিশ্রণ ঘটেছে এই উপন্যাসে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি তারকনাথের বিরূপতা ছিল, এবং সে বিরূপতা তিনি গোপন করতে পারেননি। অথচ রোমান্স-সুলভ আকস্মিক যোগাযোগ বা নানারকম অপ্রত্যাশিত ঘটনার সমাবেশের যে অভিযোগ তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের বি(দ্ধে তুলেছিলেন, তাঁর নিজের রচনাতে প্রয়োজনমত তা অনায়াসেই স্থান করে নিয়েছে। গোপাল এবং স্বর্ণলতার যে পরিচয়, তা নিতান্তই আকস্মিক। এরপর তাদের অনুরাগ, শশাঙ্কের স্বর্ণলতাকে একরকম জোর করে বিয়ে দেবার চেষ্টা এবং তার ঘরে হঠাৎ আগুন লোগ যাওয়ায় তার নিষ্কৃতি, শশিভূষণের অবস্থা বিপর্যয়—সবই কার্যত রোমান্সের ল(ণাত্র(ান্ত। সবচেয়ে বড় কথা, উপন্যাসের নামকরণ স্বর্ণলতার নামে, অথচ কাহিনী বা ঘটনাপ্রবাহে তার ভূমিকা নামমাত্র। উপন্যাসে সরলারই প্রাধান্য, কাহিনীর নাট্যরূপ 'সরলা'য় তারই প্রতিফলন ঘটেছে।

সে যাই হোক, যে বৈশিষ্ট্যের জন্য এ উপন্যাস দীর্ঘকাল পরেও ঐতিহাসিক মর্যাদায় সম্মানিত হয়েছে, তা হ'ল প্রতিদিনকার জীবনের উপস্থাপন। বঙ্কিমসাহিত্যে পাঠক ল(্য করেছিল শিল্পের ঐ(র্য, আর 'স্বর্ণলতা'য় চেনা জীবনের ছবি।

সত্যর(ার খাতিরে একথাও বলতে হবে যে, জনপ্রিয়তা পেলেও তারকনাথের উপন্যাস শিল্পগুণের বিচারে সার্থক নয়, তা প্রতিদিনের পাঁচালি মাত্র। চরিত্রগুলি একরঙা, টাইপ ধরনের। একই চরিত্রের মধ্যে বিচিত্রের বর্ণালী এ(ত্রে অনুপস্থিত। এগুলি হয় শুধু ভাল অথবা কেবল মন্দ। সবশেষে রয়েছে পুণ্যের জয়, পাপের পরাজয়। যা নেই তা হ'ল—জীবন সম্বন্ধে গভীর বোধের অভাব। ফলে, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের পাশে তাঁর রচনা অত্যন্ত ম্লান বলেই মনে হবে। 'স্বর্ণলতা'র নীলকমল চরিত্রটিই একমাত্র তারকনাথের চরিত্রসৃষ্টি (মতার উজ্জ্বল নিদর্শন।

14.3.4 যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু (1854-1905)

বঙ্কিমযুগের আরও একজন উল্লেখযোগ্য ঔপন্যাসিক হলেন 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার সম্পাদক যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু। প্রধানত সমাজসংস্কারকের মন নিয়েই তিনি ব্যঙ্গরচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। এই মনেরই প্রতিফলন রয়েছে তাঁর 'মডেল ভগিনী' 'চিনিবাস চরিতামৃত', 'কালাচাঁদ', 'শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী' নামাঙ্কিত রচনাগুলিতে। মতামতের দিক দিয়ে যোগেন্দ্রচন্দ্র পুরোপুরি র(ণশীল এবং অবশ্যই অনুদার, পরমতঅসহিষু(। শি(ত নারীসমাজকে তিনি একেবারেই সহ্য করতে পারেননি। অশোভনভাবে আত্র(মণ করেছেন ব্রাহ্মসমাজ, ব্রাহ্মপরিবার এবং ব্রাহ্মমেয়েদের। 'মডেল ভগিনী' বা 'শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মীর মত উপন্যাসে কাহিনী এবং চরিত্র আছে বটে, কিন্তু ব্যঙ্গবিদ্রূপের তীব্রতায় উপন্যাসের ল(ণ বহু(ত্রেই নষ্ট হয়েছে। "শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী"র আয়তন বিপুল। পাঠক-পাঠিকার প(এই বিপুলায়তন উপন্যাসে মনোযোগ র(া করা প্রকৃতই কঠিন।

14.3.5 ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে ত্রৈলোক্যনাথের আবির্ভাব নানাদিক দিয়েই এক গু(ত্বপূর্ণ ঘটনা। সাহিত্যে তিনি যে গোত্রীয় রসের সৃষ্টি করেছেন, তাঁর আগে বা পরে তা ঠিক অনুসৃত হয়নি। ব্যঙ্গের সঙ্গে অদ্ভুত রসের জোগান মিলে গিয়ে

যে উদ্ভটরসের সৃষ্টি হয়েছে বাঙলা সাহিত্যে, তার সমজাতীয় রচনার নিদর্শন কিছু নেই। আংশিকভাবে এর কিছু পরিচয় বাঙালি পাঠক পেয়েছেন পরবর্তীকালের পরশুরাম এবং সুকুমার রায়ের রচনায়।

উপন্যাসের আকারে রচিত তাঁর গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, 'কঙ্কাবতী', 'সেকালের কথা', 'ফোকলা দিগম্বর', 'ময়না কোথায়' এবং 'পাপের পরিণাম'। এই উপন্যাসগুলি ঘটনাধর্মী অর্থাৎ রোমান্স নির্ভর এবং উদ্দেশ্যমূলক। উপন্যাস হিসেবে এগুলি খুব সার্থকও কিছু নয়। একমাত্র ব্যতিত্র(ম 'ফোক্‌লা দিগম্বর', যেহেতু এটি প্রণয়মূলক। 'ময়না কোথায়' এবং 'পাপের পরিণাম' উপন্যাস দুটিতে লেখকের উদ্দেশ্যমূলকতা এবং তীব্র নীতিবোধ এর শিল্পগুণ নষ্টের কারণ হয়েছে। তবে একথাও বিশেষভাবে বলবার যে, বঙ্কিমযুগের লেখক হয়েও তাঁর রচনায় সেই অর্থে বঙ্কিমের কোনো প্রভাব নেই। বরং তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসের কিছু প্রভাব দেখবার মত।

'কঙ্কাবতী' আমাদের সাহিত্যে এক অভিনব সৃষ্টি। এখানে রূপকথার সঙ্গে মিশ্রণ ঘটেছে উপন্যাসের, আর তা উপস্থাপিত হয়েছে ব্যঙ্গরচনার মাধ্যমে। পনেরোটি পরিচ্ছেদযুক্ত(প্রথমভাগ এবং 'পরিশেষ' নামের শেষ পরিচ্ছেদটি নিয়ে মূল কঙ্কাবতীকাহিনীর বিস্তার। উনিশ পরিচ্ছেদ বিভক্ত(দ্বিতীয়ভাগটিতে সকলের উপযোগী রূপকথার কাহিনী অসাধারণ ব্যঙ্গরচনার মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। উপন্যাস হিসেবে এ বই দুর্বল। কিন্তু দ্বিতীয়ভাগে যে অলৌকিক স্বপ্নজগতের সৃষ্টি করা হয়েছে তার আকর্ষণও অপ্রতিরোধ্য। অনেক সমালোচকই মনে করেন যে, স্নিগ্ধ হাস্যরস সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এখানেই বাঙলা শিশুসাহিত্যের সূচনা হয়েছিল।

14.3.6 স্বর্ণকুমারী দেবী (1855-1932)

রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবী ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ মহিলা ঔপন্যাসিক। বিংশ শতাব্দীতেও তাঁর মত নারীপ্রতিভার পরিচয় বিরল। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক, গান প্রায় সমস্ত বিষয়ে তিনি প্রতিভার স্বা(র রেখেছেন। তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে 'দীপনির্বাণ' (1876), 'মালতী' (1860), 'কাহাকে (1898) এবং 'স্নেহলতা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এর বিষয়বস্তু, রচনারীতি এবং শিল্পকৌশল বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। এর মধ্যে 'স্নেহলতা' উপন্যাসটিতে তাঁর সমাজচিন্তারও পরিচয় রয়েছে। নারী হলেও লিখনরীতিতে স্বর্ণকুমারী পু(ষালি ছাঁদ অনুসরণ করেছিলেন। সাহিত্যের বিশিষ্ট ঐতিহাসিক অধ্যাপক ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, 'ঠাকুরবাড়ীর অধিকাংশ গদ্যরচনায়, বিশেষতঃ আখ্যান-আখ্যায়িকায় ঠিক যেন প্রতিদিনের বাংলার ছবিটি ফুটিতে পারে নাই। ইঁহারা একটি বিশেষ নীতি ও ধর্মের পরিমণ্ডলে লালিত হইয়াছিলেন বলিয়া অতিশয় (মতা সত্ত্বেও ইঁহাদের ভাষাভঙ্গিমা, বর্ণিত বিষয়(চরিত্র প্রভৃতিতে কিছু কৃত্রিমতা, কিছু দূরাগত অস্পষ্টতার ছায়া পড়িয়াছে। কিন্তু স্বর্ণকুমারী, সাধারণ নরনারী, বিশেষতঃ শহরের নারীসমাজ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবহিত ছিলেন। তাই তাঁহার উপন্যাস খুব মহৎ শিল্প না হইলেও সহজ সরল বর্ণনা ও চরিত্রচিত্রণের দিক হইতে সুখপাঠ্য হইয়াছে।' (আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সং(প্ত ইতিবৃত্ত)

সাধারণভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর উপন্যাসগুলি আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, ইতিহাস, রোমান্স, ইতিহাস আশ্রয়ী রোমান্স, পারিবারিক বা সমাজসমস্যামূলক গল্পকথা এবং ব্যঙ্গাত্মক গল্পকাহিনী উপন্যাসের পুষ্টিসাধনে বিশেষ সাহায্য করেছিল। বাঙালি বৃহৎ পৃথিবীর সন্ধান পেয়েছে এই সময়েই। সময়সীমাও বেড়ে গেছে অনেক

দূর। উপন্যাসের বিষয় হিসেবে চলে এল ইতিহাস, কখনও বা অকৃত্রিম দেশপ্রেমের উত্তেজনা। এর পাশে ীণস্রোতা নদীর মত বয়ে চলল আমাদের প্রতিদিনের জীবনকথা। শেষ পর্যন্ত এই জীবনকথাই চলে এল সবকিছুর কেন্দ্রে। কি রোমান্স, কি ব্যঙ্গাত্মক কাহিনী—সর্বত্রই তার অবারিত বিস্তার। বিংশ শতাব্দীর যাত্রাই শু(হ'ল এই চেনা জীবনকথা নিয়ে। প্রস্তুতিপর্বের স্মারক হয়ে রইল এই সমস্ত রচনা।

14.4 সারাংশ

বাংলা গদ্যের প্রস্তুতিপর্বের অন্যতম একজন স্থপতি হলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রঙ্গ-ব্যঙ্গ-নক্শা রচনার পথিকৃৎ হিসেবেও তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি এই পরিপ্রে(তেই উল্লেখযোগ্য।

বাংলা উপন্যাসের দূরাগত পদধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। সংস্কৃত ঐতিহ্য এবং বিশেষ করে ইংরেজি সাহিত্যের আদর্শ দুই-ই বাঙালির সামনে ছিল। সেইসঙ্গে ছিল ইংরেজ শাসনাধীন ভারতবর্ষে গড়ে-ওঠা এক নতুন পরিস্থিতি। নতুনতর জীবনজিজ্ঞাসা, জীবনবী(া। এরই ঠিক পূর্ববর্তী স্তরে ছিল ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-নক্শা। সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা সমস্ত ব্যাপারটিকে ত্বরান্বিত এবং ব্যাপক করেছে।

নক্শা হিসেবে এই পর্বের উল্লেখযোগ্য রচনা হল 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'। কলকাতার নাগরিক জীবনের ছবি তীব্র ব্যঙ্গের সঙ্গে তুলে ধরেছিলেন 'হুতোম' তথা কালীপ্রসন্ন সিংহ।

প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাস 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'-র অনেক আগেই বার হয়েছে। কথ্যচলিত ভাষায় সেকালের সমাজজীবনের চমৎকার ছবি এঁকেছিলেন তিনি। এরও আগে প্রকাশিত হয়েছে হানা ক্যাথারিন ম্যূলেন্স-এর 'ফুলমণি ও ক(ণার বিবরণ'। এটি আসলে খ্রিস্টধর্মেরই মহিমা প্রচারের জন্য রচিত।

ঐতিহাসিক রোমান্স বঙ্কিমচন্দ্রের আগে রচনা করেছেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্রই অবশ্য তার সার্থকতম রূপ দেন। তিনি শুধু ঐতিহাসিক রোমান্স নন, ঐতিহাসিক এবং সামাজিক উপন্যাস রচনাতেও অসামান্য সিদ্ধি অর্জন করেছেন। বাংলা উপন্যাসের যথার্থ জয়যাত্রা তাঁর উপন্যাসগুলিকে কেন্দ্র করেই। রমেশচন্দ্র দত্তও ঐতিহাসিক রোমান্স, ঐতিহাসিক এবং সামাজিক উপন্যাস রচনা করেছিলেন। কিন্তু তা এতটা সিদ্ধি অর্জন করেনি।

বঙ্কিমযুগের অন্যান্য ঔপন্যাসিকদের মধ্যে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু এবং স্বর্ণকুমারী দেবী সীমিত পরিসরে হলেও বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন।

14.5 অনুশীলনী

1. নীচের প্র(গুলির অতিসংি(প্ত উত্তর দিন

   (ক) কোন্ কোন্ রচনার জন্য ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠা? বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এগুলির গু(ত্ব কী জন্য?

   (খ) প্যারীচাঁদ মিত্রের সঙ্গে হুতোমের রচনার সাদৃশ্য কোথায়?

   (গ) ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের দুটি ঐতিহাসিক রোমান্সের পরিচয় দিন।

2. সংি(প্ত উত্তর দিন

(ক) বঙ্কিমচন্দ্রের দুটি সামাজিক উপন্যাসের পরিচয় দিন।

(খ) 'বঙ্গবিজেতা' অথবা 'মাধবীকঙ্কণ'-এর বিষয়বস্তুর সংি(প্ত বিবরণ দিন।

(গ) 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসের গু(ত্ব কোথায়?

3. নীচের প্র(গুলির উত্তর দিন

(ক) নক্শা রচনায় কালীপ্রসন্ন সিংহ তথা হুতোম পেঁচার সাহিত্যিক সাফল্য কোথায় তা আলোচনা ক(ন।

(খ) বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস ও রোমান্স-আশ্রিত উপন্যাসগুলির একটি বিবরণ দিন।

(গ) রমেশচন্দ্র দত্তের দুটি ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনা ক(ন।

14.6 গ্রন্থপঞ্জি

1. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
2. বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা—ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
3. বাংলা উপন্যাসের কালান্তর—সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়।
4. বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (আধুনিক যুগ)—ড. ভূদেব চৌধুরী।
5. আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংি(প্ত ইতিবৃত্ত—ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
6. বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত—ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
7. বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (প্রথম-তৃতীয় খণ্ড)—ড. (ে(ত্র গুপ্ত।
8. বঙ্কিম সরণী—প্রথমনাথ বিশী।
9. উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিম—প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত।
10. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড)—ড. সুকুমার সেন।

একক 15 ❑ রবীন্দ্রনাথ

গঠন

15.0 উদ্দেশ্য
15.1 প্রস্তাবনা
15.2 রবীন্দ্রনাথের কাব্য
15.2.1 সূচনা পর্ব
15.2.2 উন্মেষ পর্ব
15.2.3 ঐশ্বর্য পর্ব
15.2.4 অন্তর্বর্তী পর্ব
15.2.5 গীতাঞ্জলি পর্ব
15.2.6 বলাকা পর্ব
15.2.7 অন্ত্য পর্ব
15.3 নাট্য সাহিত্য
15.4 ছোটগল্প
15.5 উপন্যাস
15.6 প্রবন্ধ-নিবন্ধ
15.7 সারাংশ
15.8 অনুশীলনী
15.9 গ্রন্থপঞ্জি

15.0 উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ার পর আপনি যা জানতে পারবেন তা হল

- রবীন্দ্রনাথের রচিত কাব্য-কবিতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ
- রবীন্দ্রনাথের রচিত নাটকগুলির শ্রেণীবিভাজন এবং বিভাজনগুলির পরিচয়
- ছোটগল্পকার রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব
- ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্টতা
- রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

15.1 প্রস্তাবনা

বাংলা সাহিত্যে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধকে রবীন্দ্রযুগ বলে বিশেষিত করা হয়েছে। একথাও সমানভাবে সত্য যে ঊনবিংশ শতাব্দীর আটের দশক থেকেই তাঁর প্রতিভার বিকাশ বাংলার সারস্বত সমাজ প্রত্যক্ষ করেছে।

কাব্য, নাটক, ছোটগল্প এবং প্রবন্ধ রচনায় এই সময়ে তিনি অসামান্যভাবেই আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠার জন্য আরও কিছুকাল অপে(া করতে হয়েছিল। সেই প্রে(িতে এই যুগ-নামকরণের সার্থকতা। একথা আজ অবিসংবাদিতভাবে প্রতিষ্ঠিত সত্য যে বিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যকে বাংলার গৃহকোণ থেকে মুক্তি(দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাকে নিয়ে গেছেন বি(্বজনের কাছে। ভি(ুকের রূপে নয়, রাজবেশে। প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন বি(্বভাষা হিসেবে। বাঙালির প(ে এ ঋণ অপরিশোধ্য।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য প্রতিভার বিচিত্র দিকের পরিচয় সং(িপ্ত আকারে এখানে বিন্যস্ত হয়েছে।

সেই বিন্যাসের মধ্যে আছে কাব্য-কবিতা, নাটক, ছোটগল্প, উপন্যাস এবং রচনা বা প্রবন্ধের বিচিত্র দিকে তাঁর প্রতিভা কীভাবে বিকশিত হয়েছে, সিদ্ধি অর্জন করেছে, তার বিবরণ।

15.2 রবীন্দ্রনাথের কাব্য

বারো বছর বয়স থেকে আরম্ভ করে চেতনালুপ্ত হবার আগে পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ যে কাব্যরচনা করেছেন তার বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য তুলনাহীন। সমগ্র বি(্ব-সাহিত্যের প্রে(িতেই বলা যায় যে কোনো দেশে একজন কবিমাত্রের মধ্যে সৃষ্টির এই বিপুল ঐ(্বর্য ও লীলা আমরা প্রত্য(করিনি। জার্মান মহাকবি গ্যেটের সঙ্গে তাঁর নিজের বিপুল প্রাণশক্তি(র প্রবর্তনাতে বিভিন্ন ভাবগত স্তর ও প্রকাশভঙ্গির পথরেখা অতিত্র(ম করেই অসামান্য সমৃদ্ধি ও বৈচিত্র্যে কালজয়ী প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে।

15.2.1 সূচনা পর্ব

বিভিন্ন স্তর পরম্পরার ভিত্তিতে কবির কাব্যসাধনাকে কয়েকটি পর্বে ভাগ করে নেওয়া যায়। তাঁর কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত যে সমস্ত কবিতা বা কাব্য তিনি রচনা করেছেন তাকে আমরা রবীন্দ্রকাব্যের শৈশব পর্ব বলে চিহ্নি(ত করতে পারি। এই সময়ের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল 'কবিকাহিনী' (1878), 'বনফুল' (1880), 'ভগ্নহৃদয়' (1881) কাব্য। এ ছাড়া '(দ্রচণ্ড' (1881), 'কালমৃগয়া' (1882), 'বাল্মীকি প্রতিভা' (1881)-র মত গীতিনাট্য ও নাট্যকাব্যও ছিল। 'শৈশব সঙ্গীত' 1884 সালে প্রকাশিত হলেও আগে লেখা অনেক কবিতাই এতে স্থান পেয়েছিল। আবেগ এবং উচ্ছ্বাসই এর সম্বল। তবে কয়েকটি কবিতার মধ্যে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা প্রত্য(করা যায়। মহাকবি নিজেও বলেছেন যে ইতিহাসের ধারাবাহিকতা র(ার জন্যই এর যা কিছু মূল্য। কিন্তু একই সঙ্গে একথাও বিশেষভাবে বলবার যে মধুকবির 'আত্মবিলাপ' থেকে কবিতায় কবির একেবারে নিজের কথা বলবার যে ধারার সূচনা হয়েছিল, বিহারীলালের কবিতায় যা আমরা আরও সুস্পষ্টভাবে প্রত্য(করেছি, ত(ণ রবীন্দ্রনাথের এই পর্বের কাব্যকবিতা সেই ব্যক্তি(চেতনার রসেই বিশেষভাবে জারিত। যদিও সঠিক স্বাতন্ত্র্য তিনি এখনও খুঁজে পাননি। নিজের চারদিকে তিনি তৈরি করে নিয়েছিলেন রোমান্টিক আবেগের এক কুয়াশা ঘেরা পরিমণ্ডল। 1878-এ প্রাচীন বৈষ(ব কবির ঢঙে বৈষ(ব পদাবলির প্রচলিত শিথিল স্তবক বিন্যাসে লিখলেন, 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'। ইংরেজ কিশোর কবি চ্যাটারটনের মত তিনি এদেশের কিছু মানুষকে অবাক করে দিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু কবির নিজত্ব বলতে যা বোঝায় তা এতে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়নি। কিন্তু একথাও বিশেষভাবে স্বীকার করবার যে স্বাতন্ত্র্যের আভাস এতে অবশ্যই আছে। আছে বলেই কবি তাঁর কাব্যসংকলন 'সঞ্চয়িতা' থেকে একে বাদ দেননি।

15.2.2 উন্মেষ পর্ব

আত্মপরিচয়ের প্রথম সুরটি পাওয়া গেল 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' (1882) কাব্যে। এরপর চার বছরের মধ্যে প্রকাশিত তাঁর কাব্যগুলি হল 'প্রভাতসঙ্গীত' (1883), 'ছবি ও গান' (1884), 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' (1884) এবং 'কড়ি ও কোমল' (1886)। এই পর্বই উন্মেষ পর্ব। এখানেই প্রথম প্রকাশ পেল তাঁর যথার্থ নিজত্ব। এ যেন এক নতুন জন্ম। 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' এবং 'প্রভাতসঙ্গীত' কবিজীবনের প্রথম উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। এই কাব্যে বিষণ্ণ কবির অন্তর্বেদনাই প্রবল—কবি প্রকৃতই যেন নিঃসঙ্গ। অথচ এই রোমান্টিক দুঃখবিলাস কবিধর্ম নয়। সেই জগৎ-প্রীতির উচ্ছ্বাসই অতঃপর ধ্বনিত হল 'প্রভাতসঙ্গীত' কাব্যে। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ"-এর মত কবিতা এই প্রে(তেই প্রতীকের ভূমিকা পালন করেছে। 'হৃদয়-অরণ্য' থেকে নি^(ান্ত হয়ে কবি বুকভরা নিঃশ্বাস নিয়েই বলে উঠলেন

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।

'ছবি ও গান'-এও প্রতিদিনের মর্ত্যপ্রীতির অনিঃশেষ স্বা(র, যদিও প্রকাশ-সৌন্দর্যে তা ততটা সমুজ্জ্বল নয়। জগতের মধ্যে তাঁর প্রবেশ তখনও অবারিত নয়। ছবি এখানে অস্পষ্ট। গানও অস্ফুট। 'কড়ি ও কোমল'—এই সেই স্বাতন্ত্র্য উজ্জ্বল হয়েছে। উন্মেষ পর্বের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা এই কাব্যই। শরীরের জন্য আকাঙ(া এ কাব্যে রীতিমত তীব্র, যদিও সেই তীব্রতার মধ্যেই যে স্থায়ী স্বস্তি তথা মুক্তি(—রবীন্দ্রের কবিজীবনে সে কথাও সত্যি নয়। তাঁর বারবার বড় পীড়াদায়ক ভাবেই মনে হয়েছে যে অসীমের লীলাভূমি থেকে তিনি হঠাৎ নেমে এসেছেন সীমাবদ্ধ বস্তুজগতের মধ্যে। সূচনা হল মুক্তি(র আনন্দের। এই পর্বই তাঁর কাব্যজীবনের শ্রেষ্ঠ পর্ব। সমালোচকরা এই পর্বকেই চিহ্নি(ত করেছেন—'ঐশ্বর্য পর্ব' হিসেবে।

15.2.3 ঐশ্বর্য পর্ব

এই পর্বের কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে 'মানসী' (1890), 'সোনার তরী' (1893) এবং 'চিত্রা'য় (1896) রবীন্দ্রের কবিপ্রতিভা অসাধারণ সমুন্নতি লাভ করেছে। এই ছয় বছরের কাব্যের যে ফসল তা নানাদিক দিয়েই অসাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়। যাই হোক, 'কড়ি ও কোমল' কাব্যে সীমার বন্ধন এবং বস্তুসর্বস্বতার মধ্যে কবির যে বেদনা পাঠক প্রত্য(করেছেন সেই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব 'মানসী'-র মধ্যেও বর্তমান। বাসনাকে কবি প্রেমের থেকে পৃথকভাবেই দেখেছেন। কবির বিশ্বাসের জগতে বাসনার উত্তাপ এবং প্রেম সমার্থক বিষয় নয়। 'কড়ি ও কোমল'-এর দেহবোধ থেকে সরে এসে 'মানসী'র কবি লিখলেন, 'আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে, তাই ভালবাসা দিয়ে গড়ে তুলি মানসী প্রতিমা', সেই সঙ্গে অসীমের সীমা রচনার অঙ্গীকারও। 'মানসী'তে এসেছে বিচিত্র প্রসঙ্গ। কখনও কবি বার হয়েছেন মানসজগতের অভিসারে, কখনও বা বহুবিচিত্রের মধ্যে সংহত করার চেষ্টা করেছেন, প্রেমচেতনাকে কখনও বা এসেছে সমকালীন জীবনের না-বাচক দিকের বি(দ্ধে তাঁর তীব্র সমালোচনার মনোভাব। এর সঙ্গে যুক্ত(হয়েছিল ছন্দ নিয়ে পরী(া-নিরী(ার ব্যাপারে কবির নানান খেয়াল।

এই সময় কবি পদ্মার সাহচর্যে লালিত। প্রকৃতির যে অপূর্ব মাধুর্যে তিনি এখানে প্রতিনিয়ত স্নিগ্ধ, উজ্জীবিত হচ্ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া গেল 'সোনার তরী' কাব্যে। প্রকৃতি জড় কিছু নয়, তা মানুষের জীবনধারার সঙ্গে একাত্ম। প্রেমেরও নতুন আইডিয়া এই কাব্যে আরও সমৃদ্ধভাবে প্রকাশ পেল। এ রূপই

আলাদা। মানসসুন্দরী, জীবনদেবতা তত্ত্বের যথার্থ সূত্রপাতও এইখানে। প্রকৃতির সঙ্গে জীবলোকের অচ্ছেদ্য বন্ধনের অনুভবও তিনি প্রকাশ করেছেন। 'ছিন্নপত্র'-এর একটি পত্রে আছে, 'আমার বুদ্ধি এবং কল্পনা এবং ইচ্ছাকে উন্মুখ করে তুলেছিল এই সময়কার প্রবর্তনা—বি(েপ্রকৃতি এবং মানবলোকের মধ্যে নিত্যকাল অভিজ্ঞতার প্রবর্তনা।' জীবনের সমগ্রতা তথা পূর্ণতার উপলব্ধিতে প্রাণিত কবিহৃদয় মানবজীবনের দৃশ্যমান খণ্ড বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে যে বৃহত্তর অখণ্ড প্রাণলীলার বি(োসে পৌঁছেছে, 'সোনার তরী' এবং তারপর প্রকাশিত 'চিত্রা' কাব্যের কবিতায় সেই বি(োস আর অনুভবের উপলব্ধিই সঞ্চিত হয়েছে। জীবন এবং প্রকৃতির অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের কথাও এই বোধ, বি(োস আর অনুভবের অন্তর্গত।

'চিত্রা' রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ সৃষ্টি, আমাদের সাহিত্যে তো বটেই বি(েসাহিত্যের সামগ্রিক মানদণ্ডেও। এতে মানসসুন্দরী ও জীবনদেবতা তত্ত্ব (ল(ণীয় চিত্রা, জীবনদেবতা, অন্তর্যামী, সিন্ধুপারে), প্রেম ও সৌন্দর্যের অবিচ্ছেদ্যতার অনুভব (প্রেমের অভিষেক), অনন্ত সৌন্দর্যের বন্দনা (উর্বশী, বিজয়িনী) প্রভৃতি বিষয়ে মহাকবির পরিণত মন, শান্তস্নিগ্ধ ভাবঘন আবেশ, নিপুণ বাক্‌ভঙ্গি এবং সৌন্দর্যচেতনা দিয়েছে এক অপূর্ব সিদ্ধির মাত্রা। 'চিত্রা' কাব্যের প্রথম কবিতাতেই রয়েছে এই সৌন্দর্যের স্তবগান

'জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী।
অযুত আলোকে ঝলসিছ নীল গগনে,
আকুল পুলকে উলসিচ ফুল কাননে,
দ্যুলোক ভূলোকে বিলসিছ চলচরণে
তুমি চঞ্চলগামিনী।'

ভিতরের দিকে ফিরলে দেখা যাবে এই সৌন্দর্যই আবার—

'অন্তর মাঝে শুধু তুমি একা একাকী
তুমি অন্তরব্যাপিনী।'

এই ভিতর বাহিরের সম্পর্ক পূর্ণ হয়ে উঠল অপূর্ব কাব্যরসে। কবি উপলব্ধি করতে পারলেন, অন্তরাল থেকে কে যেন তাঁর জীবন ও জীবনাতীত অস্তিত্ব ও চেতনাকে আলো-অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে পরিণামের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। ইনিই 'জীবনদেবতা'। একই বছরে প্রকাশিত হয়েছে 'চৈতালি'। রবীন্দ্র কাব্যসাধনার একযুগের ইতিহাস যেন এখানে এসে সমাপ্ত হল। সাহিত্যের সমালোচক ঐতিহাসিক অধ্যাপক ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় চমৎকার মন্তব্য করেছেন এই মর্মে যে, 'পরিপূর্ণ জীবনের আনস্র ঐ(র্য, খণ্ড প্রত্যহকে অখণ্ড অন্তরের সঙ্গে গাঁথিয়া তুলিবার ইচ্ছা এবং প্রাচীন ও পুরাতন ভারতবর্ষে মানস পরিত্র(মা—সর্বোপরি গাঢ়বদ্ধ সনেট রচনায় এই কাব্যখানি এই পর্বের শেষ ফসল। তাই ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে 'চৈতালি'—চৈত্র মাসে সংগৃহীত বৎসরের শেষ ফসল। ইহার পর তাঁহার মন প্রাচীন ভারত, কল্পজগৎ ও বিশাল সৌন্দর্যলোকের মধ্যে আর একপ্রকার মুক্তি(পাইল।' (আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সং(িপ্ত ইতিবৃত্ত)।

15.2.4 অন্তর্বর্তী পর্ব

রোমান্টিকতা, বি(েসত্তার সঙ্গে মিলনের আকুতি, জীবনদেবতার লীলাময়তার অপরূপ অনুভব, প্রেমভাবনার উন্নয়নে স্বাতন্ত্র্যসমৃদ্ধ 'সোনার তরী' 'চিত্রা' পর্বের কাব্য-কবিতা এবং 'নৈবেদ্য', 'খেয়া', 'গীতাঞ্জলি'র

আধ্যাত্মিকতাভাবসমৃদ্ধ কবিতাগুলির মধ্যে 'কথা' (1900), 'কাহিনী' (1900), 'কল্পনা' (1900) এবং '(ণিকা' (1900) কাব্যগুলিকে অন্তর্বর্তী পর্বের রচনা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে 'কথা' ও 'কাহিনী'তে কবির মানসপরিত্র(মা প্রাচীন ভারতবর্ষে। কবি সেখান থেকে সংগ্রহ করেছেন আত্মপ্রতিষ্ঠার তথা নিজের পুরনো গৌরববোধের স্মারক। 'কল্পনা'র একদিকে প্রাচীন ভারতবর্ষের প্রাণস্বরূপকে আবিষ্কারের ঐকান্তিক আগ্রহ, অন্যদিকে আঘাত-সংঘাতের মধ্যে দিয়ে জীবনের অফুরন্ত ঐ(র্যের ঘোষণা প্রত্যয়দৃপ্ত পৌ(ষকে দিল নতুন রূপ। '(ণিকা'র মধ্যে ছন্দ ও বাক্‌বিন্যাসের লঘুচপল ভঙ্গিতে কবি আশ্চর্যভাবে রূপ দিলেন '(ণশা(্বেতী'-র বন্দনা। প্রেম, সৌন্দর্য ও প্রকৃতিতে কবির এ এক অপরূপ মানসমুক্তি(। (ণিকের মধ্যেই অনন্তকে পাবার গূঢ় বাসনা তাঁর। যদিও শেষ পর্যন্ত সব কিছুই যেন তাঁকে সেই পরমের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয় যাঁকে সমস্ত 'গীতাঞ্জলি' পর্ব জুড়েই তিনি খুঁজেছেন।

'নৈবেদ্য' (1902), 'স্মরণ' (1902-3), 'শিশু' (1903), 'উৎসর্গ (1914) সালে কাব্যাকারে প্রকাশিত) এবং 'খেয়া' (1910)-র মত কাব্যও এই পর্বের ফসল। এর মধ্যে 'নৈবেদ্য' কাব্যের অধিকাংশই সনেট এবং স্তবকবন্ধে রচিত কিছু গান। 'কল্পনা'য় কবির সীমানা ছিল প্রাচীন ভারতবর্ষ, 'নৈবেদ্য'-য় তিনি আত্মপ্রকাশ করলেন আধুনিক দেশকালের বিপুল পরিসরে। মহৎ মনুষ্যধর্ম এবং বৃহৎ ভারতবর্ষের মানবতা, বীরত্ব, ত্যাগ ও (মার পবিত্র ((ত্রে পরিত্রাণের ছবি এঁকেছেন কবি। জীবনে এ এক অদ্ভুত ম(ময়তার অবস্থা কবির। স্ত্রী, পুত্র, কন্যা হারিয়ে কবি ব্রহ্মচর্যাশ্রমের বিচিত্র কাজে নিজেকে সমর্পণ করে সব কিছু যেন বিস্মৃত হতে চেয়েছেন। নিজের শিশুসন্তানগুলিকে ভোলানোর জন্য লিখলেন 'শিশু'। শিশুরই রূপকথানির্ভর রোমান্টিক কল্পনাকে এইরকম অসামান্যতায় ফুটিয়ে তুলতে জগতের খুব কম কবিই পেরেছেন।

এই পর্বের শেষ কাব্য হল 'খেয়া'। নামকরণ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। একদিকে ব্যক্তি(গত জীবনে (য়(তির ঝড় অন্যদিকে দেশ জুড়ে বঙ্গভঙ্গের আলোড়ন— সেই সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের আত্মপ্রকাশ। এ পথ তো কবির নয়। তাই তাঁকে বলতেই হয়েছে

বিদায় দেহ (ম আমায় ভাই
কাজের পথে আমি তো আর নাই।

এই প্রে(তেই কবি পেলেন আর এক জগতের সন্ধান। সে জগৎ 'গীতাঞ্জলি'র। রূপ ও অরূপ— এই দুয়ের মধ্যে 'খেয়া'র জগৎ। খেয়া-নৌকা যেমন একপ্রান্ত ছেড়ে আর একপ্রান্ত পাড়ি দেয় কবিও তেমনি প্রেম সৌন্দর্যের তীরভূমি থেকে যাত্রা শু(করেছেন অধ্যাত্মভাবনার জ্যোতির্লোকে।

15.2.5 গীতাঞ্জলি পর্ব

এই পর্বে আধ্যাত্মিক অনুভবের জগতে কবি পেলেন এক অ-পূর্ব মুক্তি(র স্বাদ। শু(হয়েছিল আগেই। 'নৈবেদ্য'-র প্রথম কবিতাতেই ছিল

প্রতিদিন আমি হে জীবনস্বামী
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।
করি জোড়কর হে ভুবনে(্বের
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।

তোমার অপার আকাশের তলে
বিজনে বিরলে হে,
নম্র হৃদয়ে নয়নের জলে
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।

'গীতাঞ্জলি' (1910)-তে এই অনুভব গীতিমাধুর্যে মুখরিত হয়েছে। বৈষ(বীয় পরিভাষায় বিরল বিপ্রলম্ভই এর মূলভাব। সব অহংবোধ দূরে সরিয়ে কবি ঝড়ের রাতে বার হন অভিসারে, সে অভিসার পরাণসখার প্রতি। এ অধ্যাত্মঅনুভব নিছক নীতি বা ধর্মসাধনা— কোনোটাই নয়। অনুভবের বিচিত্র ধারাপথ অতিত্র(ম করেই 'গীতাঞ্জলি'র বৃহত্তম অনুভবের জগতে পৌঁছনো।

'গীতালি' (1915) প্রকৃতপ(তত্ত্ব বা অধ্যাত্মসাধনা কোনোটাই নয়—এ হল গীতিসংগ্রহ। কবির দেবতার সাজ পরম প্রেমিকের। উপলব্ধির গাঢ়তায় 'গীতিমাল্য' (1914) এবং 'গীতালি' আপন স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল। জীবনকে ভালবেসেই কবি বলেছেন—

জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা—
ধূলায় তাদের যত হোক অবহেলা
পূর্ণের পদপরশ তাদের পরে।

শেষ পর্যন্ত তা জীবনেরই গান হয়ে দাঁড়ায়।

15.2.6 বলাকা পর্ব

'বলাকা' (1916), 'পূরবী' (1925) এবং 'মহুয়া'—পঞ্চম পর্বের এই কাব্যগুলিতে কবিমানসের আবার দিক পরিবর্তন ঘটল। প্রৌঢ় ঋজুর ফসল হিসেবে এখানে পেয়েছি বুদ্ধির বিস্ময়কর দীপ্তি এবং জগৎ সম্বন্ধে বিশালতার বোধ। প্রেম, সৌন্দর্যআকাঙ(ার জগৎ থেকে গীতাঞ্জলি-গীতালি-গীতিমাল্য-এর ভক্তি(র জগতে পৌঁছনো। সেখান থেকে কবি যেন হঠাৎই এসে পৌঁছলেন 'বলাকা'র জগতে। সমকালীন ফরাসি দার্শনিক আঁরি বার্গসঁ-র সৃষ্টিশীল গতির ভাবনা কবিকে নতুনভাবে প্রাণিত করে থাকবে। উদ্দাম গতিবেগের স্বীকৃতির সঙ্গে দেখা যায় কাব্যের শেষে কবির আস্তিক্যবাদী মন বিদ্রোহী হয়েছে। পৃথিবীর কিছুই স্থিতিশীল নয়, শেষ পর্যন্ত কিছুই থাকবে না—কবি এই কথা মেনে নিতে পারেননি। গতি ও বিকাশের মধ্যে দিয়ে জীবন পূর্ণতর সত্যের মধ্যে পুনর্জন্ম লাভ করছে, এই বিশ্বাসেই কবি উপসংহার টেনেছেন। ভাষা ও ছন্দের অভিনবত্বও দেখবার। এ ছন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল চরণবিন্যাসের অসমতা।

'বলাকা' ও 'পূরবী'র মধ্যপর্বে প্রকাশিত হয় 'পলাতকা'। কবি এখানে তাঁর জীবনপ্রীতির কথা অপূর্ব সহজ ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন। 'পূরবী'তে সৌন্দর্যবোধ এবং ফেলে আসা যৌবনের স্মৃতিচারণার সঙ্গে আসন্ন বিদায়ের মূর্ছনা গীতিকবিতার রসে জারিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। কবি বিদায়ের প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

'মহুয়া'র ল(করেছি দ্বিতীয় যৌবনের রক্ত(রাগ। এখানে যে প্রেমকে আমরা পাই তা বীরত্বে, মহৎ কর্তব্যবোধে, বৈশ্বিক চেতনা ও গতির আলোয় সমুজ্জ্বল।

15.2.7 অন্ত্যপর্ব

'সন্ধ্যাসঙ্গীত' থেকে 'মহুয়া'—প্রায় পঞ্চাশ বছর (1882-1929) কবির কাব্য-কবিতায় যা প্রকাশ পেয়েছে তাতে একটা জিনিসই বলবার। সেটি হল, আঙ্গিক বিষয়বস্তু কোনোটাতেই পুরনো পদ্ধতি-প্রকরণ ছেড়ে কবি বেশিদূর অগ্রসর হননি। 1931-এ প্রকাশিত 'বনবাণী' সম্পর্কেও সে কথা প্রযোজ্য। তাঁর কবিজীবনের শেষ পর্ব যথার্থ শু(হয়েছে 'পুনশ্চ' (1932) থেকে। 'পুনশ্চ' থেকে 'শ্যামলী' (1936)—এই চার বছরের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে 'বিচিত্রিতা' (1933), 'শেষ সপ্তক' (1935), 'বীথিকা' (1935) এবং 'পত্রপুট' (1936) নামাঙ্কিত আরও চারটি কাব্য। এই কাব্যগুলিকে একত্রে 'পুনশ্চ' পর্বের ও বর্গের কাব্য বলা সঙ্গত। এর আগে 'বলাকা'য় প্রবহমান ছন্দ রচনায় কবি যে সাফল্য অর্জন করেছিলেন এবারও ভাষা ও ছন্দরীতিতে পাঠক প্রত্য(করল আর এক পরিবর্তন। 'পুনশ্চ' থেকেই গদ্যকবিতার সূচনা এবং 'শ্যামলী' পর্যন্ত গদ্যছন্দেই রবীন্দ্রনাথের ভাবপ্রকাশের বাহন। প্রতিদিনের কথাকে কবি এইসব কাব্যে আনতে চেষ্টা করেছিলেন আটপৌরে ভাষায়। সে কাজ অবশ্য লঘুছন্দে তিনি পালন করতে শু(করে দিয়েছিলেন।

'পুনশ্চ' বর্গ বা পর্বের পর লঘুতরল হাস্য-পরিহাস সমন্বিত কয়েকটি কাব্য রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। যেমন 'খাপছাড়া' (1937), 'ছড়া ও ছবি' (1937), 'প্রহসিনী' (1939)। তাঁর জীবনের এ এক দিক। কিন্তু অন্ত্যপর্বের শেষকটি কাব্য যেমন, 'প্রান্তিক' (1938), 'সেঁজুতি' (1938), 'আকাশপ্রদীপ' (1939), 'নবজাতক' (1940), 'রোগশয্যায়' (1940), 'আরোগ্য' (1941), 'জন্মদিনে' (1941) এবং মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 'শেষ লেখা' (1941) এমন কয়েকটি অভিনব বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেছে যে মৃত্যুপথযাত্রী রবীন্দ্রের কবিচেতনার অখণ্ডতা আমাদের প্রকৃতই অভিভূত করে। সমকালীন জীবন এবং ইতিহাসকেও কবি দেখছেন মোহমুক্ত(অন্তরে। অনেকের বিবেচনায় 1938 থেকে 1941 এই তিন বছরেই নাকি কবিপ্রতিভার সর্বোত্তম বিকাশ। সাম্রাজ্যবাদী ফ্যাসিবাদী শক্তি(র বি(দ্ধে তিনি এখন যেমন উচ্চকণ্ঠ, বাস্তব জীবনের মর্যাদার প্রতি দায়বদ্ধ, সেই সঙ্গে আত্মজিজ্ঞাসার তৃষ(াও তাঁর অবিরল। তবে মনে রাখতে হবে, 'নৈবেদ্য' কাব্যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি(র বি(দ্ধে তাঁর ঘৃণা এবং প্রাচীন ভারতবর্ষের ব্রহ্মমন্ত্রে দী(ত জীবনের কল্পনা সমানভাবে স্থান নিয়েছিল। আসলে কোনো পর্বই ঠিক কোনো পর্বের তুলনা নয়। প্রত্যেক পর্বই সময়চেতনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গোচর-অগোচর নিজেকে নির্মাণ করেছে। সেই এক অখণ্ড কবিসত্তাই বর্ণালীর মত নানান আলোয় বারবার নিজেকে বর্ণময় করে তুলেছে। যদিও সাহিত্যের বিশিষ্ট সমালোচক-ঐতিহাসিক ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, "তাঁহার সর্বশেষ কাব্যপর্বকে 'চিত্রা' পর্ব বা 'বলাকা' পর্বের সমতুল্য বলিবার যুক্তি(সঙ্গত কারণ নাই।" (আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সং(প্ত ইতিবৃত্ত)।

15.3 নাট্য সাহিত্য

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে নাটকের বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিক বা শিল্পরূপের গু(তর পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এই সময়ের নাটকে নাট্যকারের ব্যক্তি(গত চিন্তাভাবনা বা ধ্যানধারণা বিশেষভাবে কার্যকরী হয়েছে। ইব্‌সেন এবং বার্‌নারড্ শ'-এর নাটকগুলির কথা এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথ প্রধানত কবি। সেই পরিপ্রে(তে তাঁর নাটকেও এই গীতিধর্মেরই প্রাধান্য থাকবার কথা। এ ছাড়া তাঁর সমস্ত নাটকে তত্ত্বপ্রাধান্যও ল(করবার মত। কাব্যনাট্য, নাট্যকাব্য, প্রচলিত ধারায় রচিত নাটক বা রূপক-সাঙ্কেতিক

নাটক, যার কথাই ধরা যাক না কেন, সব ে(ত্রেই এই তত্ত্ব বা আইডিয়ার ব্যাপারটি একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এড্ওয়ার্ড টমসন (Edward Thompson) যথার্থই বলেছিলেন, 'His dramatic work is the vehicle of ideas rather than the expression of action' (Rabindranath Tagore : Poet and Dramatist)। কথাটি অনুধাবনযোগ্য। তাঁর নাটকে নাট্যকারের ব্যক্তি(গত চিন্তাসূত্র নাট্যকাহিনীর ধারা গতি বা পরিণামকে নিয়ন্ত্রিত করেছে বলে অনেকে মনে করেন। ফলে তাঁর প্রায় সমস্ত নাটক কোনো না কোনো অর্থে তত্ত্বনাটক হয়ে উঠেছে।

'জীবনস্মৃতি'তে কবি নাটকের প্রতি তাঁর ত(ণ বয়স থেকেই জাত অনুরাগের কথা বলেছেন। প্রাথমিকভাবে ঠাকুরবাড়ির পরিমণ্ডল এবং বিশেষ করে মেজদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রেরণা কবি বিশেষভাবে স্মরণ করেছেন। সেই প্রেরণায় যে নাটক তিনি লিখেছেন তা একান্তভাবেই রবীন্দ্রস্বভাবের। গীতিধর্মের সঙ্গে সেখানে অবারিত হয়েছে আইডিয়া বা তত্ত্বের সমন্বয়। কিন্তু সে তো আধুনিকতমতারও অবশ্য ল(ণ। ঘটনার ভার কমে এসে তা তো নাট্যকারের অন্তর্গূঢ় বাণীকেই প্রধান করতে উন্মুখ। ঠিকই যে ইউরোপের সাঙ্কেতিক গোষ্ঠীর নাটক যদি নাটক হয়, ইব্সেন-বার্নারড্ শ'-গল্সওয়ার্দি বা ইউজিন ও নীল-এর নাটক যদি নাটক হয় তবে রবীন্দ্রনাথও অবশ্যই যথার্থ নাট্যকার বলে বিবেচিত হবেন।

রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলিকে মোটামুটি ছ'টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথমত—গীতিনাট্য এর মধ্যে আছে 'বাল্মীকি প্রতিভা' (1881), 'কালমৃগয়া' (1888), 'মায়ার খেলা' (1888)। দ্বিতীয়ত, প্রচলিত রীতির নাটক। যেমন, 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' (1884), 'রাজা ও রাণী' (1889), 'বিসর্জন' (1890), 'মালিনী' (1896), 'প্রায়শ্চিত্ত' (1909), 'গৃহপ্রবেশ' (1925), 'শোধবোধ' (1926), 'তপতী' (1929)। তৃতীয়ত কাব্যনাট্য ও নাট্যকাব্য। যেমন—'সতী' (1892), 'বিদায় অভিশাপ' (1893), 'চিত্রাঙ্গদা' (1897), 'গান্ধারীর আবেদন' (1897), 'লক্ষ্মীর পরী(া' (1897), 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ' (1900)। চতুর্থত, নৃত্যনাট্য—'চিত্রাঙ্গদা' (1906), 'চণ্ডালিকা (1938), 'শ্যামা' (1939)। পঞ্চম, কৌতুক রসপ্রধান নাটক, যেমন—'গোড়ায় গলদ' (1892), 'বৈকুণ্ঠের খাতা' (1897), 'শোধবোধ' (1926), 'চিরকুমার সভা' (1926), 'শেষর(া' (1928) এবং ষষ্ঠত, রূপক-সাঙ্কেতিক নাটক যার মধ্যে ছিল 'রাজা' (1910), 'অচলায়তন' (1912), এরই অভিনয়যোগ্য সংস্করণ 'গু(' (1918), 'ডাকঘর' (1912), 'ফাল্গুনী' (1916), 'মুক্ত(ধারা' (1925), 'রক্ত(করবী' (1926) এবং 'কালের যাত্রা' (1932)।

রবীন্দ্রনাথ নিজে যে নাটকীয় ধারা বা আদর্শের মানদণ্ডে তাঁর নাটক-রচনা শু(করেছিলেন তা মূলত চরিত্র ও ঘাত-প্রতিঘাতনির্ভর। এ ব্যাপারে প্রথম থেকেই তিনি ভিন্ন পথের পথিক এবং নানান পরী(ায় ব্রতী। একেবারে প্রথম দিকে নাটকের প্রকরণ হিসেবে সংগীতের সার্থকতা তিনি পরী(া করে দেখেছেন। 'বাল্মীকি প্রতিভা', 'কালমৃগয়া' বা 'মায়ার খেলা'-র মত রচনায় পাত্র-পাত্রীদের আচার-আচরণ ঘটনা ইত্যাদি সবই যেন সংগীতময়, সংগীতনির্ভর। এতে অবশ্য কার্যত নাটক খুব কমই থাকে।

কবি যেখানে প্রচলিত ধারায় নাটক লিখেছেন সেখানে তাঁর স্বভাবের অবিচ্ছেদ্য গীতিধর্ম থেকে মুক্ত(না হয়ে প্রচলিত গঠন কৌশলকে অনুসরণের চেষ্টা করেছেন। 'সীমাকে লইয়াই অসীম, প্রেমকে লইয়াই মুক্তি('—এই তত্ত্বটিকেই কবি নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে রূপ দিয়েছেন 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকে। গীতিধর্মতার কিছু প্রকাশ থাকলেও কবি এখানে মান্যতা দিয়েছেন জীবনসমস্যাকে। 'রাজা ও রাণী এবং 'বিসর্জন' শেক্সপিয়রিয় নাট্যরীতির আদর্শে রচিত। 'রাজা ও রাণী' রবীন্দ্রনাথের প্রথম পূর্ণাঙ্গ

পঞ্চাঙ্ক নাটক। বিত্র(মদেব এবং সুমিত্রার দাম্পত্য সম্পর্কের দ্বন্দ্ব এই নাটকের অবলম্বন। যদিও শেষ পর্যন্ত এক মর্মান্তিক আঘাত-বেদনার মধ্যে তার পরিসমাপ্তি। সেখান রয়েছে অতিনাটকীয়তার রীতিমত ছোঁয়া। এ দুর্বলতা সম্পর্কে মহাকবি নিজেও অবহিত ছিলেন। তাই সংশোধিত নাট্যরূপ 'তপতী'-র প্রকাশ। তবে নাটকীয় ভারসাম্য এখানেও ঠিক রি(ত হয়েছে বলে সমালোচকেরা মনে করেন না। 'রাজর্ষি' উপন্যাসের নাট্যরূপ 'বিসর্জন' এও পঞ্চাঙ্ক নাটকের রীতি রি(ত হয়েছে। এই নাটকে রাজা গোবিন্দমাণিক্য এবং প্রেমের শক্তি(র সঙ্গে আচারসর্বস্ব পৌরোহিত্য শক্তি(র প্রতীক রঘুপতির দ্বন্দ্ব রূপ পেয়েছে। 'মালিনী' নাটকে হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মসংঘর্ষ তেমন নাটকীয় সংহতি লাভ করেনি।

কাব্যনাট্য এবং নাট্যকাব্যগুলিতে অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রকাশ নাটকীয় নয়, সেখানে গীতিধর্মিতাই প্রধান। এই সূত্রে ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত বিশিষ্ট সমালোচক 'চিত্রাঙ্গদা'র প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেছেন তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য 'চিত্রাঙ্গদা মদনদেবের নিকট রূপ ঋণ লইয়া যে অর্জুনকে আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল তাহার জন্য তাহার মনে অনুতাপ ও আত্মধিক্কার জাগিয়াছে।...কিন্তু ইহাদের উপস্থাপনা হইয়াছে নাটকীয় রীতিতে নহে, দীর্ঘ স্বগতোক্তি(ও অপূর্ব কাব্যসৌন্দর্যের মাধ্যমে আত্মবি(-ষণ ও প্রেম নিবেদনের দ্বারা। মনস্তত্ব ও হৃদয়-সংঘাতের ইঙ্গিত এই কাব্য প-াবনের নীচে চাপা পড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু অন্তরাত্মা কাব্যের।' (রবীন্দ্রসৃষ্টি সমী(া) 'গান্ধারীর আবেদন'-এর বিষয়বস্তুতেও নীতিপ্রতিষ্ঠাই প্রাধান্য পেয়েছে, চরিত্রগুলির মধ্যে আবেগের কোনো পরিবর্তন নেই। নাটকীয়তা প্রধান হয়নি। 'কর্ণ ও কুন্তী সংবাদ'-এ বরং কাব্য এবং নাটকের সবচেয়ে সার্থক সমন্বয় ঘটেছে বলে মনে হয়। কর্ণের জীবনের নিষ্ফলতার বেদনা এক ট্রাজিক সমাপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

রূপক-সাঙ্কেতিক নাটকেই রবীন্দ্রের নাট্যপ্রতিভার সর্বোত্তম বিকাশ। ঘটনা এবং চরিত্রসৃষ্টির সুস্পষ্ট ধারাবাহিকতা অনুসরণের পরিবর্তে এখানে প্রকাশ পেয়েছে গভীরতম সত্যোপলব্ধি, তত্ত্বভাবনা তথা কবিআত্মার অবারিত প্রসার। সর্বত্রই যেন অমূর্তভাবের ব্যঞ্জনা, তাই এই গোত্রীয় নাটকের নিয়ন্ত্রণী শক্তি(। 'রাজার' নায়িকা সুদর্শনা অন্ধ প্রবৃত্তিধর্মের প্রবর্তনাতেই অন্ধকারের রাজাকে নিজের আসক্তি(র সীমায় দেখতে চেয়েছিল। অনেক দুঃখের মধ্যে দিয়ে শেষ পর্যন্ত সে পেয়েছে সেই সত্যদৃষ্টি যাতে রাজাকে সে প্রকৃত নিজের অন্তরের মধ্যে পায়।

প্রসঙ্গত বলবার যে 'রাজা'রই রূপান্তরিত সংস্করণ হল 'অরূপরতন'। 'ডাকঘর'-এও দেখি পরমাত্মার উদ্দেশে জীবাত্মার অভিসার। এক মৃত্যুপথযাত্রী বালকের মুক্তি(র আকাঙ(া, ভগবানের পাঠানো চিঠি পাওয়ার ব্যাপারে তার গভীর বি(্বাস, শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর প্রায় সমাসন্ন মুহূর্তে তার উপর থেকে সমস্ত বাধানিষেধ যেন উঠে গেল—বাধাহীন স্বাধীনতায় তার ভগবৎ-সা(াতের প্রস্তুতি 'ডাকঘর'-এর রূপক-সাঙ্কেতিকতাকে অসামান্যতায় আভাসিত করেছে। 'রাজা' এবং 'ডাকঘর'-কে আরও একভাবে ভাবা যায়। যেমন, প্রথম নাটকের নায়িকা সুদর্শনা রাজাকে প্রত্য(ভাবে পাবার জন্য উন্মুখ, আর দ্বিতীয় নাটকের বালক অমল ঈ(্বরের চিঠি পাবার জন্য গভীর আগ্রহে অপে(া করে আছে। কোনো নাটকেই সেই রাজা বা ঈ(্বর কিন্তু শেষ পর্যন্ত মঞ্চে এসে উপস্থিত হন না। হবেনই বা কী করে। ঈ(্বর বা পরমপু(ষকে তো অন্তরের মধ্যে পাওয়া ছাড়া অন্যভাবে পাওয়ার উপায় নেই।

'মুক্ত(ধারা' এবং 'রক্ত(করবী'তে রয়েছে ধনবাদী যন্ত্রসভ্যতার সংকট এবং তার থেকে মানুষের মুক্তি(র কথা। মানুষ বিজ্ঞানের সাধনায় নিজের কল্যাণের জন্য যে যন্ত্রশক্তি(কে আবিষ্কার করেছে, সাম্রাজ্যবাদী

অপপ্রয়াসে তা কেমন করে কার্যত মানুষের অকল্যাণেই ব্যবহৃত হয়—যুবরাজ অভিজিৎ নিজের জীবনের মূল্যে সেই অপচেষ্টাকে প্রতিহত করে এবং যন্ত্রের চেয়ে মানুষের শুভবুদ্ধিই যে বড়— সেই ব্যঞ্জনাকেই স্পষ্ট মাত্রা দেয়। এই ঘটনার রূপকে আমরা যেন শক্তি(মান রাষ্ট্রগুলির হাতে দুর্বল জাতিগুলির পীড়নকেই প্রত্য(করি। অন্যদিকে পুঁজিবাদী সভ্যতার লোভ, বঞ্চনা, নিষ্ফলতার যন্ত্রণা এবং নিজের কাছে নিজের বিড়ম্বনার পটভূমিকায় মানবাত্মার সত্য-অন্বেষণ, এই নাটকে রূপক-সাঙ্কেতিকতায় আভাসিত। এখানে য(পুরীর যে অধী(ের, সে তার নিজের ব্যর্থতার যন্ত্রণায় নিজেই বিদ্ধ। যান্ত্রিকতা ও মনুষ্যত্বনাশী শোষণে সে বাড়িয়ে চলে তার সঞ্চয়ের বস্তুপিণ্ড। এর বিড়ম্বনা তার মত আর কে উপলব্ধি করতে পারবে। 'রক্ত(করবী'র নায়িকা নন্দিনী য(পুরীর এই অতৃপ্ত আবহাওয়ায় তথা বাতাবরণে বহন করে নিয়ে আসে প্রাণের ঐ(র্য। রাজাও মুক্তি(পায় ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা থেকে। উপলব্ধি করে প্রেমের পবিত্রতাকে। যৌবনের প্রতীক, নন্দিনীর দয়িত রঞ্জনের আত্মদানেই সম্ভব হয়েছে এই পরিণতির।

'শারদোৎসব' এবং 'ফাল্গুনী' রূপক-সাঙ্কেতিক পর্যায়ের নাটক হলেও কিছুটা পৃথক গোত্রের রচনা। নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাত বা ভাবনার সংঘর্ষ এখানে সে অর্থে নেই। এ হল অবকাশের ঋতু শরৎ এবং যৌবনের ঋতু বসন্তের সৌন্দর্য ও ভাবব্যঞ্জনার প্রকাশ। 'অচলায়তন' নাটকে কবি দেখান, আচরণ ধর্ম নয়, বাইরের সাধনায় অন্তরের আকৃতির নিবৃত্তি ঘটে না। এবং অর্থহীন অনুষ্ঠান মুক্তি(র পথ নয়, তা বন্ধন মাত্র। কবি আসলে অন্ধসংস্কারকে আঘাত করতে চেয়েছেন। তবে উদ্দেশ্যময়তা কিছুটা প্রকট হওয়ায় সূক্ষ্ম ইঙ্গিতময়তার সৌন্দর্য সব সময় ফোটেনি।

'তাসের দেশ', 'চিত্রাঙ্গদা' (নৃত্যনাট্যের উপযোগী সংস্করণ), চণ্ডালিকা, শ্যামা প্রভৃতি নৃত্যনাট্যে কবি সংগীত ও নৃত্যের মধ্য দিয়ে ভাববস্তুকে রূপায়িত করেছেন। 'বৈকুণ্ঠের খাতা', 'চিরকুমার সভা', 'শেষর(া' রবীন্দ্রনাথের কৌতুক রসাশ্রিত নাটক। এখানে নাট্য পরিস্থিতি এবং আত্মমগ্ন খেয়ালি মানুষগুলির স্বভাব তথা আচরণগত অসঙ্গতি কৌতুককর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। সে সময়ের অন্য প্রহসনের পাশে রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি প্রকৃতই ব্যতিক্র(ম।

একথা আগেই বলা হয়েছে যে, তত্ত্ব বা আইডিয়ার প্রাধান্য রবীন্দ্রনাটককে দিয়েছে এমন এক মাত্রা যাতে তাঁর নাটক প্রচলিত ধারাতে বিশিষ্ট না হয়েও একান্ত নিজস্ব স্বভাবে সমুজ্জ্বল। আধুনিক কালের সংশয়-সংকট যন্ত্রণা তাঁর নাটকে এসেছে ভারতীয় কল্যাণবোধে আস্থা রেখে। বিদেশি নাটক মহাকবিকে নাটক রচনার (ে ত্রে কতখানি প্রাণিত করেছিল সে আলোচনায় লাভ নেই। কেননা শেষ পর্যন্ত সবই তিনি আশ্চর্যভাবে নিজের মত করে রূপ দেন—পশ্চিম এবং পূর্ব যেখানে একবিন্দুতে সংহত। রবীন্দ্রনাথের নাটক সাধারণ দর্শকের কৃপাধন্য হোক বা না হোক, বাংলা নাটকের ধারায় তা উজ্জ্বলতম ব্যতিক্র(ম। উত্তরকালের কাছে তার মূল্য বিরাট হয়ে দেখা দিয়েছে।

15.4 ছোটগল্প

ছোটগল্পের সঙ্গে উপন্যাসের পার্থক্য বিশাল। মিল একটাই। দুই (ে ত্রেই মানুষের জীবনের গল্প বলা হয় এবং তা গদ্যে। মহাকাব্যের সঙ্গে গীতিকাব্যের যেমন সম্পর্ক, উপন্যাসের সঙ্গে গল্পের তেমন। উপন্যাসে জীবনের নানা বিচিত্র জটিল কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়। তার বিচিত্র আবর্ত, বিপুল বিস্তার। ছোটগল্পে

এই বিস্তৃতির অবকাশ নেই, জটিলতারও নয়। একটা বিশেষ মুহূর্ত বা দিকই যেন বিদ্যুতের দীপ্তিতে হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। বাকি অংশ আড়ালে চলে যায়। আর সেজন্যই এখানে নাট্য-মুহূর্তের আকস্মিকতা, গীতিকবিতার ব্যক্তি(গত ভাব এবং সাঙ্কেতিকতার ব্যঞ্জনা একই সঙ্গে প্রকাশ পায়। গীতিকবির মত গল্পকারও সব কিছুকে তাঁর ব্যক্তি(মনের রসের শরিক করেই প্রকাশ করেন। উপন্যাসে ঘটনা ও চরিত্রের উপস্থাপনা বাইরের দিক থেকে— ছোটগল্পে সেই উপস্থাপনা লেখকের নিজের উপলব্ধি, ধারণা ও চেতনার প্রে(তে।

বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের প্রথম যথার্থ শিল্পী স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। 1891 সালে 'ভারতী' পত্রিকায় তাঁর 'ঘাটের কথা' প্রকাশিত হয়। সার্থক ছোটগল্পের সূচনা এখান থেকেই। এরপর 'হিতবাদী' পত্রিকায় বেশ কয়েকটি গল্প লিখেছেন তিনি। জমিদারি দেখাশুনোর সূত্রে যে বাংলাদেশের জীবন ও মৃত্তিকার সান্নিধ্যে তিনি এলেন—তাঁর গল্পে সেই পরিচিতিরই অসামান্য প্রকাশ। পদ্মা, বরেন্দ্রভূমির জীবন তাঁকে এ ব্যাপারে প্রভূত প্রভাবিত করেছে। কবি নিজে লিখেছেন, 'বাংলা দেশের নদীতে নদীতে গ্রামে গ্রামে তখন ঘুরে বেড়াচ্ছি পরিচয় অপরিচয়ে মেলামেশা মনের মধ্যে।...(ণে (ণে যতটুকু গোচরে এসেছিল তার চেয়ে অনেকখানি প্রবেশ করছিল মনের অন্দরমহলে আপন বিচিত্ররূপ নিয়ে। সেই নিরন্তর জানাশোনার অভ্যর্থনা পাচ্ছিলুম অন্তঃকরণে, যে উদ্‌বোধন এসেছিল তা স্পষ্ট বোঝা যাবে ছোটগল্পের নিরন্তর ধারায়।'

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের বিষয়বৈচিত্র্য বিপুল। প্রতিদিনের সুখ-দুঃখের ধারায় যে গল্পগুলি পেয়েছি সেগুলি হল—'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা', 'ব্যবধান', 'দিদি', 'রাসমণির ছেলে', 'পণর(া', 'দান প্রতিদান' 'ছুটি' প্রভৃতি। পারিবারিক বা সামাজিক জীবনের প্রচলিত ধারার বি(দ্ধে পাত্র-পাত্রীরা গিয়েছে 'হালদার গোষ্ঠী', 'ঠাকুরদা' বা 'সম্পত্তি সমর্পণ'-এর মত গল্পে। তীব্র সমাজ-সমালোচনা তথা নারীর ব্যক্তি(-অধিকারের কথা রয়েছে 'দেনাপাওনা' 'হৈমন্তী', 'স্ত্রীর পত্র', 'অপরিচিতা' বা 'পয়লা নম্বর'-এর মত গল্পে। প্রেমের বিচিত্র জটিলতা, আবর্তের ব্যঞ্জনা রয়েছে, 'একরাত্রি', 'সমাপ্তি', 'দৃষ্টিদান', 'মাল্যদান', 'মধ্যবর্তিনী', 'শান্তি', 'প্রায়শ্চিত্ত', 'মানভঞ্জন', 'দুরাশা', 'অধ্যাপক'-এর মত গল্পগুলিতে। কাব্যব্যঞ্জনার সঙ্গে নিসর্গের মেলবন্ধন প্রেমের গল্পকে দিয়েছে অ-পূর্ণতার মাত্রা। প্রকৃতির সঙ্গে মানবমনের গূঢ় আত্মীয়তার সম্পর্ক চিত্রিত হয়েছে 'শুভা', 'অতিথি' প্রভৃতি গল্পে। অনায়াসেই সামান্য দু-একটি রেখাপাতে কবি মানবমনের সঙ্গে বহিঃপ্রকৃতির অন্তরঙ্গ পরিচয়ের দরজাটি খুলে দিয়েছেন। 'অতিথি' গল্পে মানবজীবনের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্কের অবিচ্ছেদতার কথাই বলা হয়েছে অসামান্য শিল্পিত ভাষায়। তাঁর অতিপ্রাকৃত-রসাশ্রয়ী গল্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য '(ধিত পাষাণ', 'নিশীথ', 'মণিহারা' ইত্যাদি। কল্পনার বিচিত্র বর্ণময়তায় এ কেবলমাত্র আমাদের ভৌতিক সংস্কারের কাহিনী থাকেনি। বাইরের ভৌতিক পরিবেশের মধ্যে কবি সঞ্চারিত করেছেন জীবনের অপরিমেয় রহস্যকে। প্রাকৃত-অপ্রাকৃতের ভিন্নতা আপনা থেকেই যেন সরে গিয়েছে।

শেষ পর্বে রবীন্দ্রনাথ একেবারে আধুনিকতম সময়ের পটভূমিকায় কয়েকটি গল্প লিখেছিলেন। 'রবিবার' 'শেষকথা' এবং 'ল্যাবরেটরি' এদের মধ্যে অগ্রগণ্য। জীবনসমস্যার বি(-ষণের চেয়েও বক্ত(ব্যের তির্যকতাই তাঁর লেখনীকে আকর্ষণ করেছে বেশি। কবি যে মনের দিক দিয়ে চিরত(ণ রয়ে গেছেন, 'শেষের কবিতা'র পর এই সব গল্পই প্রমাণ করে তিনি যেন একালের থেকেও ভাষায় আচরণে—এককথায় সবদিক দিয়ে এগিয়ে রয়েছেন। অবশ্য নিজের মনের সার্বিক আভিজাত্য বজায় রেখেই। মোট কথা, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প সাহিত্যিক বিচারেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পগুলির অন্যতম। ঊনবিংশ শতাব্দীর আরও তিনজন শ্রেষ্ঠ গল্পকার চেকভ, পো এবং মোপাসাঁর পাশেই তাঁর স্থানী আসন।

15.5 উপন্যাস

উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই বঙ্কিমবৃত্তের বাইরে আসতে চেয়েছেন। যদিও সহসা সে ব্যাপারটি করে ফেলতে পারেননি। এর জন্য তাঁকে অপে(া করতে হয়েছে। তাঁর প্রথম পর্বের উপন্যাস অবশ্যই বঙ্কিমপ্রভাবিত। ষোল বছর বয়সে কবি লিখেছেন 'ক(ণা'। ধারাবাহিকভাবে 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও তখন গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়নি। 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট' (1883) এবং 'রাজর্ষি' (1887) রোমান্সনির্ভর ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শে রচিত। 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট' সম্পর্কে কবির নিজের মন্তব্য হল "প্রাচীর ঘেরা মন বেরিয়ে পড়ল বাইরে, তখন সংসারে বিচিত্র পথে তার যাতায়াত আরম্ভ হয়েছে। এই সময়টাতে তার লেখনী গদ্যরাজ্যে নূতন ছবি নূতন নূতন অভিজ্ঞতা খুঁজতে চাইলো। তারই প্রথম প্রয়াস দেখা দিল 'বৌ-ঠাকুরাণীর হাট' গল্পে—একটা রোমান্টিক ভূমিকায় মানবচরিত্র নিয়ে খেলার ব্যাপারেও, সেও অল্পবয়সেরই খেলা। চরিত্রগুলির মধ্যে যেটুকু জীবনের ল(ণ প্রকাশ পেয়েছে সেটা পুতুলের ধর্ম ছাড়িয়ে উঠতে পারেনি।" বস্তুতই এ উপন্যাসের চরিত্রগুলি—যেমন প্রতাপাদিত্য, উদয়াদিত্য, বিভা, সুরমা বা বসন্ত রায়, সবই যেন এক-একটা বিশেষ বিশেষ দিকের প্রতিনিধিত্ব করেছে। চরিত্রের বহুবর্ণময়তা এতে ফোটেনি। অসৎ, মমতাহীন মানুষ বা ব্যক্তি(ত্বের চাপে কেমন করে সৌন্দর্য, কোমলতা ধ্বংস হয়—এই উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয় তাই। 'রাজর্ষি' অত্যন্ত সুখপাঠ্য উপন্যাস। কিন্তু এখানেও গোবিন্দমাণিক্য এবং রঘুপতি দুটি বিপরীতভাবের প্রতীক— প্রেম ও হিংসার। জয়সিংহের মধ্যে অবশ্য দুয়ের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ কিছুটা আছে।

'চোখের বালি' (1902) উপন্যাসেই বাংলা উপন্যাসের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হল। মনস্তত্ত্বের জটিল পটভূমিতে মহেন্দ্র, আশা, বিহারী, বিনোদিনী এবং রাজলক্ষ্মী—বিশেষ করে এই ক'টি চরিত্রের পারস্পরিক টানাপোড়েন বা ঘাতপ্রতিঘাত অসাধারণ বি(ে-ষণনৈপুণ্যে শিল্পিত হয়েছে। এই উপন্যাস থেকে বাংলা সাহিত্যে যথার্থ মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের সূত্রপাত।

পরবর্তী উপন্যাস 'নৌকাডুবি' (1906) কিন্তু একান্তভাবেই বাইরের ঘটনা বা যোগাযোগনির্ভর। পাত্র-পাত্রীর চরিত্রেও মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার তেমন কোনো অবকাশ নেই। বরং সরলীকরণের মাত্রাই অত্যন্ত প্রকট। সমালোচকেরা 'নৌকাডুবি'কে রবীন্দ্রনাথের দুর্বলতম উপন্যাস বলে চিহ্নি(ত করেছেন।

'গোরা' (1910), 'ঘরে বাইরে' (1916) এবং 'চার অধ্যায়' (1938) বৃহৎ জীবনসমস্যা তথা রাষ্ট্রিক আবর্তের বিচিত্র দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সমাজ বা জাতীয় জীবনের আশা-আকাঙ(ার পটভূমিকায় ব্যক্তি(জীবনকথাই এই উপন্যাসগুলির অবলম্বন। 'গোরা'য় রয়েছে এক মহাকাব্যিক ব্যাপ্তির চালচিত্র। ধর্ম থেকে এর নায়কচরিত্র যথার্থ স্বদেশ ভারতবর্ষে পৌঁছেছে। সে এক অসামান্য ছবি। ব্যক্তি(জীবনের সঙ্গে বৃহত্তর রাজনীতি এবং ধর্মীয় আদর্শের এক সুসমঞ্জস্য মিলন, ব্যক্তি(মনের শাখাপ্রশাখায় সমস্ত সমাজশরীরে প্রবাহিত প্রাণধারায় এইরকম অনায়াস সঞ্চরণের দৃষ্টান্ত 'গোরা'র পর বাংলা উপন্যাসে দুর্লভ হয়ে গিয়েছে।

'ঘরে-বাইরে' এবং 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ দেখান— দেশমুক্তি(কোনো প্রমত্ততার সমার্থকশব্দ নয়, তা কোনো সহজসাধনও কিছু নয়, দুঃখের আঁধার রাত্রি পার হয়ে তপস্যালব্ধ আত্মশক্তি(র উদ্বোধনেই সেই স্বদেশ সত্য হয়ে উঠবে। 'ঘরে-বাইরে'-তে বিমলা-সন্দীপ-নিখিলেশের ত্রিভুজ বৃত্তে সেই বোধ আর প্রকাশকে নির্মাণ করেছেন তিনি। বিমলাকে এ উপন্যাসে সবচেয়ে জীবন্ত চরিত্র মনে হয়। নিখিলেশ এবং সন্দীপ মনে হয় দুটি পরস্পরবিরোধী আইডিয়ার রূপক মাত্র। যদিও প্রথম জনের বেদনা এবং দ্বিতীয় জনের খানিকটা

অনুতাপজনিত আবেগ ও উপলব্ধিতে কিছুটা জীবনের পরিচয় আছে। প(ান্তরে 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে কবি দেখাতে চেয়েছেন (দ্রপন্থার অভাবাত্মক দিক। যদিও একথাও সমানভাবে বলবার যে, এই উপন্যাসেই রবীন্দ্রনাথ প্রথম দেখালেন যে—ভালবাসা বর্বর।

পারিবারিক দ্বন্দ্বমূলক উপন্যাস হিসেবে 'যোগাযোগ' (1923) বিশেষভাবে উল্লেখ করার মত। মধুসূদন তার নবপরিণীতা স্ত্রীকে কাছে পেতে চেয়েছে প্রেমে নয়, পু(ষের অধিকারবোধ আর অহংকারে। কুমু সেই আচরণের প্রতিবাদ করেছে। মধুসূদনকে বুঝিয়ে দিয়েছে এই অধিকারবোধ আর অহংকারকে সে স্বীকার করেনা। সে প্রেমের কাছে হার মানতে রাজি—বর্বর পু(ষত্বের কাছে নয়, অর্থের মত্ততার কাছেও নয়। শেষ পর্যন্ত তার মাতৃত্ব সব প্র(্নকেই অমীমাংসিত রেখে ঘটনার যবনিকা ফেলেছে। 'যোগাযোগ' ভেতর থেকে সত্যি হয়ে ওঠেনি, তা নিতান্তই যেন এক বিদ্রূপের মত।

'চতুরঙ্গ' (1916) এবং 'শেষের কবিতা' (1929) কাব্যধর্মী উপন্যাসের আঙ্গিকে উজ্জ্বল। প্রথম উপন্যাসে শচীশ ও দামিনীর যে বিচিত্র মনস্তাত্ত্বিক সম্পর্কের টানাপোড়েন আভাসে-ইঙ্গিতে ব্যত্ত(হয়েছে তাকে বি(্-ষণ করা কঠিন। শচীশের মনের মধ্যে রূপ-অরূপের দোলন। শেষ পর্যন্ত অরূপের জগতেই যেন যাত্রা তার। দামিনী বাস্তব মানবী। এই বিচিত্র মানসিক দ্বন্দ্ব কবি অসাধারণ নৈপুণ্যে প্রকাশ করেছেন।

'শেষের কবিতা'য় অমিত ও লাবণ্যর আশ্চর্য রোমান্টিক প্রেম পাঠক-পাঠিকাকে এই উপলব্ধিতে উদ্‌বোধিত করেছে যে—প্রতিদিনের দম্পতি-জীবনের মধ্যে তার ঠিক প্রবেশাধিকার নেই। অমিত আর লাবণ্য এই প্রেমকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যই বিবাহ করেছে যথাত্র(মে কেটী মিত্র এবং শোভনলালকে। তত্ত্ব যাই হোক না কেন এর কাব্যিক মাধুর্য, সৌন্দর্যের নন্দনলোক এবং তার থেকে স্বেচ্ছানির্বাসনের ক(ণ বেদনা রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র পথে পদচারণার অসামান্য সামর্থ্যকেই প্রকাশ করেছে।

'দুই বোন' (1931), এবং 'মালঞ্চ' (1934) আয়তনে (ুদ্র। প্রথমটিতে দেখি নারীর দুই রূপের কথা—প্রিয়া এবং জননী। এই আইডিয়ার কথা শর্মিলা, শশাঙ্ক এবং ঊর্মিমালার কাহিনীর মধ্যে বিবৃত হয়েছে। এই সমস্যাই কিছুটা ভিন্ন দিক দিয়ে 'মালঞ্চ' উপন্যাসে নীরজা, সরলা এবং আদিত্যের জীবনে বর্ণিত হয়েছে। অনেকটা ছোটগল্পের প্যাটার্নেই এখানে গল্প বলা। কাহিনী বা চরিত্রের জটিলতা নেই বলে অনেকে একে পুরো উপন্যাসের মর্যাদা দিতে চান না।

'চোখের বালি', 'গোরা', 'চতুরঙ্গ' বা 'ঘরে বাইরে'র মত উপন্যাস যিনি রচনা করেছেন, তাঁর সামর্থ্য বা ঔপন্যাসিক প্রতিভার গভীরতা প্রমাণের জন্য সমালোচকের দ্বারস্থ হবার প্রয়োজন নেই। এটুকু অনায়াসেই বলা যেতে পারে যে বঙ্কিমচন্দ্রের পর বাংলা উপন্যাসের অগ্রগতি যখন নতুন পথের অপে(া করছিল, তখন সে পথ খুলে দিয়েছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই। কবিধর্মের প্রাধান্য সত্ত্বেও পরবর্তী বাংলা উপন্যাসের পথ তিনিই নির্দেশ করেছেন। তাঁর প্রভাবকে শিরোধার্য করেই তো শরৎ-প্রতিভার বিস্তার তথা প্রতিষ্ঠা।

15.6 প্রবন্ধ-নিবন্ধ

বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতে বাংলা প্রবন্ধ তথা রচনা সাহিত্যের উৎকর্ষ ও প্রতিষ্ঠা। যাকে ব্যত্তি(গত প্রবন্ধ বলে অর্থাৎ যেখানে বিষয়ের চেয়ে বিষয়ীর অর্থাৎ লেখকের নিজের মনের প্র(েপই একমাত্র, বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে তারও পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। রবীন্দ্রনাথ বাংলা প্রবন্ধকে পুরোপুরি শিল্পবস্তু করে তুলেছেন, বিষয়কেও দিয়েছেন

যথোচিত মান্যতা। কাব্য-কবিতার পাশে যে বিপুল পরিমাণ প্রবন্ধ তিনি রচনা করেছেন তার বিষয়গরিমা তথা বিষয়বৈচিত্র্য আমাদের প্রকৃতই বিস্মিত করে। পনেরো বছর বয়সে তাঁর গদ্যরচনার শু(। শেষ জন্মদিনের ভাষণ 'সভ্যতার সঙ্কট' তাঁর শেষ প্রবন্ধ। পঁয়ষট্টি বছর ধরে প্রবন্ধ লিখেছেন তিনি কবিতা, নাটক, গল্প, উপন্যাসের মতই। তিনি মহৎ কবি মাত্র নন, মননের সীমানাতেও তিনি সম্রাট। জীবনের সদর্থকতায় বি(্বাসই সেই মনন সাহিত্যের মর্মকথা।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলিকে মোটামুটি এই কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করে নেওয়া যায় সাহিত্যসমালোচনা, রাজনীতি-সমাজনীতি-শি(া, ধর্ম ও দর্শন, ভ্রমণ সাহিত্য, পত্র সাহিত্য এবং ব্যক্তি(গত প্রবন্ধ।

সাহিত্য-সমালোচনা 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা', 'অবসর সরোজিনী' এবং 'দুঃখসঙ্গিনী' এই তিনটি কাব্যের সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথের গদ্যরচনার সূচনা। পরবর্তীকালে সাহিত্যতত্ত্ব এবং সাহিত্য প্রসঙ্গে বহু আলোচনাই তিনি করেছেন। তাঁর এ সংক্র(ান্ত আলোচনাগুলি 'প্রাচীন সাহিত্য' (1907), 'লোক সাহিত্য' (1907), 'সাহিত্য' (1907), 'আধুনিক সাহিত্য' (1907), 'সাহিত্যের পথে' (1936) এবং 'সাহিত্যের স্বরূপ' (1943) প্রভৃতি গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। সাহিত্যের সার্থক সমালোচনার সূচনা ও প্রতিষ্ঠা বঙ্কিমচন্দ্রেই, রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনন্য কবিদৃষ্টির গভীরতায় তাকে দেন সৌন্দর্য তথা রসোপলব্ধির অপরূপ মাত্রা। 'সাহিত্য', 'আধুনিক সাহিত্য', 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থগুলিতে কবি সাহিত্যের বিচার নিজের অনুভূতির আলোয় অসামান্য করে তুলেছেন। তার প্রবর্তনা সুন্দর এবং সত্যের সঙ্গে ভারতীয় মঙ্গলবোধ তথা 'শিবম্'-এর আইডিয়া। এও দেখবার যে সাহিত্য-সমালোচনাকেও তিনি এক অর্থে সৃষ্টির সীমানায় নিয়ে গেছেন। তা শুষ্ক সাহিত্য বিচার বা আলোচনা মাত্র নয়।

রাজনীতি-সমাজনীতি-শি(া শুধু সাহিত্যের বিচার-আলোচনা নয়, রাজনীতি, সমাজ, শি(া বিষয়েও রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারাতে কালাতিক্র(মী আধুনিকতার পরিচয় সুমূদ্রিত। 'আত্মশক্তি(' (1905), 'ভারতবর্ষ' (1906), 'সঞ্চয়' (1906), 'পরিচয়' (1916), 'শি(া' (1908), 'স্বদেশ' (1908), 'রাজাপ্রজা' (1908), 'কালান্তর' (1937), 'সভ্যতার সঙ্কট' (1941) প্রভৃতি গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্র, সমাজ এবং শি(াবিষয়ক প্রচুর প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত(হয়েছে। মনুষ্যত্বধর্ম তথা সর্বজনীন মানবতাই মহাকবির বাণী। এই গ্রন্থগুলির তাৎপর্য প্রত্যেক চিন্তাশীল মানুষেরই পরম সম্পদ। শি(া সংক্র(ান্ত রচনার মধ্যে 'শি(ার মিলন' (1921), 'বি(্বিদ্যালয়ের রূপ' (1933), 'শি(ার বিকিরণ' (1933) বিশেষভাবে উল্লেখ করবার। শি(ার ে(ত্রেও রবীন্দ্রনাথ কতখানি ভারতীয় এবং মৌলিক ছিলেন এই সমস্ত রচনায় তার অসামান্য পরিচয় রয়েছে।

ভ্রমণ সাহিত্য পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে সম্পর্কস্থাপনকে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে উপলব্ধিরই সোপান বলে মনে করতেন। সেই উপলব্ধির প্রেরণাতেই তিনি বার হয়েছেন দেশে-দেশান্তরে। পরবর্তীকালে এর সঙ্গে যুক্ত(হয়েছিল বি(্বভারতীর জন্য অর্থসংগ্রহের স্থূল প্রয়োজনও। কিন্তু অন্তরের প্রেরণাই ছিল প্রধান। কখনও চিঠি কখনও বা ডায়েরির আকারে লেখা তাঁর 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' (1881), 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরি' (1891-93), 'জাপান যাত্রী' (1919), 'যাত্রী' (1919), 'রাশিয়ার চিঠি' (1931), 'পারস্যে' (1936) এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এগুলিকে প্রথানুগ ভ্রমণকাহিনী বিবেচনা করলে ভুল হবে। বি(্বসভ্যতাকে কবি নিজের মনের রং রাঙিয়েই উপস্থাপিত করেছেন। বিশেষভাবে একথাও বলবার যে প্রকাশকালের বিচারে প্রথম দুটি গ্রন্থে কবি প্রথম চলিত ভাষার প্রয়োগ করেছিলেন।

ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক প্রবন্ধ একথা সর্ববাদিসম্মতরূপে সত্য যে বিশেষ কোনো ধর্ম বা দর্শনের সূত্রে

রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধির প্রকাশকে বোঝা যায় না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ভাবধারায় বিপুলভাবে প্রভাবিত হয়ে তিনি যে বি(েমানবধর্মে বি(োসিত হয়েছিলেন তার মধ্যে জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায়ের সংকীর্ণতার কোনো অবকাশ নেই। এরই অসামান্য পরিচয় রয়েছে 'ধর্ম' (1909), 'শান্তিনিকেতন' (1909-16) এবং 'মানুষের ধর্ম' (1933) গ্রন্থে। জীবনের গভীর উপলব্ধির সঙ্গে দার্শনিকতা এখানে একাকার হয়ে গিয়েছে। এর অপূর্বতাও সেইখানেই।

পত্র সাহিত্য পত্ররচনাতেও মহাকবি চিরকালের লেখক হয়ে রয়েছেন। পত্রের আদর্শ হল সহজ ও অন্তরঙ্গ ভাষায় প্রিয় পরিজনের কাছে নিজেকে প্রকাশ করা। ঠিক এতটা না হলেও রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলি তাঁর অসামান্য কবিত্বময় মানসিকতারই বর্ণাঢ্য প্রকাশ। 'ছিন্নপত্র'-এ (1912) অবশ্য কবিজীবনের নিভৃত দিকের অনেকটাই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। কবির সাহিত্যসৃষ্টির এক সোনালি অধ্যায়ের স্মৃতি বহন করছে এই পত্রগুলি। অন্যান্য পত্র সংকলনের মধ্যে 'পথে ও পথের প্রান্তে' (1938) এবং 'পথের সঞ্চয়' (1939) উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি(গত প্রবন্ধগুলি বিষয়বস্তু এবং রসের আবেদন উভয়দিক দিয়েই বিশিষ্ট। এই গোত্রীয় রচনার মধ্যে 'পঞ্চভূত' (1897), 'বিচিত্র প্রবন্ধ' (1907) খুবই বিশিষ্ট। 'পঞ্চভূত'-এর 'মন', 'পল্লীগ্রাম', 'নরনারী' প্রভৃতি রচনায় অনুসৃত হয়েছে বৈঠকী সংলাপের এক মনোরম রীতি। এগুলি অনেকটা ডায়েরি জাতীয় আত্মনিষ্ঠ রচনা। 'বিচিত্র প্রবন্ধ'-এর 'পাগল', 'কেকাধ্বনি', 'নববর্ষা', '(দ্ধগৃহ', 'শ্রাবণসন্ধ্যা' প্রভৃতি রচনায় কবির একটি বিশেষ ভাবানুভূতি, ধ্যানদৃষ্টির একটি অতর্কিত উৎ(েপ, স্বপ্নাবিষ্ট কল্পনার একটি বর্ণময় চিত্রকল্প অপরূপ কাব্যসৌন্দর্যে প্রকাশ পেয়েছে। 'জীবনস্মৃতি' বা 'ছেলেবেলা'-র মত স্মৃতিকথাতেও কবি নিছক ব্যক্তি(জীবনের ইতিহাস রচনা করেননি। ব্যক্তি(জীবনের ঘটনার প্রে(াপটে ফুটিয়ে তুলেছেন কবিচেতনার বিকাশ ও প্রতিষ্ঠাকে।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ একই সঙ্গে মনন সামর্থ্যে এবং কাব্যসম্পদে সমুজ্জ্বল। তাঁর প্রবন্ধ প্রকৃতই এক মহাকবির প্রবন্ধ। কবিচেতনা এবং মনীষার লেখনী এখানে একবিন্দুতে সংহত হয়েছে।

15.7 সারাংশ

রবীন্দ্রনাথের বিপুল সৃষ্টি বৈচিত্র্য, গভীরতা এবং অভিনবত্বে বিশিষ্ট। কাব্য-কবিতার সঙ্গে তিনি লিখেছেন নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প এবং অজস্র প্রবন্ধ নিবন্ধ।

বারো বছর বয়স থেকে চেতনালুপ্ত হবার আগে পর্যন্ত কবিতাই কবির জীবনদেবতা। কাব্যরচনার পর্বগুলিকে সূচনা, উন্মেষ, ঐ(র্য, অন্তর্বর্তী, গীতাঞ্জলি, বলাকা এবং অন্ত্য—নানান বিভাজনে সাজানো হয়েছে। নাটকগুলিকে যেমন ভাগ করা হয়েছে গীতিনাট্য, প্রথানুগ, কাব্যনাট্য-নাট্যকাব্য, নৃত্যনাট্য, কৌতুক রসাশ্রিত এবং রূপক-সাঙ্কেতিক পর্যায়ে।

এ ছাড়াও রয়েছে ছোটগল্পকার, ঔপন্যাসিক এবং মনীষী প্রবন্ধকার রবীন্দ্রনাথের অনন্য সৃষ্টির সং(িপ্ত পরিচয়। বাংলা ছোটগল্পের প্রথম সার্থক পথিকৃৎ ও স্রষ্টা তিনি। আধুনিকতম জীবনও এসেছে এর বৃত্তে। উপন্যাসেও এনেছেন নতুন কাল ও রীতির তুলনাহীন স্বা(র। নাটকেও তিনি বিশিষ্টতম। রূপক-সাঙ্কেতিক নাটকে তাঁর মনন এবং কবিধর্মের ঘটেছে অ-পূর্ব মিলন। এ ছাড়া রয়েছে তাঁর বিপুল প্রবন্ধ সাহিত্যের সং(িপ্ত পরিচয়। সাহিত্য-সমালোচনা, স্বদেশ ও সমাজচিন্তা, ভ্রমণসাহিত্য, শি(ানীতি, পত্রসাহিত্য, ধর্ম ও

দর্শন সংত্র(ান্ত আলোচনা, ব্যক্তি(গত প্রবন্ধ—সব মিলিয়ে তিনি হয়ে উঠেছেন এক মনীষী রচনাকার। জীবন, স্বদেশ, সমাজ সব কিছুকেই যিনি দেখেছেন এক অখণ্ড দৃষ্টিতে।

15.8 অনুশীলনী

1. নীচের প্র(গুলির অতি সং(িপ্ত উত্তর দিন
   (ক) রবীন্দ্রকাব্যের শৈশব পর্বে প্রকাশিত কয়েকটি গ্রন্থের নাম ক(ন।
   (খ) রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কাব্যনাটকের উল্লেখ ক(ন।
   (গ) 'হৈমন্তী' এবং 'স্ত্রীর পত্র' গল্প দুটি রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের ধারায় কেন বিশিষ্ট?
2. সং(িপ্ত উত্তর দিন
   (ক) 'চোখের বালি' উপন্যাসের অভিনবত্ব কোথায় আলোচনা ক(ন।
   (খ) রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সমালোচনামূলক কয়েকটি প্রবন্ধ গ্রন্থের পরিচয় দিন।
   (গ) 'ছিন্নপত্র'-এর বিশিষ্টতা কোথায়?
3. নীচের প্র(গুলির উত্তর দিন
   (ক) 'বলাকা' পর্বের কাব্যধারায় রবীন্দ্রনাথের কবিচেতনার যে দিকটি প্রকাশিত হয়েছে তার আলোচনা ক(ন।
   (খ) 'মুক্ত(ধারা' এবং 'রক্ত(করবী' নাটকের বিষয়বস্তুর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের যে মানসিকতা প্রতিফলিত হয়েছে তার পরিচয় দিন।
   (গ) 'গোরা', 'ঘরে বাইরে' এবং 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচেতনার যে দিকটি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তার বিবরণ দিন।

15.9 গ্রন্থপঞ্জি

1. রবীন্দ্রজীবনী (প্রথম-চতুর্থ খণ্ড)—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
2. রবীন্দ্রসৃষ্টি সমী(া (প্রথম-দ্বিতীয় খণ্ড)—ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
3. রবীন্দ্রনাথ—সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত
4. রবীন্দ্রসরণী—প্রমথনাথ বিশী
5. রবীন্দ্রপ্রতিভার পরিচয়—ড. (ুদিরাম দাস
6. ভারতে জাতীয়তা, আন্তর্জাতিকতা ও রবীন্দ্রনাথ (প্রথম-ষষ্ঠ খণ্ড)— নেপাল মজুমদার
7. সমকালীন ভারতীয় রাজনীতি এবং রবীন্দ্রসাহিত্য—ড. জীবেন্দু রায়
8. রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষ—ড. জীবেন্দু রায়
9. রবীন্দ্রকাব্য পরিত্র(মা(রবীন্দ্রনাট্য পরিত্র(মা(রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ও উপন্যাস—উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
10. কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাথ—শঙ্খ ঘোষ
11. রবীন্দ্র-চিন্তা-চর্চা—ভবতোষ দত্ত
12. রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠ—হরপ্রসাদ মিত্র

একক 16 ❑ রবীন্দ্রসমকালীন ও রবীন্দ্র-উত্তর বাংলা সাহিত্য

গঠন

16.0 উদ্দেশ্য

16.1 প্রস্তাবনা

16.2 রবীন্দ্রসমকালীন ও রবীন্দ্র-উত্তর বাংলা সাহিত্য

16.3 কাব্য-কবিতা

- **16.3.1** সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
- **16.3.2** যতীন্দ্রমোহন বাগ্চী
- **16.3.3** ক(োনিধান বন্দ্যোপাধ্যায়
- **16.3.4** কুমুদরঞ্জন মল্লিক
- **16.3.5** কালিদাস রায়

16.4 যতীন্দ্রনাথ-মোহিতলাল-নজ(ে

- **16.4.1** যতীন্দ্রনাথ
- **16.4.2** মোহিতলাল মজুমদার
- **16.4.3** নজ(ে ইসলাম

16.5 আধুনিক কবিতার নবপর্যায়

- **16.5.1** জীবনানন্দ দাশ
- **16.5.2** অমিয় চক্র(বর্তী
- **16.5.3** সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
- **16.5.4** প্রেমেন্দ্র মিত্র
- **16.5.5** বিষ্ণু(দে
- **16.5.6** সুভাষ মুখোপাধ্যায়

16.6 প্রবন্ধ-নিবন্ধ

- **16.6.1** রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী
- **16.6.2** প্রমথ চৌধুরী
- **16.6.3** বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর
- **16.6.4** অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- **16.6.5** মোহিতলাল মজুমদার

16.7 উপন্যাস ও ছোটগল্প

- **16.7.1** প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
- **16.7.2** শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- **16.7.3** বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

16.7.4 বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
16.7.5 তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়
16.7.6 বনফুল
16.7.7 শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
16.7.8 প্রেমেন্দ্র মিত্র
16.7.9 মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
16.8 সারাংশ
16.9 অনুশীলনী
16.10 গ্রন্থপঞ্জি

16.0 উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়বার পর আপনি যা জানতে পারবেন তা হল

- রবীন্দ্রসমকালীন ও রবীন্দ্র-উত্তর বাংলা কাব্য-কবিতার পরিচয়
- বাংলা প্রবন্ধের পরিচয়
- উপন্যাস ও ছোটগল্পের সংি(প্ত বিবরণ

16.1 প্রস্তাবনা

রবীন্দ্রসমকালীন ও রবীন্দ্র-উত্তর বাংলা সাহিত্য অবশ্যই এক সমৃদ্ধ পর্ব। কেমন করে কাব্য-কবিতা রবীন্দ্র-অনুসরণের পথরেখা অতিত্র(ম করে রবীন্দ্রবিরোধিতার পর্বে গিয়ে পৌঁছেছে তার বিপুল বৈচিত্র্য সমেত এখানে তার সংি(প্ত বিবরণ রয়েছে।

সংি(প্ত বিবরণ রয়েছে রবীন্দ্রসমকালীন বাংলা প্রবন্ধের সমৃদ্ধ অধ্যায়েরও। সেই সঙ্গে এসেছে উপন্যাস ছোটগল্পের আলোচনা। প্রভাতকুমার শরৎচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে যার সীমা প্রায় সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত প্রসারিত।

16.2 রবীন্দ্রসমকালীন ও রবীন্দ্র-উত্তর বাংলা সাহিত্য

বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিরিশটি বছর রবীন্দ্রপ্রতিভার ঐ(র্যে উজ্জ্বল। 1913 সালে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সুবাদে দেশে-বিদেশে অতি দ্রুত প্রতিষ্ঠা লাভ করেন তিনি। একথাও সত্যি যে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে অপে(াকৃত সীমাবদ্ধ (েত্রেই তাঁর রচনা জনপ্রিয় হয়েছিল। বি(দ্ধতাও ছিল রীতিমত। পুরস্কার প্রাপ্তির পর তা যেন হঠাৎই দূর হয়ে যায়। অবশ্য বিরোধিতা তার পরেও হয়েছে। কিন্তু তা ব্যত্তি(গত কিছু নয়, সাহিত্যিক আদর্শের ভিন্নতাই তার কারণ। স্বয়ং শরৎচন্দ্র পর্যন্ত তাতে সামিল হন। যদিও মনেপ্রাণে তিনি রবীন্দ্রনাথের ভাবশিষ্য। অন্তত তাঁর নিজের কথাতে তাই প্রমাণ হয়।

রবীন্দ্র-আদর্শ পরিত্যাগ করে ভিন্ন পথে চলবার চেষ্টা শু(হল বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই 1923 সালে

প্রকাশিত 'কল্লোল', 1926 সালে প্রকাশিত 'কালিকলম' এবং 1927 সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'প্রগতি' পত্রে এই অন্য পথে চলবার আহ্বান এল ত(ণ প্রজন্মের কাছ থেকে। 1930 সালে প্রকাশিত হল বুদ্ধদেব বসুর 'বন্দীর বন্দনা' এবং 1932 সালে প্রকাশিত হল প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'প্রথমা'। মোটামুটিভাবে সূত্রপাত হল রবীন্দ্র-উত্তর সাহিত্যের। প্রকৃতই এ এক সন্ধি(ণ তথা কালান্তরের মুহূর্তে। রবীন্দ্রসমকালীন পর্বের কবিদের সং(প্ত কাব্যালোচনার মধ্যে দিয়ে এই সময়ের প্রকৃতিকে বি(-ষণ করা যেতে পারে।

16.3 কাব্য ও কবিতা

16.3.1 সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (1881-1922)

রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজের এক উজ্জ্বল প্রতিনিধি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁর সময়ের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি(ত্ব এবং বিষয়কেই তিনি তাঁর কাব্য-কবিতার বৃত্তে নিয়ে এসেছিলেন। ছন্দ এবং শব্দের ওপর ছিল তাঁর অনায়াস অধিকার। স্বয়ং কবিগু(ই তাঁর উদ্দেশে এই মর্মে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন, 'তুমি বঙ্গভারতীর তন্ত্রীপরে—একটি অপূর্ব তন্ত্র এনেছিলে পরাবার তরে।'

সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন বিশিষ্ট লেখক এবং মনীষী অ(য়কুমার দত্তের পৌত্র। রোমান্টিক কবিপ্রকৃতির সঙ্গে সংযত ক্লাসিক (চি বা অনুশীলন যুক্ত(হয়েছিল তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিতে। তাঁর কাব্যগুলির মধ্যে 'বেণু ও বাণী' (1906), 'তীর্থসলিল' (অনুবাদ কবিতা-1908), 'তীর্থরেণু' (অনুবাদ কবিতা-1910), 'কুহু ও কেকা' (1912) 'অভ্র ও আবীর' (1916) এবং ব্যঙ্গ কবিতা 'হসন্তিকা' (1917) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'ছন্দের বিচিত্র ঐ(র্য, বাক্‌রীতির অভাবনীয় বিস্ময়, ইতিহাস-পুরাণ-প্রত্নতত্ত্ব, জ্ঞান-বিজ্ঞানকে মন্থন' (আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সং(প্ত ইতিবৃত্ত—ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়) করে প্রেম, সৌন্দর্য, নিসর্গ, স্বদেশ এসব কিছুকেই কবি নিয়ে এসেছেন তাঁর কবিতার প্রাঙ্গণে। রবীন্দ্রানুসারী কবি হয়েও তাঁর বিশিষ্টতার স্বা(র তিনি রেখেছেন। আবেগের ওপর স্থান দিয়েছেন যুক্তি(এবং মননকে। এদিক দিয়েই তিনি আধুনিক। তাঁর জ্ঞানের পরিধিও বহুদূর বিস্তৃত। আঙ্গিকের দিকে তিনি যত্নশীল। কিন্তু যাকে সৃজনী কল্পনা বলে তাঁর সৃষ্টিতে তার অভাব আছে। এককথায় বড় মাপের রোমান্টিক কবিধর্ম তথা কবিধর্মের বিশিষ্টতা, গভীরতা তাঁর কাব্যে অনুপস্থিত।—এসব সত্ত্বেও শব্দমাধুর্য এবং চিত্রকল্পের বর্ণময়তায় তিনি পাঠকহৃদয়কে দীর্ঘকাল মোহিত রাখতে পেরেছেন।

16.3.2 যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী (1878-1948)

রবীন্দ্র-অনুগামী কবিসমাজের অন্যতম বিশিষ্ট কবি যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী। শুধু রবীন্দ্র-অনুসরণ নয়, মৌলিকতার স্বা(রও তাঁর কাব্য-কবিতায় রয়েছে। কোনো দূরপ্রসারী ভাবকল্পনা নয়, প্রতিদিনের চেনা পল্লীর আনন্দবেদনার ছবিই তাঁর কাব্যে প্রাধান্য পেয়েছে। বাংলার পল্লীশ্রী কবিকে মুগ্ধ করেছিল। কাব্যিক প্রয়োজন নয়, এই পল্লীবাংলাকে তিনি ভালবেসেছিলেন হৃদয়ের গভীর থেকে। তাঁর প্রকাশরীতিও সহজ মাধুর্যবিশিষ্ট।

যতীন্দ্রমোহনের কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে 'অপরাজিতা' (1909), 'নাগকেশর' (1913), 'নীহারিকা' (1917), 'মহাভারতী' (1939) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এক সময়ে কাব্যরসিকেরা এই কাব্যগুলিকে সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন।

রূপতৃষ(া কবির স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। এ ব্যাপারে ক(ণানিধানের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য আছে। তাঁর কবিতায় নারীরূপের বন্দনা আছে, আছে সম্ভোগাকাঙ(া ও। কিন্তু সেই অর্থে উন্মাদনা কিছু নেই। শান্ত সংযত প্রকাশভঙ্গিমা তাঁর কাব্যকে শ্রীমণ্ডিত করেছে। রয়েছে দেশপ্রীতি এবং পৌরাণিক কাহিনীও। ইতিহাসবোধ এবং বৃহৎ ভারতবর্ষের সঙ্গেও তিনি অন্তরের যোগ অনুভব করেছেন। এর দৃষ্টান্ত 'মহাভারতী'। এ ব্যাপারে তিনি রবীন্দ্রনাথের দ্বারা অনুপ্রাণিত হন।

রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অ(য়কুমার বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ সেন, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ কবিরাও তাঁকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছেন। গভীর বি(াসজনিত মুগ্ধতাই কবি যতীন্দ্রমোহনের কবি-আত্মা বা কাব্য-চেতনার মর্মকথা।

16.3.3 ক(ণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (1877-1955)

রবীন্দ্রানুসারী বা রবীন্দ্র-পরিমণ্ডলে লালিত কবিসমাজের সম্পর্কে যে কথাটি বিশেষভাবে বলবার তা হল কবিতার রূপ নির্মাণের অসাধারণ কুশলতা সত্ত্বেও বিষয় বা ভাববস্তুতে নিজত্বের পরিচয় তেমন কিছু প্রবল নয়। আর রূপ নির্মাণেও তাঁরা রবীন্দ্ররীতির বাইরে যেতে সম্মত ছিলেন না। কিন্তু তাঁদের কাব্যে ছিল এমন এক সহজ সরল মাধুর্য যা আজও আমাদের মুগ্ধ করে।

কবি ক(ণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় এই কবিসমাজেরই একজন। তাঁর কাব্যগুলির মধ্যে 'ঝরাফুল' (1318), 'শান্তিজল' (1320), 'ধানদূর্বা' (1318) এবং কাব্য সংকলন 'শতনরী' (1337) উল্লেখযোগ্য। প্রেম-প্রীতি আসক্তি(ই এর মর্মকথা। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রভাব তাঁর কবিতায় আছে। কিন্তু ছন্দ, বিশেষ করে (াসাঘাতপ্রধান ছন্দের প্রয়োগে তাঁর সিদ্ধি বিশেষভাবে বলবার। সেই সঙ্গে রয়েছে বাস্তবোচিত রোমান্টিক কবিপ্রাণ। বাস্তব তাঁকে আলোড়িত করলেও প্রতিদিনের সমস্যাজর্জরিত বিশৃঙ্খলা বা গ-ানির মধ্যে শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারেনি। নিজের মত করেই গড়ে নিয়েছিলেন স্বপ্নের জগৎ।

16.3.4 কুমুদরঞ্জন মল্লিক (1882-1970)

পল্লীপ্রেমিক এবং বৈষ(বীয় ভাবরসে স্নাত কবি কুমুদরঞ্জন অনেকগুলি কাব্য লিখেছেন। তাঁর 'উজানী' (1911), 'বনতুলসী' (1911), 'একতারা' (1914), 'বনমল্লিক' (1918), 'অজয়' (1927), 'স্বর্ণসন্ধ্যা' পল্লীগ্রামের রূপ এবং বৈষ(বীয় স্নিগ্ধতা নিয়ে বাঙালি পাঠককে দীর্ঘকাল এক ধরনের তৃপ্তি দিয়েছে, এনে দিয়েছে প্রসন্ন জীবনের স্বাদগন্ধ। একই সঙ্গে একথাও বলবার যে শব্দনির্বাচনে কবির তেমন যত্ন ছিল না, প্রথা অনুসরণের চেষ্টাই সমধিক। অল্প কিছু কবিতা হয়তো বেঁচে থাকবে তার নিজস্বতার জন্য।

16.3.5 কালিদাস রায় (1889-1975)

কবিধর্মের বিচারে কালিদাস কুমুদরঞ্জনের মানসিকতার পরিমণ্ডলেই রয়েছেন। পল্লীঅন্তপ্রাণ না হলেও রাঢ়-বাংলার প্রকৃতি তাঁর কাব্যে চমৎকারভাবেই এসেছে। তাঁর কাব্যগুলির মধ্যে, 'পর্ণপুট' (1914), 'ব্রজবেণু' (1919), 'বল্লবী' (1915) এবং 'বৈকালী' (1940) বিশেষভাবে উল্লেখ্য। বৈষ(বীয় প্রেম প্রীতি তাঁর কাব্যবীণার মূল সুর। কাব্যের রূপপ্রসাধনে তিনি যত্নশীল, যদিও সেটা মাঝে মাঝে যেন একটু বেশি রকম বোঝা যায়। রসতত্ত্ববিদ্ হিসেবেই কাব্যের শিল্পরূপে তিনি যত্ন নিয়েছেন।

16.4 যতীন্দ্রনাথ-মোহিতলাল-নজ(লে

রবীন্দ্রসমকালীন এই তিনজন কবিকে পৃথক বৃত্তে রাখতে হবে সাহিত্যিক বিচারের মানদণ্ডেই। প্রকৃত কথা হল সম্মোহের অবস্থা থেকে রবীন্দ্রসমকালীন কবিরা বেরিয়ে আসতে পারছিলেন না। কবিরা পথ খুঁজছিলেন, কিন্তু পাচ্ছিলেন না। এইরকম এক অবস্থায় দীর্ঘ সময় কেটে গেছে। হঠাৎই একদিন 'বিদ্রোহী' কবিতার জয়পতাকা উড়িয়ে, অগ্নিবীণা বাজিয়ে নজ(লের মত কবি বাংলা কাব্যসংসারে প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেলেন। বুদ্ধদেব বসুর মত সাহিত্যস্রষ্টা এবং রসিক মন্তব্য করেছিলেন 'সেই প্রথম রবীন্দ্রনাথের মায়াজাল ভাঙলো।' রবীন্দ্রনাথের পাশে নিজের এই স্বাতন্ত্র্যই তাঁকে জায়গা করে দেয়। যাকে আমরা ভদ্রলোকের পরিবেশ বলি, যেখান সবই মার্জিত শালীন, বেশি রকমের শিষ্টাচার যেখানে ছদ্মবেশে আত্মপ্রকাশ করে, নজ(লের সহজ বিচরণের (ে ত্র সেখানে নয়। তিনি সাধারণ মানুষের কবি। এ জিনিস সেদিন নতুন। রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও যে অন্য পথে পদচারণা করা যায় সাধ্য এবং প্রকৃতি অনুযায়ী এ ব্যাপারটি তিনিই দেখিয়েছিলেন। 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' প্রবন্ধে বুদ্ধদেব বসু অতঃপর যা বলেছিলেন তার মর্মকথা হল—মোহিতলাল এবং যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের মত কবিদের (যাঁরা বয়সে তাঁর চেয়ে বড় ছিলেন) অন্যপথে হাঁটবার অন্যতর বি(্বাসে বি(্বাসী হওয়ার প্রেরণা এবং সামর্থ্যও যেন সহজ হয়ে এল। এরই প্রাথমিক পরিণতি 'কল্লোল' পত্রিকার আবির্ভাব। সাহিত্যে নতুন কাল যে নিশ্চিতভাবেই আসন্ন, একথাটাও পাকা হয়ে গেল।

16.4.1 যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (1887-1952)

রবীন্দ্রনাথের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিয়েই প্রথম জন অর্থাৎ কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের আবির্ভাব। অথচ এও সত্যি যে রবীন্দ্রের আস্তিক্যবাদ, প্রেম ও প্রকৃতিচেতনায় কবি তৃপ্তি পাননি। বি(্বাসও করেননি বলা যায়। তাঁর চেতনাজগতে জীবনের বঞ্চনা ফাঁকি বা আত্মপ্রতারণার কথাই মান্যতা পেয়েছে। এককথায় তাঁর জগৎবোধ দুঃখময়। এর মধ্যে আনন্দময় বি(্বিধাতার কোনো মঙ্গলস্পর্শ তিনি অনুভব করেননি। এ বোধই তাঁর কাছে মিথ্যা, অসত্যমূলক। জীবনকে কবি দেখতে চেয়েছেন নির্মোহ দৃষ্টিতে। শুধু জীবন নয়, বাইরের প্রকৃতিও তাঁর কাছে রক্ত(াক্ত(জীবন সংগ্রামে আকীর্ণ।

যতীন্দ্রনাথের প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলি হল যথাত্র(মে 'মরীচিকা' (1923), 'ম(শিখা' (1927), 'ম(মায়া' (1930), 'সায়ম্' (1940), 'ত্রিযামা' (1948), মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 'নিশান্তিকা' (1957) এবং কাব্যসংকলন 'অনুপূর্বা' (1946)। পরিমাণে যথেষ্ট না হলেও গুণমানে প্রথম শ্রেণীর।

ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর 'কবি যতীন্দ্রনাথ এবং আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম পর্যায়' গ্রন্থে যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদের প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেছিলেন তার মর্মকথা হল যে—এই আইডিয়া খুব নতুন কিছু নয়। এ ব্যাপারে ইংরেজ কবি ডান্ (John Donne) তাঁকে প্রভাবিত করেছেন। সাহিত্যের সমালোচক ঐতিহাসিক ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, 'যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ অনেক সময়ে একটা ভঙ্গী মাত্র, দর্শন, হৃদয় ও মননের খুব গভীর স্তরে এই দুঃখবেদনা পৌঁছায় নাই। এই দুঃখবাদ কবির আত্মার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হইলে, তিনি আস্তিক্যবাদী দৃষ্টিকোণ হইতে দুঃখের দেবতার সৃষ্টি করিতে পারিতেন না। দুঃখবাদ তাঁহাকে নৈরাশ্যবাদী করিলেও নাস্তিক করিতে পারে নাই।' (আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সং(প্ত ইতিবৃত্ত)।

যাই হোক, যতীন্দ্রনাথের মর্ত্যপ্রীতি এবং মানবপ্রেম তাঁর দুঃখবাদিতাকে মর্মস্পর্শী রূপ দিয়েছে। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে কবি সৌন্দর্যের জগতে ফিরে যাবার গাঢ় আকাঙ(্া অনুভব করেছেন। 'সায়ম্', 'ত্রিযামা' এবং 'নিশান্তিকা'-র মত কাব্য সেই চেতনারই ফসল।

আঙ্গিকের ব্যাপারেও কবির স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট। বত্ত(ব্যের মধ্যে বলিষ্ঠতা আনতে গিয়ে কবি আশ্রয় নিয়েছেন বলিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গির। তদ্ভব, দেশজ সব শব্দই তাঁর কাব্যবৃত্তে এসেছে প্রয়োজন অনুসারেই। (ে-ষ এবং ব্যঙ্গাত্মক বাক্য নির্মাণে, অলঙ্কার ও চিত্রকল্পের প্রয়োগে তাঁর স্বাতন্ত্র্য তিনি সুনির্দিষ্ট আকারেই চিহ্নি(ত করেছেন।

16.4.2 মোহিতলাল মজুমদার (1888-1952)

যতীন্দ্রনাথেরই প্রায় সমকালীন মোহিতলাল মজুমদার বাংলা কাব্যে নিয়ে এলেন দেহাত্মবাদের বলিষ্ঠ সুর। সেই সঙ্গে জিজ্ঞাসা-সংকুল জীবনবোধ। বাংলা কাব্যে রবীন্দ্রযুগে এ এক অন্যতর আধুনিকতা। প্রবীণ এবং নবীন সমালোচকেরা বারবারই তাঁর কাব্যের আলোচনায় বিভ্রান্ত হয়েছেন। 'স্বপনপসারী' (1922), 'বিস্মরণী' (1927), 'স্মরগরল' (1936), 'হেমন্তগোধূলি' (1941) এবং 'ছন্দচতুর্দশী' (1951) তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ।

দেহবাদের বলিষ্ঠতার সঙ্গে মোহিতলালের কাব্যে হৃদয়ধর্ম এবং বুদ্ধিবৃত্তির অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হয়েছে। রোমান্টিকতা, ক্লাসিক রূপনির্মাণ এবং ভাস্কর্য নিয়ে মোহিতলালের কাব্যের আঙ্গিক ত্রুটিহীন ও বৈচিত্র্যময়। 'প্রাণের খেলায় দুঃখেরে ডরে না কেহ, দুঃখে তবু হাসিছে সংসার'-এ কেবল কোনো কাব্যের কবিতাবিশেষের পঙ্ত্তি(মাত্র নয়, মোহিতলালের সমস্ত কবিচেতনারই মর্মবাণী।

16.4.3 নজ(ল ইসলাম (1899-1976)

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক—নজ(লের দশক। এই সময়ে ত(ণমনের কাছে, বিশেষ করে তাঁর কাব্যকবিতার আবেদন এতই প্রবল ছিল যে সাময়িকভাবে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবও যেন ম্লান হয়ে যায়। কিছুকালের জন্য সাময়িক আবহাওয়া এবং পরে রাজনীতির সঙ্গে যোগাযোগ তাঁর জীবন এবং সাহিত্যতে অন্য এক ধরনের মাত্রা দেয়। কবি 'লাঙল', 'ধূমকেতু' প্রভৃতি বিপ্-বপন্থী সাম্যবাদী পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হয়ে পড়েন। প্রকৃতই এরকম উন্মাদনা, প্রাণোচ্ছ্বাস, উৎসাহ-উদ্দীপনার বিপুল প্রবাহ, মনে-প্রাণে অসাম্প্রদায়িকতা, সেই সঙ্গে স্বদেশ ও বিশ্বের মুক্তি(র জন্য স্বপ্ন আমাদের সাহিত্যে নতুন সামগ্রী। কবি যোগ দিয়েছিলেন 'কল্লোল' গোষ্ঠীর সঙ্গে, অল্প কিছুসময় সান্নিধ্যে এসেছিলেন কবি মোহিতলালের। তাঁর প্রেমের কবিতায় আসক্তি(র যে তীব্রতা, তা মোহিতলালের প্রভাব বা সান্নিধ্যের ফল বলে মনে হতে পারে। 'অগ্নিবীণা' (1922) বিদ্রোহের বাণী। তাঁর 'ভাঙার গান' (1931), 'বিশেষ বাঁশী' (1931)-ও উৎসাহ-উদ্দীপনার উল্লেখ্য সম্ভার।

শুধু বিদ্রোহ নয়, নজ(ল রচনা করেছেন প্রেমের গান, একই সঙ্গে ঈদ্ এবং শ্যামামায়ের গান। এই সমদর্শিতা কবির প(ে বানানো কোনো সামগ্রী নয়, তা উঠে এসেছে তাঁর অস্তিত্ব ও চেতনার মর্মমূল থেকে। যদিও আবেগ তরলতা এবং ভাবগত অসংগতি তাঁর কাব্য-কবিতাকে অনেক সময়ই শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা থেকে খানিকটা ভ্রষ্ট করেছে—বিষয়বস্তু যত মহৎই হোক না কেন। কিন্তু সব বাদ-সাদ দিলেও নজ(ল তাঁর প্রেমিক এবং বিদ্রোহী মূর্তিতে উত্তরকালের কাছে বহুলাংশেই অম্লান থাকেন।

16.5 আধুনিক কবিতার নব পর্যায়

আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে 'কল্লোল', 'কালিকলম' এবং 'প্রগতি'—একটু পরে 'পরিচয়'-এর হাত ধরে বাংলা কাব্য-কবিতায় যে পালাবদল ঘটল আজ পর্যন্ত নানাভাবেই তার ধারা অব্যাহত, রবীন্দ্রনাথের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেই সেদিনের পথিকৃৎ কবিরা নতুন পথের নির্মাণ ও অন্বেষণে ব্রতী হয়েছিলেন। (1930) থেকেই এই যাত্রার শু(। পূর্বসূচনা অবশ্য 'কল্লোল' থেকে (1923) হয়ে গিয়েছিল। আধুনিক এই সব কবির দল বুঝেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে আমরা যা পেয়েছি তাকে নতুন কালের ফসল উৎপাদনে ব্যবহার করতে হবে। কেবল অনুসরণ, কেবল চর্বিতচর্বণ কখনও মহৎ কিছুর জন্ম দেয় না।

16.5.1 জীবনানন্দ দাশ (1899-1954)

জীবনানন্দ দাশ এই পর্বের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কবি। 'ঝরাপালক' (1927)-এ নজ(ল-মোহিতলালের অনুসরণ আছে। কিন্তু 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' (1936), 'বনলতা সেন' (1942), 'মহাপৃথিবী' (1944), 'সাতটি তারার তিমির' (1948) বা 'রূপসী বাংলা' (1959)-র মত কাব্যে তাঁর স্বাতন্ত্র্য বা নিজস্বতা অত্যন্ত প্রত্য(। আধুনিক ইউরোপের কাব্য বা চিত্রশিল্প যে সব পরী(া-নিরী(ার মধ্যে দিয়ে চলেছিল তার পরিচয় যেমন এ সব রচনায় রয়েছে, একই সঙ্গে রয়েছে আবহমানকালের বাংলার নিসর্গকে ভালবাসা, জীবনের বিষণ্ণতার বোধ, ইতিহাসচেতনা—এককথায় আধুনিক জীবনচেতনার সবদিক। কাব্যের নির্মাণ বা বাক্‌রীতিতেও কবি নতুন। অবচেতনা তাঁর কাব্যে সবই যেন বিশৃঙ্খল এলোমেলো করে তোলে— সেই শৈথিল্য আর আপাত অসঙ্গতি আধুনিক জীবনচেতনারই অবিচ্ছেদ্য অংশ। বাংলাদেশকেও এমন রূপসী করে রবীন্দ্রনাথ আর বিভূতিভূষণ ছাড়া কেউ এঁকে তোলেননি।

16.5.2 অমিয় চক্র(বর্তী (1900-1985)

আধুনিক সমালোচকেরা অমিয় চক্র(বর্তীর কবিমনকে সবচেয়ে জটিল বলে বিবেচনা করেছেন। বাইরের দিক দিয়ে তাঁকে 'আধ্যাত্মিক' মনে হলেও অন্তরঙ্গ স্বভাবে তিনি একজন দ্বন্দ্ব(ত মানুষ—এক শিকড়হীন ছিন্নমূল সত্তা। সমন্বয় বা সঙ্গতি যিনি ঠিক চেয়েও পাচ্ছেন না—অথচ মাটির বাংলাদেশ তাঁকে আকুল করে, একই সঙ্গে যিনি বি(্বপথিক, বি(্বমনা—সং(ে পে কবিমনের মানচিত্র এই।

'খসড়া' (1938), 'একমুঠো' (1939), 'মাটির দেওয়াল' (1942), 'পারাপার' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। এসব কাব্যের একদিকে রয়েছে বর্তমান জীবন ও সভ্যতার নএ(র্থকতা, গ্‌ানিময়তার প্রতি তীব্র ধিক্কার(একই সঙ্গে ফুটে উঠেছে প্রেম, সৌন্দর্য ক(ণার প্রতি তাঁর অবিমিশ্র প(পাত এবং আশ্রয় নেওয়ার আকাঙ(া। কিন্তু সে আকাঙ(া বীরধর্মের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে—

'বর্বরের হাতে দুঃখ পেয়েও নিভৃতক(ণায় জিৎ,
প্রত্যহ বীর্যেই ধ্যানের ভিৎ...
পাপের বি(দ্ধে পাপী হয়ে, হত্যার বদলে হেনে হত্যা শোক
মাথা নিচু করব না কোটি লোক।' (সত্যাগ্রহ/পারাপার)

16.5.3 সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (1901-1960)

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রথম কাব্য 'তন্বী' (1930) সে অর্থে কোনো মৌলিক সৃষ্টি নয়। ইংরেজি-ফরাসি সাহিত্য তথা কবিতার সঙ্গে ছিল তাঁর অন্তরঙ্গ যোগ। তাঁর উল্লেখ্য কাব্যগুলির মধ্যে রয়েছে 'অর্কেস্ট্রা' (1935), 'ত্র(ন্দসী' (1937), 'উত্তর ফাল্গুনী' (1940), 'সংবর্ত' (1956) এবং 'দশমী' (1956)। জীবনানন্দের আপাত অসঙ্গতি এবং আঙ্গিকগত শিথিলতার বিপরীতে তাঁর অবস্থান। ক্লাসিক সংহতি এবং দুরূহ শব্দের নির্বিচার প্রয়োগ তাঁর কাব্যকে দুর্বোধ্য করলেও রসিক পাঠকের কাছে এর রোমান্টিক জীবনসচেতনতা আড়াল থাকেনি। যদিও সুধীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত জীবনের ইতিবাচকতায় স্থির থাকতে পারেননি। 'আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়' গ্রন্থে দীপ্তি ত্রিপাঠী এই পরিপ্রে(ত থেকেই তার কাব্যকে 'ভ্রষ্ট আদমের আর্তনাদ' বলে অভিহিত করেছেন। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, 'আবেগকে সংহত করিয়া, রসসিন্ধুকে বিন্দুতে পরিণত করিয়া এবং বিষু(র নাভিপদ্মস্থিত বি(েকে হস্তামলকরূপে গ্রহণ করিয়াও তিনি জীবন সম্বন্ধে বিষণ্ণতা বোধ করিয়াছেন।...জীবনে প্রেম ও সৌন্দর্যকে কামনা করিয়াও তিনি সীমাবদ্ধ চেতনায় মাথা খুঁড়িয়াছেন। তাঁহার শব্দকল্পদ্রুমের অন্তরালে একটা কোনো বিষণ্ণ স্বপ্নাভিসারী কবিপ্রত্যয় জাগিয়া আছে— যে কবিপ্রত্যয় জগৎ ও জীবনকে একটা সমন্বয়ী সূত্রে ধরিতে চাহে, কিন্তু অন্তর ও বাহিরের গরমিলের জন্য সেই সূত্রটার স্বরূপ বুঝিতে পারে না'। (আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সং(প্ত ইতিবৃত্ত)

16.5.4 প্রেমেন্দ্র মিত্র (1904-1988)

আঙ্গিকের বিচারে কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র (1904-1988) তেমন কিছু কৃতিত্বের দাবি করতে না পারলেও বৃহৎ মানবতার প্রে(তে প্রকৃতই প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর 'প্রথমা' (1932), 'সম্রাট' (1940), 'ফেরারি ফৌজ' (1948), 'সাগর থেকে ফেরা' (1956), 'হরিণ চিতা চিল' এই সূত্রেই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর আদর্শ হুইটম্যান, স্পেন্ডার-এর মত কবি। এই আদর্শেই তিনি পথিক মানুষের সাথী। (ধিতের ঈ(রকে তিনি প্রত্য(করেছেন বিপুল পৃথিবীর মধ্যেই। এই বলিষ্ঠ জীবনাবেগই তাঁর কবিতার প্রাণসম্পদ। এখানে আত্মকেন্দ্রিকতা বা আত্মসর্বস্বতার অবকাশ নেই। যদিও জীবনের গভীর জটিল দিককে কাব্যে তিনি তেমনভাবে প্রকাশ করতে পারেননি। কবি প্রেমেন্দ্র-র তা হয়তো স্ব-ধর্ম নয়ও। প্রত্যয়দৃপ্ত কবি বাইরের ব্যাপারকেই গু(ত্ব দিয়েছেন বেশি। তবে 'কাব্যনির্মিতি'র (ে ত্রে তেমন কোনো মৌলিকতার পরিচয় যে তিনি রাখতে পারেননি, এ ব্যাপারে কেউ দ্বিমত পোষণ করেন না। তাঁর সেদিকে ল(্যও ছিল না।

16.5.5 বুদ্ধদেব বসু (1908-1974)

কালগত বিচারে বুদ্ধদেব বসু প্রেমেন্দ্র-র পরবর্তী। সচেতনভাবে রবীন্দ্রভাবাদর্শের বিরোধিতায় তিনি প্রায় পথিকৃৎসদৃশ। 'মর্মবাণী' (1925) তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। 'বন্দীর বন্দনা' (1930), 'পৃথিবীর প্রতি' (1933), 'কঙ্কাবতী' (1937), 'দময়ন্তী' (1943), দ্রৌপদীর শাড়ী' (1948), 'শীতের প্রার্থনা বসন্তের উত্তর' (1955) পাঠকসমাজে খুবই পরিচিত। রবীন্দ্রনাথের কাব্যাদর্শের বি(দ্ধে বিদ্রোহ করলেও তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তুও রোমান্স, প্রেম ও সৌন্দর্যই, অন্য কিছু নয়। প্রেম, সৌন্দর্যকে বুদ্ধদেব জৈব শরীরের আকাঙ(ার পরিপ্রে(তে ভাবতে চেয়েছেন, তাকে অস্বীকার করে নয়। নারীর প্রেম তাঁর কাছে শরীর ব্যতিরিক্ত(কোনো আইডিয়া নয়। কিন্তু কার্যত তিনি রবীন্দ্রের সর্বগ্রাসী প্রভাবকে অতিত্র(ম করতে পেরেছিলেন কিনা তা নিয়েও গু(তর সংশয়

আছে। আর তাছাড়া কাব্যে রূপ-রীতির দিক দিয়েও তিনি তেমন অভিনব কিছু একটা করতে পারেননি। তাঁর ল(্য ছিল মূলত বিষয়ের দিকে। লরেন্স বা বোদ্‌লেয়রের মত কবিস্রষ্টারা এ(ত্রে তাঁর আদর্শ। পরবর্তীকালে আঙ্গিক ব্যাপারে তিনি সচেতন হন, জীবন সম্পর্কে বোধেরও পরিবর্তন ঘটে, যদিও তিনি বিষু(দে এমন কি জীবনানন্দের মতও সমকালীন রাষ্ট্রিক বা আন্তর্জাতিক ব্যাপারে আলোড়িত ছিলেন না। এক অর্থে তিনি রসস্রষ্টা, শুদ্ধ কবি।

16.5.6 বিষু(দে (1909-1981)

বিষু(দে-র কবিতায় পাঠক পেলেন ব্যক্তি(কে নতুন কাল আর বি(্বাসের পটভূমিকায় তাঁর 'উর্বশী ও আর্টেমিস' (1932), 'চোরাবালি' (1938), 'পূর্বলেখ' (1940), 'সন্দীপের চর' (1947), 'অন্বিষ্ট' (1950), 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' (1955) উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। তাঁর কবিতার শরীরে অন্তর্লীন হয়ে রয়েছে মার্কসীয় পথে নতুন সমাজ ও পৃথিবীর স্বপ্ন যদিও পরে কবি ফিরে এসেছেন রোমান্সের জগতে। কিন্তু পুরনো বি(্বাসকে বর্জন করে যে তিনি এ পথের পথিক হয়েছেন একথাও একেবারেই ঠিক নয়। আসলে রাজনীতি এবং জীবনকে বিসদৃশ কোনো বস্তু বলে তিনি বিবেচনা করেননি। তাই বারবারই বিষয়বৈচিত্র্যের আশ্রয় নেওয়া। কবির ভাষা প্রয়োগ অবশ্য সরল কিছু নয়, রীতিমত দুর্বোধ্য এবং কোনো কোনো সময় বৈদগ্ধ্যের ভারে আত্র(ান্ত। কিন্তু তাঁর কবিতার সম্পদ যে বিপুল এ নিয়ে এখন কাব্যরসিক এবং সমালোচক-মহলে কোনো মতাদ্বৈধতা নেই।

16.5.7 সুভাষ মুখোপাধ্যায় (1919)

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় (1919) সমাজতন্ত্রে দী(িত মন নিয়েই বাংলা কাব্যসংসারে আবির্ভূত হন। 1940-এ তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পদাতিক' প্রকাশিত হয়। 1942 সাল থেকে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। 'পদাতিক' ছাড়াও তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলি হল 'অগ্নিকোণ' (1948), 'চিরকুট' (1950), 'যতদূরেই যাই' (1962), 'কাল মধুমাস' (1962), 'ফুল ফুটুক' (1399)। এ ছাড়াও আরও অনেক কাব্যকবিতা তিনি রচনা করেছেন। মার্কসবাদের মন্ত্রদী(া নিয়ে কাব্যরচনা শু(করলেও সুভাষের বি(্বাস অনুযায়ী এখন তিনি জীবন ও সময়নিষ্ঠ কবি। মানুষের প্রতি বি(্বাস তিনি হারাননি।

আধুনিক কবিতা দীর্ঘ প্রায় সত্তর-পঁচাত্তর বছর পরে আজ একটি স্থায়ী ঐতিহ্যে পরিণত। জীবনানন্দ, অমিয় চত্র(বর্তী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখের চেষ্টায় তিনের দশকে যে রবীন্দ্রবিরোধী কাব্যান্দোলন শু(হয় আজ তা এক কীর্তি অথবা ইতিহাসবিশেষ। বাংলা উপন্যাস, গল্প এবং প্রবন্ধের মতই কবিতার বৈচিত্র্য এবং প্রতিষ্ঠা আজ এক সর্ববাদিসম্মত সত্য এবং উত্তরকালের প(ে অবশ্যই গর্বের সামগ্রী।

16.6 প্রবন্ধ-নিবন্ধ

রবীন্দ্রযুগের মননশীল প্রবন্ধ বা রচনাকারদের মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, প্রমথ চৌধুরী, বলেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভাষার সমৃদ্ধি এবং বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য এই সব রচনাকে এমন স্থায়িত্ব দিয়েছে যে দীর্ঘকালের ব্যবধানেও তার গু(ত্ব সমান রয়ে গিয়েছে। এগুলি ছাড়া বাংলা সাহিত্যের এক উজ্জ্বল অংশের আলোচনাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

16.6.1 রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (1864-1919)

বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ে(ত্রে রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর নিজের মহিমায় ভাস্বর। মানবতাবাদ, ব্যক্তি(ত্ব এবং বিপুল বৈদগ্ধ্য তাঁর রচনাকে দিয়েছে এক অনন্য চারিত্র্য। বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, সাহিত্য, শব্দতত্ত্ব, চরিত্রকথা সব কিছুতেই তিনি রেখে গেছেন স্মরণীয় সম্ভার। বিজ্ঞান ও দর্শনের মতই সাহিত্যও তাঁর স্ব(ত্র, স্বধর্ম। এই তিনের মিশ্রণে তাঁর তথ্যসমৃদ্ধ রচনাতেও এসেছে সাহিত্যের সরসতা, তা নিতান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা হয়ে ওঠেনি। তাঁর প্রবন্ধই তাঁর বি(জ্ঞানের পরিচয়। বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের সমান মর্যাদা এ(ত্রে তাঁর। ‘প্রকৃতি’ (1303), ‘জিজ্ঞাসা’ (1310), ‘কর্মকথা’ (1320), ‘শব্দকথা’ (1324), ‘বিচিত্র জগৎ’, ‘যজ্ঞকতা’ প্রভৃতি রচনায় সেই অসামান্যতাই সমুজ্জ্বল হয়ে আছে।

প্রাথমিকভাবে রামেন্দ্রসুন্দরের আগ্রহ ছিল পদার্থবিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে। এর সঙ্গে যুক্ত(হয় দার্শনিক চিন্তার প্রতি গাঢ় অভিনিবেশ। সেখান থেকে তিনি পৌঁছে যান অস্তিক্যবাদী দর্শনের প্রশান্তিতে। তত্ত্বজ্ঞান এবং রচনারীতি দুয়ের যুগলবন্দীতে তাঁর রচনা স্বাতন্ত্র্যসমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। দৃশ্যমান বস্তুজগৎ এবং মানসিকভাবে তৈরি অধ্যাত্মজগতের সম্পর্ক ও স্বরূপ স্থির করার জন্য তিনি আশ্রয় নিয়েছেন আধুনিক বিজ্ঞান ও ভারতীয় দর্শনের। এ ব্যাপারে তাঁর সমক(তা দাবি সেকালেই বা কজন করতে পারতেন। এই প্রত্রি(য়াতে রামেন্দ্রসুন্দর আরো একটি মহৎ কাজ করে গেছেন। বাংলা ভাষাকে তিনি আধুনিক দর্শন ও বিজ্ঞানের আলোচনার উপযোগী করে তুলেছেন।

16.6.2 প্রমথ চৌধুরী (1868-1946)

‘সবুজপত্র’ পত্রিকার বিখ্যাত সম্পাদক হিসেবেই প্রাথমিক প্রতিষ্ঠা ‘বীরবল’ ছদ্মনামের এই মনীষী রচনাকারের। যুক্তি(পূর্ণ প্রগতিবাদী চিন্তাচর্চার পরিপ্রে(তে আমাদের সাহিত্যে তিনি খুবই বিশিষ্ট একজন লেখক। ‘সবুজপত্র’ পত্রিকাকে কেন্দ্র করে চলিত গদ্যরীতির সার্বিক প্রয়োগের জন্য তিনি যে আন্দোলন গড়ে তোলেন তাকে স্বাগত জানান স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। ‘সবুজপত্র’-এর শক্তি(শালী লেখকদল সমস্ত দুরূহ প্রসঙ্গকেই প্রকাশ করলে চলিত গদ্যভাষায়। বাংলা সাধু গদ্যরীতির বিপুল ঐ(র্যের পাশে এও আর এক নতুন ঐ(র্যের প্রতিষ্ঠা। বিশুদ্ধ চিন্তায়, যুক্তি(তে জগৎ এবং জীবনের প্রকৃতিকে বুঝতে চাওয়া এবং তাকে চলিত ভাষার আধারে উপস্থাপিত করা সেদিন অবশ্যই এক ঐতিহাসিক দায়িত্বপালন। ধীরে ধীরে চলিত রীতিরই প্রতিষ্ঠা ঘটেছে সর্বাত্মক। সমালোচকেরা অবশ্য মনে করেন যে ভাষার চেয়েও ভাব এবং চিন্তার জগতেই তাঁর বিদ্রোহ অনেক বেশি। ‘তেল-নুন-লকড়ী’ (1906), ‘বীরবলের হালখাতা’ (1917), ‘নানাকথা’ (1919) এবং ‘নানাচর্চা’ (1932) তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা। এর মধ্যে বিশেষ করে ‘বীরবলের হালখাতা’ একটি অসাধারণ গ্রন্থ। সাহিত্য, ভাষা, সমাজ বা দর্শন বিষয়ে যে এরকম একটি গভীর ভাব ও ভাবনাদ্যোতক গ্রন্থ চলিত ভাষায় রচনা করা যায় তা সে সময়ে অনেকের কল্পনারও অগোচর ছিল।

একথাও প্রসঙ্গত বলবার যে প্রমথ চৌধুরী-অনুসৃত চলিত গদ্যরীতি কিন্তু প্রতিদিনের লোক-ব্যবহারের ভাষা নয়। সে ব্যাপারে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে এবং বিবেকানন্দ নানা রচনায় অনেক সহজ ছিলেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সাধু ভাষা প্রমথ চৌধুরীর চলিত ভাষার চেয়ে অনেক বেশি সহজ করে লিখতে পেরেছিলেন। আসলে লেখার মধ্যে একটি মানুষই ফুটে ওঠে। সেদিক দিয়ে ‘বীরবল’ প্রমথ চৌধুরী এবং

তাঁর রচনা একার্থক। কিন্তু ভাষা আরও সহজ এবং জীবনানুগ করবে বলে যে অঙ্গীকার তাঁর ছিল তা কিন্তু ফলপ্রসূ হয়নি। এই সব খুঁটিনাটি দিকগুলি বাদ দিলে সাহিত্যিক আদর্শ এবং ভাষাগত পরিবর্তনের (ে ত্রে নতুন কালকে আহ্বান করে এনেছেন তিনি। আমাদের জাতিগত মানসিক জড়তার বি(দ্ধে অবিরত সংগ্রাম করেছেন। এ ব্যাপারে ফরাসি সাহিত্য তাঁকে বিশেষভাবে প্রাণিত করে থাকবে। সেই সঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতচন্দ্রও আছেন। সংস্কারের বি(দ্ধে সংগ্রামের প্রেরণা 'কল্লোল' গোষ্ঠীর লেখকেরা বিশেষ করে প্রমথ চৌধুরীর কাছ থেকেই উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন।

16.6.3 বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (1870-1899)

রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথের আয়ু মাত্র ঊনত্রিশ বছরের। 'চিত্র ও কাব্য' (1301) তাঁর একমাত্র প্রকাশিত প্রবন্ধ গ্রন্থ। এর বাইরে আরও কিছু প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। তাঁর গদ্যপ্রবন্ধ সম্পর্কে রবীন্দ্র-সুহৃদ্ প্রিয়নাথ সেন মন্তব্য করেছিলেন, 'ভারতীতে প্রকাশিত বলেন্দ্রনাথের যে সকল গদ্যপ্রবন্ধ এখনও পুস্তকাকারে বাহির হয় নাই, ভাবগৌরবে এবং রচনাসৌন্দর্যে তাহারা বাংলা সাহিত্যে অতুলনীয়। সে গদ্য সকল ব্যথা কহিতে জানে, সকল ভাব প্রকাশ করিতে পারে। তাহার অভিধান যেমন বিস্তৃত, তাহার ছন্দও তেমনি সুমধুর।' প্রকৃতই বস্তুর যথাযথ উপস্থাপনার সঙ্গে কবিমনের একান্ত মৃণ্ময় গীতিকাব্যিক অনুভব ও সৌন্দর্যচেতনার সমন্বয় ঘটিয়েছেন তিনি। ভাষার চিত্রময়তা, শব্দের উজ্জ্বলতা তাঁর প্রবন্ধের উল্লেখ্য দিক। চিন্তার থেকে ব্যক্তি(গত অনুভবেরই প্রাধান্য এখানে সমধিক। স্বাভাবিক জীবনসীমা লাভ করলে বলেন্দ্রনাথের হাতে বাংলা প্রবন্ধ আরও সমৃদ্ধ হত।

16.6.4 অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (1871-1951)

চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভাষারও এক অসামান্য চিত্রকর। শব্দ দিয়ে ছবি এঁকেছেন তিনি। কখনো রূপকথার, কখনো ইতিহাসের, কখনো প্রকৃতির, কখনো বা আটপৌরে জীবনের। সব জায়গাতেই রঙ্ লেগে আছে। সরস রোমান্টিকতা এর মধ্যে ওতপ্রোত রয়েছে। তাঁর '(ীরের পুতুল' এবং 'শকুন্তলা' ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে প্রকাশিত হয়। 'বাংলার ব্রত' (1908) 'রাজকাহিনী' (1909), 'ভূতপত্রীর দেশ' (1915), 'খাজাঞ্চির খাতা' (1916), 'আলোর ফুলকি' (ভারতী-1326) এবং 'বুড়ো আংলা'র (মৌচাক-1327) মত রচনায় রূপকথাই যেন হাজির নতুন বেশে। সব কিছুকেই উলটে-পালটে অদ্ভুত রসসৃষ্টিতে তাঁর তুলনা নেই। তিনি যখন 'বাগী(রী শিল্পপ্রবন্ধাবলী' (1948), 'জোড়াসাঁকোর ধারে' (1943), 'ঘরোয়া' (1941)-র মত অন্য বিষয় ও স্বাদের গ্রন্থ রচনা করেন তখন সেখানেও এমন একটা সহজ সরল সৌন্দর্যময় ছবির জগৎ আঁকা যায় যা লিপি শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের প(ে ই সম্ভব। সমালোচক-ঐতিহাসিক ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'উদ্ভট খেয়াল', 'রবীন্দ্রনাথের কবিধর্ম' এবং বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্নিগ্ধ মধুর ব্যক্তি(গত অনুভূতি' এই তিনের যেন যোগফল তিনি। এর সঙ্গে ছিল এক অনাসক্তি(র বোধ, কোথাও তিনি জড়িয়ে যান না। এমন কি নিজের সৃষ্টিতেও তাঁর তেমন মায়া নেই।

অবনীন্দ্রনাথ শুধু প্রথম শ্রেণীর 'শিল্পী' নন, রূপকথাকারও বটে। সুন্দরের সঙ্গে অসঙ্গতির যুগলমিলনে যে উদ্ভট রসের সৃষ্টি করেছেন, চমৎকারিত্বে আগে বা পরে তার তুলনীয় কোনো রচনা প্রায় নেই বললেই চলে।

16.6.5 মোহিতলাল মজুমদার (1888-1952)

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষ থেকে বাংলা সমালোচনার ে(ত্রে এক বিশিষ্ট ব্যক্তি(ত্ব হলেন কবি মোহিতলাল মজুমদার। একসময়ে 'ভারতী' পত্রিকার লেখক, পরে 'কল্লোল' গোষ্ঠীতেও যোগ দিয়েছিলেন। 'সত্যসুন্দর দাস' ছদ্মনামে একসময়ে লিখেছেন তিনি। তাতে নিন্দা ও প্রশংসা দুয়েরই অধিকারী হয়েছেন। শিল্প ও সাহিত্য বিচারের আদর্শ হিসেবে তিনি গ্রহণ করেছেন ম্যাথু আর্নল্ড এবং ওয়ালটার পেটারের সাহিত্য বিচার পদ্ধতি। রবীন্দ্রনাথেরও তীব্র সমালোচনা করেছেন তিনি এবং তা তাঁর নিজস্ব সাহিত্যিক আদর্শের পরিপ্রে(তেই। মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র এবং শরৎচন্দ্রের প্রতি ছিল তাঁর বিশেষ অনুরাগ। 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' (1936), 'সাহিত্য কথা' (1938), 'সাহিত্য বিতান' (1942), 'শ্রী মধুসূদন', 'বাংলার নবযুগ', 'সাহিত্য বিচার' তাঁর এ সংত্র(ান্ত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, রসবোধ এবং বাঙালি জীবনের সঙ্গে একাত্মতাবোধ, মোহিতলালের সাহিত্যসমালোচনাকে দিয়েছে স্বাতন্ত্র্য। জীবনের আদর্শ এবং সাহিত্যিক আদর্শকে তিনি এক করে দেখেছিলেন। কিছু বিপত্তি হয়তো এতেই ঘটে থাকবে। অন্তত বিরোধীদের কাছে।

বাংলা প্রবন্ধ বা সমালোচনা সাহিত্যের বৈচিত্র্য ও বিস্তৃতি এখন বিপুল। অজিতকুমার চত্র(বর্তী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, নলিনীকান্ত গুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, সুশীলকুমার দে, সুধীরকুমার দাশগুপ্ত, শশিভূষণ দাশগুপ্ত এ(ত্রে উজ্জ্বল নাম। আছেন অন্নদাশংকর, ধূর্জটিপ্রসাদের মত মনীষী রচনাকারও। বাংলায় দর্শন, বিজ্ঞানের আলোচনা এখনও তেমন প্রসার লাভ করেনি। কিন্তু চিন্তামূলক নিবন্ধ, ইতিহাস সংত্র(ান্ত আলোচনা এবং সমালোচনা সাহিত্যের ে(ত্রে আমরা যে বহুদূর অগ্রসর হয়েছি এতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

16.7 উপন্যাস ও ছোটগল্প

রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে দুজন কথাসাহিত্যিক বিপুল প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। একজন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, অন্যজন শরৎচন্দ্র। দুজনেই তাঁর শিষ্যপ্রতিম। প্রথমজন সরাসরি রবীন্দ্র-নির্দেশেই কথাসাহিত্য রচনায় ব্রতী হন। শরৎচন্দ্রও কমবেশি এই পরিমণ্ডলেরই লেখক। তা সত্ত্বেও শেষোত্ত(জন বিশেষ করে সে সময়ে এতটাই প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন যে একদল পাঠক তাঁকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের প্রতিস্পর্ধী এক সাহিত্যপ্রতিভা হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন। এসব বাদ দিলেও যে কথা আমাদের সাহিত্যে স্থায়ী মূল্য পেয়েছে, তাহল সহজ সরল মাধুর্যেই ফুটে উঠেছে এঁদের সৃষ্টির চরিত্রগুলি। মনে হয় তা যেন আমাদের কত চেনা কখনও বা নিজেদেরই কেউ বলে মনে হয় অথবা নিজেরাই সেই কুশীলব। লেখক ও পাঠকের মধ্যে মূলত গড়ে ওঠে এক অদ্ভুত আত্মীয়তার বোধ।

16.7.1 প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (1873-1932)

বাংলা কথাসাহিত্যে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। তাঁর রচিত উপন্যাসের সংখ্যা চৌদ্দো এবং গল্পসংকলন গ্রন্থের সংখ্যা বারো। সহজ সরল সর্বজনীন আবেদন তাঁর রচনাকে অন্য এক মাত্রা দিয়েছে। এ ব্যাপারে তাঁকে উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তাঁর উপন্যাসগুলি হল 'রমাসুন্দরী' (1908), 'নবীন সন্ন্যাসী' (1912), 'রত্নদীপ' (1915), 'জীবনের মূল্য' (1922), 'সিন্দুরকৌটা'

(1919), 'মনের মানুষ' (1922), 'আরতি' (1924), 'সত্যবালা' (1925), 'সখের মিলন' (1927), 'সতীর পতি' (1928), 'প্রতিমা' (1929), 'বিদায়বাণী' (1933), 'গরীব স্বামী' (1938) এবং 'নবদূর্গা' (1938)।

এগুলির মধ্যে 'রমাসুন্দরী', 'নবীন সন্ন্যাসী', 'রত্নদীপ' ও 'সিন্দুরকৌটা' এক সময় খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করে। পল্লীবাংলার জীবন, পারিবারিক সুখ-দুঃখের বিচিত্র রূপই তাঁর কথাসাহিত্যে জায়গা করে নেয়। জীবনের জটিল রূপ বলতে যা বুঝি বা হৃদয় সম্পর্কের নানান কাটাকুটি খেলা তথা আবর্ত—তাঁর গল্পে তার পরিচয় নেই। মধ্যবিত্ত জীবনকথার একটা সীমিত পরিসরেই তাঁর বিচরণ। প্রভাতকুমারের 'রত্নদীপ' উপন্যাসের কাহিনীবৃত্তে ঘটনাধারার যোগাযোগজনিত চমৎকারিত্ব যেমন আছে সেই সঙ্গে পরিণামে আছে এক অদ্ভুত বিষণ্ণতা, সেই সঙ্গে নাটকীয়তাও। 'সিন্দুরকৌটা'-র মত উপন্যাসে বিজয়-সুশীলার প্রেমের কাহিনীর মিলনাত্মক পরিণতি পাঠক মনে এক তৃপ্তির আবেশ এনে দেয়। তত্ত্ব, তর্ক, আবর্ত বা জটিলতাহীন এই ধরনের রচনা পাঠকের কাছে চিরকালই প্রীতিপদ।

প্রভাতকুমারের উপন্যাস সাধারণভাবে উপভোগ্য। যদিও টানা কাহিনী হিসেবে খুব একটা সুখপাঠ্য সব সময় নয়। তা ছাড়া উপন্যাসের উপযুক্ত(একটা সমগ্র রূপও ঠিক তৈরি হয়ে ওঠে না। সীমিত পরিসরেই তাঁর কুশীলবদের যাওয়া-আসা। এই কারণেই ঔপন্যাসিক হিসেবে বাঞ্ছিত সার্থকতা তাঁর সব সময় আসেনি। যদিও পাঠকদের কাছে তা খুবই প্রীতিপ্রদ হয়েছিল।

প্রভাতকুমারের ছোটগল্প বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ। সহজ সরল এবং সরস ভঙ্গিতে তা পরিবেশিত হয়েছে। যদিও জটিল জীবনবোধ বলতে যা বোঝায় তা উপন্যাসের মত এই গল্পগুলিতেও নেই। তাঁর গল্পসংকলনগুলির মধ্যে 'নবকথা' (1899), 'ষোড়শী' (1906), 'দেশী ও বিলাতী' (1909), 'গল্পাঞ্জলি' (1913) , 'গল্পবীথি' (1916), 'গহনার বাক্স' (1921), 'হতাশ প্রেমিক' (1923), 'জামাতা বাবাজী' (1931) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গল্পরচনার ে(ত্রে প্রথম দিকে তিনি রবীন্দ্রনাথের অনুসরণ করলেও পরে নিজের বিষয় ও আঙ্গি ক তৈরি করে নেন। এই গল্পগুলির প্রধান আবেদন—আবেগ ও সংবেদনশীলতায়। প্রতিদিনের সুখ-দুঃখময় জীবনই তাঁর বিষয়। গল্পের শরীরে এর সঙ্গে তিনি জুড়ে দেন সেই প্রসাদগুণ এবং গতিধারার ঐ(র্য যাতে পাঠকের কৌতূহল শেষ পর্যন্ত বজায় থাকে। আর এইভাবেই তিনি পাঠকের গোচরে আনেন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর একেবারে প্রথম দিককার বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের বি(স্ত ছবি। নির্মল হাস্যরস বা হিউমারও তিনি প্রয়োগ করেছেন অনায়াস দ(তায়। আমরা মনে করতে পারি 'বলবান জামাতা' বা 'রসময়ীর রসিকতা'-র মত গল্প। 'মাষ্টার মহাশয়', 'প্রণয় পরিণাম', 'বিবাহের বিজ্ঞাপন' গল্পগুলির নির্মল আনন্দ পাঠকচিত্তে চিরকালের সামগ্রী হয়ে আছে।

ক(ণরস সৃষ্টিতেও প্রভাতকুমারের সাফল্য অবিসংবাদিত। তাঁর 'দেশী ও বিলাতী' গল্প সংগ্রহের 'ফুলের মূল্য' এবং 'মাতৃহীন' গল্প দুটির আবেদন সর্বজনীন। 'আদরিণী', 'দেবী', 'কাশীবাসিনী' গল্পগুলিও এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। 'আদরিণী'র সেই হাতিটি আজও বেঁচে আছে আমাদের মধ্যে প্রতিদিনের জীবনযাপনের একজন অন্যতম অংশীদার হিসেবে। কুসংস্কারের নির্মম রূপ রয়েছে 'দেবী' গল্পে। কালীকিঙ্করের অন্ধসংস্কার কীভাবে পুত্রবধূ দয়াময়ীকে দেবীতে রূপান্তরিত করে তাঁর জীবনে নিয়ে এল ক(ণ পরিণতি এই গল্পের বিষয়বস্তু তাই।

ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমারের অবদান পাঠকস্মৃতিতে হয়তো কালধর্মে ী(ণ হয়ে এসেছে, কিন্তু গল্পকার হিসেবে তিনি এখনও স্মরণীয়—এই বিংশ-একবিংশ শতাব্দীর সন্ধি(ণেও।

16.7.2 শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (1876-1938)

বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম থেকে শরৎচন্দ্রের মৃত্যু—সময়সীমার ব্যবধান একশো বছরের। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বাংলা উপন্যাস প্রকাশিত হয় 1865 খ্রিস্টাব্দে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস ('ক(ণা' নয়) 'বৌঠাকুরাণীর হাট' (1883)। এরপর 'রাজর্ষি' (1885)। 'চোখের বালি' (1902) থেকে বাংলা মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের ধারার সূত্রপাত। অন্যদিকে গ্রন্থাকারে শরৎচন্দ্রের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস হল 'বড়দিদি' (1913)। এর আগে তাঁর কিছু গল্প অবশ্য প্রকাশিত হয়েছিল। সামাজিক বা ইতিহাস-আশ্রয়ী রোমান্সগুলিতে বঙ্কিমচন্দ্রের যে জীবনবোধ প্রতিফলিত হয়েছে, তাতে আধুনিক জীবনের উদাররূপ স্বীকৃতি পেলেও তাঁর নীতিশাসিত মনের দাপটও বড় কম নয়। এ নিয়ে আমাদের সাহিত্যে একসময় যথেষ্ট বিতর্ক বা ভুলবোঝাবুঝিরও সৃষ্টি হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের শিল্পীসত্তায় এরকম অন্তর্বিরোধের অবকাশ কম ছিল। জীবনের এক পূর্ণবৃত্ত উদার মানবিক রূপই 'চোখের বালি', 'গোরা', 'চতুরঙ্গ', 'ঘরে বাইরে', 'যোগাযোগ', 'শেষের কবিতা' বা 'চার অধ্যায়'-এর মত উপন্যাসে প্রকাশ পেয়েছে। একথা বলার মধ্যে কিছুমাত্র ভুল নেই যে শরৎচন্দ্র সম্পূর্ণভাবে রবীন্দ্র-প্রভাবিত। একথা তিনি নিজেও বলেছেন বহুবার। বস্তুত যাকে আমরা নিষিদ্ধ প্রেমকাহিনী বলি, আধুনিক সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রই তার গোড়াপত্তন করেছেন। সেই ধারাতেই, এ ব্যাপারে শরৎচন্দ্র বিশেষভাবে আশ্রয় করেছেন 'চোখের বালি' এবং 'নষ্টনীড়'-এর মত রচনাকে। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভিন্নতা তাই গুণগত নয়, পরিমাণগত। ভাষা বা ভঙ্গির মধ্যে আন্তরিকতা, সাধারণ মানুষের প্রতি ভালবাসায় শরৎচন্দ্রের জিত অনেকটাই। তিনি যে তাঁর কালের অ্যাভারেজ পাঠক-পাঠিকাকে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে স্পর্শ করেন তার কারণ এই। মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরেও এই ভালবাসাতেই তিনি অমর হয়ে আছেন।

মোটকথা বাঙালি মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত সমাজের আনন্দ-বেদনার রূপকার হলেন শরৎচন্দ্র নির্যাতিত মানুষের বেদনাও এসেছে অনিবার্যভাবে। সে মানুষ অবশ্যই নারীপু(ষ দুই-ই। পরিচিত জীবন থেকেই তিনি সংগ্রহ করেছেন উপন্যাসের উপকরণ।

বিষয়বস্তুর প্রে(িতে শরৎচন্দ্রের গল্প এবং উপন্যাসের বিভাজন নিম্নরূপ এক স্নেহ-ঈর্ষা-স্বার্থবোধকেন্দ্রিক সাধারণ পারিবারিক কাহিনী। 'বিন্দুর ছেলে' (1914), 'পরিণীতা' (1914), 'নিষ্কৃতি' (1917), 'বৈকুণ্ঠের উইল' (1915), 'রামের সুমতি', পণ্ডিতমশাই (1917), 'মেজদিদি' (1915), 'বিরাজ বৌ' (1914) প্রভৃতি।

দুই সমাজনিষিদ্ধ প্রেম-ভালবাসানির্ভর কাহিনী 'বড়দিদি' (1913), 'দেবদাস' (1910) 'পল্লীসমাজ' (1916), 'শ্রীকান্ত' (প্রথম 1917, দ্বিতীয় 1918, তৃতীয় 1933, চতুর্থ 1933), 'চরিত্রহীন' (1917), 'গৃহদাহ' (1920), 'দেনাপাওনা' (1923), 'শেষপ্র(্' (1931)।

তিন বিপ্-ব আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত উপন্যাস 'পথের দাবী' (1926)।

এভাবে পর্ববিভাজন করলেও একথাটিও বলা বিশেষভাবে প্রয়োজন যে শরৎচন্দ্রের শিল্পীআত্মার সামগ্রিক প্রতিবাদী প্রকাশ ঘটেছে 'বড়দিদি', 'শ্রীকান্ত' (প্রথম-তৃতীয়) 'দেবদাস', 'চরিত্রহীন', 'দেনাপাওনা', 'পল্লীসমাজ' এবং 'শেষপ্র(্'-এর মত উপন্যাসে। এই সমস্ত উপন্যাসে আমাদের বাঙালি সমাজের প্রচলিত নীতিধর্মকেই প্র(্ করেছেন তিনি। মানুষের ব্যথা-বেদনাকে প্রত্য(করে তাদের হৃদয়বেদনা এবং মর্মের আকাঙ(াকে মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন তিনি। 'চরিত্রহীন' উপন্যাসে শরৎচন্দ্র সাবিত্রী ও কিরণময়ীকে

অসতী বলে বর্ণনা না করে তাদের অতৃপ্ত, অচরিতার্থ জীবনের প্রতি সকলের সহানুভূতি আকর্ষণ করেছেন। 'গৃহদাহ' উপন্যাসে নায়ক মহিম, নায়িকা অচলা এবং তৃতীয় ব্যক্তি(সুরেশ। অচলার দেহের তথাকথিত অশুদ্ধিকে শরৎচন্দ্র দেখেছেন উদার মানবিক দৃষ্টিতে। একথাও প্রমাণ করতে চেয়েছেন নারীর মোহাবেশ সাময়িকভাবে দাম্পত্য-নীতিতে কিছুটা ধ্বস্ত হলেও তার অবচেতন মনে স্বামীর প্রতি একধরনের সংস্কারজনিত আনুগত্য থেকেই যায়। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে আত্মজীবনীর স্মৃতিমূলক উপাদানের সঙ্গে ভ্রমণকাহিনীর রসরূপ এবং উপন্যাসের শিল্পমূর্তি সম্মিলিত হয়েছে। রাজলক্ষ্মী-শ্রীকান্তের আবাল্য প্রণয় এ উপন্যাসের ধ্রুবপদের মত। বহু পথ পরিত্র(মার অভিজ্ঞতা শ্রীকান্তের জীবন ও মনকে দিয়েছে বিস্তৃতি ও গভীরতার মাত্রা। 'দেবদাস' উপন্যাসে ভাবময়তার প্রাবল্যের মধ্যেও দেবদাস-পার্বতীর ক(ণরসপরিণামী জীবনকথার প্রকাশ ঘটেছে। 'পল্লীসমাজ'-এর রমা-রমেশের ((ত্রেও একই কথা সত্য। 'পথের দাবী'-র মত দেশপ্রেমমূলক উপন্যাসেও মানবিক প্রেম-ভালবাসা অত্যন্ত গু(ত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে।

'মহেশ' এবং 'অভাগীর স্বর্গ' দুটি উল্লেখযোগ্য গল্প। দুটি গল্পেই শরৎচন্দ্র অসাধারণভাবে প্রমাণ করেছেন যে একেবারে নিম্নবর্গের মানুষের জীবনের বেদনার সঙ্গে তাঁর পরিচয় কত গভীর ছিল। এই পরিচয়ের সূত্র-উৎস মানুষের প্রতি শরৎচন্দ্রের অবিমিশ্র ভালবাসা। এই ভালবাসাতেই তাঁর অমরত্বের আসন।

16.7.3 বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (1894-1950)

শরৎচন্দ্রের মত বিভূতিভূষণের আবির্ভাবও এক বিস্ময়কর ঘটনা। 1922 সাল থেকেই তিনি 'প্রবাসী' পত্রিকায় ছোটগল্প লিখেছেন। 'পথের পাঁচালী (1929) প্রকাশিত হবার পরই তাঁর প্রতিষ্ঠা পাকা হয়ে যায়। এর পর 'অপরাজিত' (1932)। কিন্তু এর আগেই প্রকাশিত গল্পগুলি যথেষ্ট উল্লেখের দাবি রাখে। 'উমারাণী' (1922) এবং 'পুঁই মাচা' গল্প দুটি আমাদের সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করেছে। 'মেঘমল্লার' (1931), 'মৌরীফুল' (1932), 'যাত্রাবদল' (1934) বিভূতিভূষণের উল্লেখযোগ্য গল্পসংকলন। উপন্যাসের মধ্যে উল্লেখ্য 'দৃষ্টিপ্রদীপ' (1342), 'আরণ্যক' (1345), 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' (1347), 'দেবযান' (1351), 'ইছামতী' (1356)। বাংলাদেশ এবং ভারতবর্ষের কোনো কোনো অঞ্চল উঠে এল তাঁর সৃষ্টিতে এক অসাধারণ আটপৌরে ভঙ্গিমায়। তিনি যখন ইতিহাসকে আনলেন সে ইতিহাসও আশ্চর্যভাবে আমাদের প্রতিদিনের চেনা জীবনের সঙ্গে ই যেন মেশানো। সমালোচকদের মতে 'পথের পাঁচালী' এবং 'অপরাজিত'-র মধ্যে রোলাঁ (Romain Rolland)-র জাঁ-ত্রি(স্তফ (Jean Christopher)-এর ছাপ আছে। 'আরণ্যক' উপন্যাসে প্রকৃতি এবং অদ্ভুত রহস্যচেতনা এক সঙ্গে মিশে গেছে। অলৌকিকে পৌঁছলেন 'দেবযান' উপন্যাসে। ড. সুকুমার সেন লিখেছেন, 'মুডের দিক থেকে তিনি রোমান্টিক ও লিরিকধর্মী' (বাংলার সাহিত্য ইতিহাস)। পরলোক ও প্রেততত্ত্ব সম্পর্কে 'দেবযান'-এর মত আরও একটি উপন্যাস তিনি লিখেছিলেন—'দৃষ্টি প্রদীপ'।

বিভূতিভূষণ ঔপন্যাসিকের আদর্শ, রূপরীতির প্রতি কতটা বি(স্ত ছিলেন তা নিয়ে সঙ্গত কারণেই প্র(উঠেছে। কিন্তু উপন্যাসকারের কলমে তাঁর কবিচেতনা আমাদের নিয়ে গেছে প্রকৃতির সেই অ-পূর্ব সীমানায় যার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও সম্পূর্ণ পরিচয় করিয়ে দিতে পারেননি। সেই প্রকৃতির পটে মানুষও আমাদের অনেকটাই অপরিচিত ছিল। প্রকৃতি ও জীবনের মিশ্রিত রূপের রহস্যময়তার আস্বাদ আমরা বিভূতিভূষণের রচনাতেই পেয়েছি। সমকালে এব্যাপারে তাঁর শরিক ছিলেন কবি জীবনানন্দ।

16.7.4 বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (1894-1987)

1923 সালে বিভূতিভূষণের প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় 'প্রবাসী' পত্রিকায়। এই সময় থেকে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর ছোটগল্পগুলি 'রাণুর প্রথম ভাগ' (1937), 'রাণুর দ্বিতীয় ভাগ' (1938), 'রাণুর কথামালা' (1941), 'হাতি খড়ি', 'বসন্তে' (1941), 'রাণুর কথামালা' (1942)-য় স্থান পায়। এক কবিসুলভ সৌন্দর্যবোধ এবং দার্শনিকতা এই হাস্যরসমূলক গল্পগুলিকে অন্যতর এক মাত্রা দিয়েছে। তাঁর হাস্যরসাত্মক উপন্যাসের মধ্যে উল্লেখ্য হল 'পোনুর চিঠি' (1954) এবং 'কাঞ্চনমূল্য' (1956)। 'নীলাঙ্গুরীয়' (1945), 'প্রথম পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস' ('বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'—ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)। প্রেমের ঘৃণা ও আকর্ষণের এক আশ্চর্য দ্বৈতরূপ এখানে সম্মিলিত হয়েছে 'কঠোর পরিমিতিবোধের' (ঐ) মধ্যে। এ ছাড়া রয়েছে 'রিক্সার গান' (1959), 'মিলনান্তক' (1959), 'নয়ন বৌ' এবং 'রূপ হল অভিশাপ' (1961)-এর মত উপন্যাসও। বিষয়বস্তু এখানে অপে(াকৃত গম্ভীর। উদ্বাস্তুসমস্যা নিয়ে লিখেছেন 'পঞ্চপল্লব' (1371)। সং(পে তাঁর শক্তি(র উৎস এবং জীবন পর্যবে(ণের পরিধি সাধারণ ঔপন্যাসিকের থেকে অনেকটাই পৃথক। বাংলা উপন্যাসের ধারায় তিনি প্রকৃতই নতুন রসের অধ্যায় সংযোজনা করেছেন।

16.7.5 তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় (1898-1971)

ঔপন্যাসিক হিসেবে তারাশংকরের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে কোনো সংশয় নেই। 'কল্লোল' পত্রিকায় তাঁর আবির্ভাবের সময়েই বাঙালি পাঠক তাঁকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। রাঢ়-বাংলার আঞ্চলিক বিশিষ্টতার সঙ্গে সেখানকার মানুষগুলিও তাদের বাসনা-কামনা, সুখ-দুঃখ সমেত জীবন্তভাবেই উঠে এসেছে তাঁর সৃষ্টিতে। বিশেষ করে বীরভূমের সাধারণ জীবনের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন তিনি। নিজে ছোট মাপের জমিদার বংশের সন্তান। সামন্ততন্ত্রের (য় ও লুপ্তি এবং নতুন কালের আবির্ভাবের দ্বন্দ্ব তাঁর উপন্যাস ও গল্পে অসাধারণভাবে বাঙময় হয়েছে। গভীর বেদনার সঙ্গেই তারাশংকর এর রূপ দিয়েছেন। সেই সঙ্গে মহাত্মাজির অহিংসা-সত্যাগ্রহের পথে যে স্বাধীন ভারতবর্ষের আবির্ভাব সমাসন্ন হয়ে উঠেছে সেই আলোড়ন-প্র(াভেরও তিনি মহান শিল্পী। বিংশ শতাব্দীর মধ্যপর্বের বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষকে তিনি এইভাবেই নিয়ে এসেছেন তাঁর সৃষ্টির প্রাঙ্গণে। ব্রাত্য মানুষ, ব্রাত্য জীবনের সেখানে অবারিত নিমন্ত্রণ।

'চৈতালী ঘূর্ণি' (1929), 'নীলকণ্ঠ' (1930), 'রাইকমল' (1935), 'আগুন' (1937), 'ধাত্রীদেবতা' (1937), 'কালিন্দী' (1937), 'কবি' (1941), 'গণদেবতা' (1942), 'পঞ্চগ্রাম' (1943), 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' (1947), 'আরোগ্য নিকেতন' (1952), 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' (1952) তারাশংকরের উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। 'ছলনাময়ী' (1936), 'জলসাঘর' (1937), 'রসকলি' (1938), 'প্রসাদমালা' (1946) তাঁর উল্লেখ্য গল্প সংকলন। তাঁর গল্পেরও বিষয়বস্তু দ্বন্দ্বদীর্ণ বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ।

মাঝে মাঝে অনাবশ্যক মন্তব্য এবং দার্শনিক চিন্তার গু(ভার বিশেষ করে তাঁর উপন্যাসের অনায়াস গতিকে যে মাঝে মাঝে (দ্ধ করে সে অভিযোগ কিছুটা স্বীকার করতে হয়। কিন্তু এরকম কিছু বাদসাদ দিলে একথাও অবিসংবাদিত সত্য যে তাঁর সমকালীন ভারতবর্ষের সমাজমানসের রূপায়ণে মানুষের গভীর জীবনকথার কথকথাতে তাঁর কোনো তুলনা নেই।

16.7.6 বনফুল (1899-1979)

পেশায় চিকিৎসক, প্রকৃত নাম বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। ভাগলপুরের মানুষ। অসাধারণ কৃতিত্ব অণুগল্প রচনায়। এ জিনিসের সঙ্গে বাঙালি পাঠকের পরিচয় ছিল না। তাঁর গল্পসংগ্রহের মধ্যে 'বনফুলের গল্প' (1936), 'বৈতরণী তীরে' (1931), 'বাহুল্য' (1943) এবং 'অদৃশ্য লোক' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর চিকিৎসাবিদ্যা তাঁর উপন্যাসের বিষয় ও বিন্যাসে দিয়েছে স্বাতন্ত্র্যের মাত্রা। মানুষের জীবন সম্পর্কে তাঁর অভিনিবেশ শিল্পী এবং বৈজ্ঞানিক দুই সত্তার যুগলবন্দী। তাঁর বিশিষ্ট উপন্যাসগুলির মধ্যে আছে 'তৃণখণ্ড' (1935), 'কিছু(ণ' (1937), 'দ্বৈরথ' (1937), 'নির্মোক' (1940), তিন খণ্ড 'জঙ্গম' (প্রথম খণ্ড 1943) 'ডানা' (1948), 'স্থাবর' (1951), 'পঞ্চপর্ব' (1954), 'লক্ষ্মীর আগমন' (1954), 'মানসপুর' (1971) ইত্যাদি।

রসসৃষ্টিতে বনফুল শিল্পী। সাহিত্যের অনেক শাখাতেই দিয়েছেন অসাধারণ সামর্থ্যের পরিচয়। তাঁর লেখক প্রতিভার একটা বিশিষ্ট দিক অজস্রতা। সেই সঙ্গে রয়েছে বৈচিত্র্য ও নির্মাণকৌশল। তাঁর প্রভূত পরিমাণে অনুশীলিত মন, তাঁর পরী(াপ্রাণ বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনের প্রতিবেশ এবং বাইরের বিন্যাস সম্পর্কে আগ্রহ, নতুন নতুন পরিকল্পনার চমকপ্রদ আবেদন—সব মিলিয়ে বুদ্ধির ি(প্রতা তাঁকে আধুনিক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান দিয়েছে। এককথায় নতুন কালের বিজ্ঞানমনস্কতার সঙ্গে বনফুলের নিবিড় যোগ। যদিও সামাজিক বা পারিবারিক জীবনচর্যার প্রে(তে তিনি কিছুটা র(ণশীল ছিলেন বলেই মনে হয়।

16.7.7 শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (1909-1976)

'কল্লোল' ও 'কালিকলম' পত্রিকার নিয়মিত লেখক, শেষোক্ত(পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক। গল্পে এবং উপন্যাসে নিয়ে এসেছিলেন নতুন সুর যা সমাজের সার্বিক অসুস্থতার প্রতিবাদী। প্রতিদিনের তুচ্ছ জীবন-কথাকেই তিনি নিয়ে এসেছেন তাঁর সৃষ্টির জগতে এবং এ ব্যাপারে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর কিছুটা সাদৃশ্যও আছে। যদিও তা একই সঙ্গে অসাধারণভাবেই বাস্তব। 'প্রবাসী' পত্রিকায় 'রেজিং রিপোর্ট' (1923) , 'বলিদান' (1923), 'কল্লোল' পত্রিকায় 'মা' (1923), 'নারীর মান' (1923) তাঁকে প্রাথমিক প্রতিষ্ঠা দেয়। 'কয়লাকুঠি' (1930), এবং 'দিনমজুর' (1932) সংকলন গ্রন্থের এই গল্পগুলি আঞ্চলিক উপন্যাসের সূচনা করেছে। 'অতসী' (1925), 'নারীমেধ' (1928), 'বধূবরণ' (1931), 'পৌষপার্বণ' (1931), 'সতী-অসতী' (1933), 'নারীজন্ম' (1934) প্রভৃতি গ্রন্থে বেশ কিছু উৎকৃষ্ট গল্প সংকলিত হয়েছে। কিন্তু 'মাটির ঘর' (1923), 'ঝড়ো হাওয়া' (1923), 'জোয়ার ভাঁটা' (1924), 'অনাহুত' (1931), 'অনিবার্য' (1931) প্রভৃতি উপন্যাস তুলনায় তেমন উৎকৃষ্ট নয়। 'ষোলো-আনা (1925) এদিক দিয়ে একটি ব্যতিত্র(মী উপন্যাস। গ্রাম দেবতার উৎসবকে অবলম্বন করে অতি তুচ্ছ অথচ অর্থপূর্ণ কথাই এখানে প্রকাশ পেয়েছে সহজ সরল স্বাভাবিক ভাষায়।

16.7.8 প্রেমেন্দ্র মিত্র (1904-1988)

'কালিকলম' পত্রিকার সম্পাদক গোষ্ঠীতে প্রেমেন্দ্র মিত্র ছিলেন। 'প্রবাসী', 'বিজলী' ও 'প্রগতি' পত্রিকাতেও তিনি লিখেছেন। তাঁর 'পাঁক' (1926) এবং 'মিছিল' (1933) তাঁকে আধুনিক ঔপন্যাসিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেয়। এ ছাড়া 'পঞ্চশর' (1929), 'বেনামি বন্দর' (1930), 'মৃত্তিকা' (1932) প্রভৃতি গ্রন্থে প্রথম দিকের

ছোটগল্পগুলি সংকলিত হয়েছে। ছোটগল্পের রূপ-রীতি অনুসরণ করে মানুষের জীবনের ব্যর্থতাকে এভাবে আঁকবার দুরূহ শক্তি(খুব কম কথাশিল্পীরই ছিল। কবিতার মত গদ্যেও প্রেমেন্দ্র স্ব-প্রতিষ্ঠ।

16.7.9 মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (1908-1956)

'দিবারাত্রির কাব্য' (1935) এবং 'পুতুলনাচের ইতিকথা' এই দু'খানি উপন্যাস প্রকাশের পরেই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত হয়। এর অভিনবত্ব পাঠকদের অভিভূত করেছিল এবং 'বোঝা গিয়েছিল যে ইনি এমন একজন মৌলিক লেখক যাঁর নিজের স্বতন্ত্র ছক্‌কোণ ও বিশিষ্ট অভিত্র(মে আছে' (বাংলার সাহিত্য ইতিহাস—ডঃ সুকুমার সেন)। মানুষের ভেতরের আলো-আঁধারির রূপকার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। এ ব্যাপারে তিনি পশ্চিমী মনস্তত্ত্ববিজ্ঞানের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। এই বই দুটি ছাড়া আরো যে সমস্ত গল্প সংকলন ও উপন্যাস রচনা করেছিলেন তার মধ্যে 'অতসী মামী' (1935), 'জননী' (1935), 'পদ্মানদীর মাঝি' (1936), 'প্রাগৈতিহাসিক' (1937), 'মিহি ও মোটা কাহিনী' (1938), 'সহরতলী' (1940-41), 'হলুদপোড়া' (1954), 'চতুষ্কোণ' (1948), দুখণ্ড 'সোনার চেয়ে দামী' (1951-52), 'হরফ' (1955), 'হলুদ নদী সবুজ বন' (1956) প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

'উত্তরকালের গল্পসংগ্রহ'-এ মানিক-প্রতিভার কিছু গুণগত পরিবর্তন দেখা যায়। রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি আনুগত্য তাঁর গল্পের পরিণামকে যে কিছুটা ফরমায়েসি করে তুলেছে তাতে সংশয় নেই। মানসিক উৎকেন্দ্রিকতা তাঁর বেশ কিছু রচনাকে নষ্ট করে ফেলেছে। প্রচণ্ড শক্তি(র সঙ্গে এইটি তাঁর গভীর দুর্বলতাও বটে।

16.8 সারাংশ

রবীন্দ্রকালীন এবং রবীন্দ্র-উত্তর বাংলা সাহিত্যের একটি সংি(প্ত পরিচয় এতে বিবৃত হয়েছে। প্রথমে 'কাব্য-কবিতা' আ(রিক অর্থে রবীন্দ্র-অনুসারী কবিদের কাব্যপরিচয়ের একটি সংি(প্ত বৃত্তান্ত এতে উপস্থিত। আলোচনার বৃত্তে এসেছেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী, ক(ণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক এবং কালিদাস রায়ের মত কবিরা। এরপর আলোচনায় এসেছে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার এবং নজ(ল ইসলামের মত কবিদের কাব্য-কবিতা। রবীন্দ্রনাথের পরিমণ্ডল থেকে কতটা এঁরা বার হয়ে আসতে পেরেছেন, সেই বিবরণ। এরপর 'কল্লোল', 'কালিকলম', 'প্রগতি', 'পরিচয়'-এর সূত্রে বাংলা কাব্যে যে রবীন্দ্রবিরোধিতার ঘোষিত অধ্যায় শু(হল—তার বিবরণ। কবিদের মধ্যে আছেন জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চত্র(বর্তী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু(দে এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়। বাংলা কাব্যে যতার্থ রবীন্দ্রবিরোধী আধুনিকতার সূচনা হল এখান থেকে, যদিও বিরোধিতার তর-তম আছে।

'প্রবন্ধ-নিবন্ধ' অংশে আলোচিত হয়েছে রবীন্দ্রসমকালীন পর্বের কয়েকজন অগ্রগণ্য প্রাবন্ধিকের রচনাকর্মের বিবরণ। আলোচনার বৃত্তে রয়েছেন—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, প্রমথ চৌধুরী, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মোহিতলাল মজুমদারের মত লেখকেরা। প্রবন্ধকার হিসেবে এঁদের বিশিষ্টতার কথাই সংি(পে বলা হয়েছে।

অতঃপর উপন্যাস ও ছোটগল্প। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গল্প এবং উপন্যাসই এখানে আলোচিত।

16.9 অনুশীলনী

1. নীচের প্রশ্নগুলির অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন
   (ক) কোন্ তিনটি পত্রিকায় প্রথম রবীন্দ্রবিরোধিতার আহ্বান জানানো হয়?
   (খ) যতীন্দ্রমোহন বাগ্চীর তিনটি কাব্যগ্রন্থের নাম করুন।
   (গ) রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর তিনটি প্রবন্ধগ্রন্থের নাম করুন।
2. নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন
   (ক) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের কয়েকটি গল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।
   (খ) 'শ্রীকান্ত', 'দেবদাস' এবং 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের বিশিষ্টতা কোথায়?
   (গ) ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় কোথায় স্বতন্ত্র তা আলোচনা করুন।
3. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন
   (ক) কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত অথবা মোহিতলাল মজুমদারের কবিকর্মের পরিচয় দিন।
   (খ) বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীর অবদান আলোচনা করুন।
   (গ) বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্যকর্মের পরিচয় দিন।

16.10 গ্রন্থপঞ্জি

1. বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
2. বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা (আধুনিক যুগ)—ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
3. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (চতুর্থ-সপ্তম খণ্ড)—ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
4. আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত—ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
5. বাংলা ছোটগল্প—ড. শিশিরকুমার দাস
6. রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজ—ড. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়
7. আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়—ড. দীপ্তি ত্রিপাঠী
8. আধুনিক বাংলা কাব্য—তারাপদ মুখোপাধ্যায়

একক 17 ❑ স্বাধীনতা, দেশভাগ ও তারপর

গঠন

17.0 উদ্দেশ্য
17.1 প্রস্তাবনা
17.2 স্বাধীনতা, দেশভাগ ও তারপর
17.3 কবিতা ও কবি
17.4 উপন্যাস ও ছোটগল্প
17.5 নাটক গণনাট্য আন্দোলন ও বাংলা নাটক
17.6 সারাংশ
17.7 অনুশীলনী
17.8 গ্রন্থপঞ্জি

17.0 উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়লে আপনি যা জানতে পারবেন তা হল

- স্বাধীনতা, দেশভাগ ও তার পরবর্তী পর্বের কবিতার পরিচয়
- উপন্যাস ও ছোটগল্পের প্রতিনিধিস্থানীয় কয়েকজনের রচনার সংি(প্ত বিবরণ
- নাটকের কথা।

17.1 প্রস্তাবনা

স্বাধীনতার কিছু আগে, স্বাধীনতা সমকালীন ও তার পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের চারটি শাখার সংি(প্ত বিবরণ এখানে রয়েছে। কাব্য-কবিতা, উপন্যাস-ছোটগল্প এবং বিশেষ করে গণনাট্য আন্দোলনের কয়েকজন উল্লেখযোগ্য নাট্যকারের রচনার সংি(প্ত পরিচয় এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

17.2 স্বাধীনতা, দেশভাগ ও তারপর

1941 সালে রবীন্দ্রনাথের জীবনাবসান। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ প্রবল বিত্র(মে হানা দিয়েছে ভারতবর্ষে। এরই মধ্যে পরপর ঘটেছে বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলন, সুভাষচন্দ্রের 'আজাদ হিন্দ বাহিনী'র বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম, মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দুই জাতির পৃথকত্বের স্বীকৃতি, দেশ বিভাগ, মুসলমান ও অ-মুসলমান রাষ্ট্রের সৃষ্টি, উদ্বাস্তু জীবনের গ্-ানি, দেশীয় ধনিক শ্রেণীর নএ(র্থক রূপ, শ্রমজীবী মানুষের সংঘবদ্ধ হবার চেষ্টা, ধর্মঘট ও বেকারজীবন, দুর্নীতিগ্রস্ত (মতালোভী রাজনীতির বিস্তার নির্বাধ—সব মিলিয়ে এক হতাশার ছবি। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে কমিউনিস্ট পার্টির পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ত(ণ প্রজন্ম। সেখানেও বিবাদ, দ্বন্দ্ব অতি ও মধ্য পন্থীদের সঙ্গে। স্বপ্নপূরণ হবার এখনও অনেক বাকি। যেটি সম্পূর্ণ হয়েছে সেটি হল—ভারতবর্ষের

রাজনীতি বা অর্থনীতিতে বাঙালির নেতৃত্বহীনতা। মহাত্মাজির সময় থেকেই বাঙালি অবশ্য তা প্রত্য(করেছে। এত দৈন্য এবং স্বপ্নভঙ্গের মধ্যেও বাঙালির সাহিত্যসৃষ্টি কিন্তু নষ্ট হয়নি। চিন্তা সংস্কৃতির সে আজও এক অর্থে নায়ক। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরও সে প্রত্য(করেছে তারাশংকর, বিভূতিভূষণ, মানিক-এর মত সাহিত্য প্রতিভা(রবিশংকর, সত্যজিতের মত শিল্পীব্যক্তি(ত্ব, অমর্ত্য সেনের মত বিশ্রুতকীর্তি অর্থনীতিবিদ্। বাঙালি এই সৃষ্টির (ে ত্রে অন্তত মৃত্যুঞ্জয়। মন্বন্তর এবং উদ্বাস্তু স্রোত এই ভাষাভাষী মানবগোষ্ঠীর প্রাণসম্পদ শেষ পর্যন্ত নষ্ট করতে পারেনি।

17.3 কবিতা ও কবি

পূর্বতন কবিতার ধারাই নানাভাবে বয়ে গেছে। কবিকিশোর সুকান্ত ভট্টাচার্যের (1926-47) স্বাধীন ভারতবর্ষকে দু'চোখ ভরে দেখার ঠিক সৌভাগ্য হয়নি। মাত্র একুশ বছর বয়সের মধ্যেই তিনি যে প্রতিভার পরিচয় রেখেছেন তা বিস্ময়কর। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার শোষণের বি(দ্ধে সংগ্রাম ঘোষণাই তাঁর কবিতার মূল সুর। অনেকেই তাঁর মধ্যে বিরাট সম্ভাবনা প্রত্য(করেছিলেন। অকাল মৃত্যু সেই সম্ভাবনায় ছেদচিহ্(টেনে দেয়। 'ছাড়পত্র', 'পূর্বাভাষ', 'ঘুম নেই' তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। সমাজতন্ত্রের জন্য স্বপ্ন এবং ব্যক্তি(গত জীবনের আশা-আকাঙ(া অনেক সময়ই তাঁর কবিতায় একাকার হয়ে গেছে।

কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (1920-85) বয়সে সুকান্তের চেয়ে প্রবীণ। কিন্তু তিনিও প্রতিবাদী। সে প্রতিবাদ ধনবাদী সভ্যতার শোষণ-পীড়নের বি(দ্ধে। এই সভ্যতা মানুষের ভেতরে ভেতরে যে গ্লানি আর বিচ্ছিন্নতার জন্ম দেয়, কবি তার কথাও অবিশ্রান্ত বলেছেন। তাঁর 'নির্বাচিত কবিতা'র সম্পাদক তাঁর সম্পর্কে যা বলেছেন, তা এই (ে ত্রে প্রকৃতই প্রণিধানযোগ্য "উলুখড়ের কবিতা', 'মৃত্যুত্তীর্ণ', 'লখিন্দর' কিংবা 'জাতকে'র ব্যাপ্তি জুড়েও কবি 'রাণু-র জন্য'তে যেমন, অনেক সময়েই মধ্যবিত্ত বিচ্ছিন্নতাবোধও তার অস্থির দহনে বিপর্যস্ত। কখনও আবার সীমাহীন নিরাসক্তি(ও ক্লান্তির অবসাদে অসহায়, পর্যুদস্ত।...উল্লেখ করা প্রয়োজন, নৈর্ব্যক্তি(ক ও নীরক্ত(যেমন নয় এই মানবতাবাদ, তেমনি তা প(পাতহীনও নয়। তাই তাঁর কবিতা ভ্রষ্টাচার শাসনের প্রতিবাদে, ভণ্ড নেতা-কবি-সাংবাদিককুলের মুখোশ উন্মোচনে তীব্র কণ্ঠ, (ে-যাত্মক ও নির্মম। অন্যদিকে সাধারণ, উৎপীড়িত, সংগ্রামী-শ্রমজীবী মানুষের প্রতি গভীর মমতায় ভালবাসায় তাঁর কবিতা নম্র ও স্নিগ্ধ।" স্লোগান থাকলেও বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাই শেষ পর্যন্ত কবিত্বের সিদ্ধিতে পৌঁছেছেন অনায়াসে।

শক্তি(চট্টোপাধ্যায় (1933-95) এই পর্বের এক অদ্ভুত নিয়ম শাসন না-মানা কবি। 'অস্ফুট যৌবন' (1952) তাঁর প্রথম কবিতা। তাঁর কবিতা-কাব্যকে তিনি 'পদ্য' বলতে পছন্দ করতেন। 'যেতে পারি, কিন্তু কেন যাব?' 'ছবি আঁকে, ছিঁড়ে ফেলে', 'ধর্মে আছো জিরাফেও আছো', 'অনন্ত ন(ত্রবীথি তুমি, অন্ধকার', 'চতুর্দশপদী কবিতাবলি', 'হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান', 'উড়ন্ত সিংহাসন', 'সোনার মাছি খুন করেছি', 'প্রভু নষ্ট হয়ে যাই', 'কোথাকার তরবারি কোথায় রেখেছে' তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্য। সমস্ত পুরনো মূল্যবোধকে চূর্ণ করতে চাইলেও শেষে কিন্তু জীবনসায়াহ্নে(শক্তি(রবীন্দ্রনাথেই তাঁর আশ্রয় খুঁজে পান। শক্তি(এও বলেছিলেন, পশ্চিমী ধরনের 'হাংরি' নন তিনি, তিনি স্পষ্টতই দরিদ্র দেশের একজন '(ুধার্ত'। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের (1934) কবিতাও পাঠক-চিত্ত জয়ে সিদ্ধিলাভ করেছে। জীবনের দুঃখ বঞ্চনায় কবি অসহিষ্ণু(হয়ে ওঠেন, প্রতিবাদ করতে চান, কখনও পারেন, কখনও পারেন না, এরই মধ্যে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখে

ভালবাসার স্মৃতি, ভালবাসার স্বপ্ন। সুনীল মনে প্রাণে একালের অথচ পুরনোর সঙ্গে বিচ্ছেদ নেই। 'একা এবং কয়েকজন' (1367), 'আমি কী রকমভাবে বেঁচে আছি' (1372), 'বন্দী জেগে আছো' (1375), 'আমার স্বপ্ন' (1379), 'সত্যবদ্ধ অভিমান' (1380), 'জাগরণ হেমবর্ণ' (1381), 'মন ভালো নেই' (1383), 'এসেছি দৈব পিকনিকে' (1384), 'স্বর্গনগরীর চাবি' (1387) তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ।

আধুনিক কবিতা নদীর মত। কোথাও তার ছেদ নেই। বিপুল বৈচিত্র্য আর সম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে সে অগ্রসর হয়ে চলেছে মহাসমুদ্রের দিকে। তার যাত্রাপথ যেন এক অন্তহীনতার প্রতীক।

17.4 উপন্যাস ও ছোটগল্প

পটভূমিকাগত যে উত্তরাধিকার কাব্য ও কবিতা বহন করেছে, সেই একই কথা কথাসাহিত্য সম্পর্কেও প্রযোজ্য। এই সময়ের কয়েকজন বিশিষ্ট কথাকার হলেন—প্রবোধকুমার সান্যাল, সুবোধ ঘোষ, মনোজ বসু, সমরেশ বসু, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, বিমল কর প্রমুখ লেখকবৃন্দ। সকলের সময়সীমা এক নয়। দ্বিতীয় বি(্বযুদ্ধ সমকালীন পর্বেই এঁদের অনেকের রচনার সূত্রপাত। পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠা শুধু সমকালীন মধ্যবিত্ত জীবনের (য়, গ্-ানি, অন্তর্দ্বন্দ্ব, প্রেম-পরিণয় নয়, সমাজ-রাষ্ট্র এমনকী ভ্রমণেও এসেছে বৈচিত্র্যের স্বাদ। প্রবোধকুমার সান্যালের 'অগ্রগামী' (1936), 'তুচ্ছ', 'প্রিয়বান্ধবী', 'বনহংসী' উপন্যাস এবং ছোটগল্প সংকলন 'অবিকল' উল্লেখযোগ্য রচনা। বিশেষ কোনো মতাদর্শের প্রে(িতে নয়, জীবনকে তিনি একান্তভাবেই তাঁর নিজের দৃষ্টিতে দেখবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু প্রবোধকুমার কোনোভাবেই ভাববিলাসী নন।

সুবোধ ঘোষের উপন্যাসের মধ্যে 'তিলাঞ্জলি', 'গঙ্গোত্রী' (1347) সময় সচেতন সৃষ্টি—যুদ্ধ, মন্বন্তর এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত (1945)। 'শ্রেয়সী' (1957) একটি (য়িযু(পরিবারের ছবি। আদিম সংস্কারপ্রধান জীবনের ছবি 'শতকিয়া' (1958)। এছাড়া আছে তাঁর অসামান্য গল্প সংকলন 'ফেনিল' (1941), 'পরশুরামের কুঠার', 'শুক্লাভিসার' (1944), 'জতুগৃহ' (1952)। জীবনকে সুবোধ ঘোষ শেষ পর্যন্ত দেখেছেন আশাবাদী দৃষ্টিতে।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে আছে 'দ্বীপপুঞ্জ', 'দেহমন' (1359), 'দূরভাষিণী' (1359)। মধ্যবিত্ত জীবনের আশা-আকাঙ(া, গ্-ানি-বেদনার ছবি। স্বাধীনতার আগে রচনা শু(করলেও পরবর্তীপর্বে মনোজ বসু লিখেছেন 'জলজঙ্গল' (1951), 'বৃষ্টি বৃষ্টি' (1957), 'আমার ফাঁসি হল' (1959), 'রক্তে(র বদলে রক্ত(' (1959), 'মানুষ গড়ার কারিগর' (1959), 'রূপবতী' (1960) এবং 'বন কেটে বসত'-এর মত উপন্যাস। 'স্বচ্ছন্দগতি ও জীবন পর্যবে(ণশক্তি(' তাঁর রচনার সম্পদ। বিমল করের 'দেওয়াল' (1ম, 1959, 2য় 1958) উপন্যাসে যুদ্ধ কেমন করে আমাদের জীবনকে আলোড়িত, ধ্বংস করেছে তার অনুপুঙ্খ ছবি রয়েছে। সমরেশ বসু লিখেছেন 'বি. টি. রোডের ধারে', 'গঙ্গা' বা 'ছিন্নবাধা'-র মত উপন্যাস। পরে 'বিবর', 'প্রজাপতি' এবং 'পাতক'-এর মত বিতর্কিত রচনা। অজস্র লিখেছেন তিনি। 'কালকূট' ছদ্মনামেও অন্যস্বাদের রচনা প্রকাশিত হয়েছে তাঁর। সাহিতের ঐতিহাসিকের মতে, 'অসামাজিক অবত্ত(ব্য, (চিবিরোধী জীবনের নিষিদ্ধ প্রাঙ্গণে পদচারণা করিয়া ত(ণ উপন্যাসিকের দল ব্যাপ্তিকে বাদ দিয়া গভীরতার অতলে আত্মগোপন প্রয়াসী...ইঁহাদের ছোটগল্পগুলি সংকীর্ণ(ত্রে যতটা সার্থক হইয়াছে, উপন্যাসে ততটা সার্থক হইতে পারে নাই।' (আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সং(িপ্ত ইতিবৃত্ত—ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)

17.5 নাটক গণনাট্য আন্দোলন ও বাংলা নাটক

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে এবং তার পরে বাঙালির ওপর যে আর্থ-সামাজিক দুর্যোগ-বিপত্তির ঝড় প্রবাহিত হয়েছে তার তুলনা নেই। কবিতা, গল্প এবং উপন্যাসের মত নাটকেও তার প্রতিফলন অবিরল। বিজন ভট্টাচার্য লিখেছেন 'নবান্ন'-এর মত নাটক(দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অন্তরাল', 'তরঙ্গ', 'বাস্তুভিটা', 'মোকাবিলা'(তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়া তার', 'উলুখাগড়া', 'পথিক'—সবই এই দ্বিতীয় যুদ্ধ সমকালীন এবং যুদ্ধোত্তর জীবনের বিবিধ বিপর্যয়ের দর্পণ। নাটক নেমে এসেছে একেবারে অতি সাধারণ মানুষের কাছে—তাদেরও আশা-আকাঙ(া, আনন্দ-বেদনার অবিকল প্রতিধ্বনিসমেত। বিজন ভট্টাচার্য মন্বন্তরের মধ্যেও মানুষকে দেখিয়েছিলেন 'নবান্ন' উৎসবের স্বপ্ন, সেই প্রতিরোধের কথা কখনো তির্যক, কখনো বা সরাসরি এসেছে দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তুলসী লাহিড়ীর নাটকেও। এও এক নাট্য আন্দোলন—জনসাধারণকে নিয়ে, তাদের জন্য। স্বাধীন ভারত এবং সমাজতান্ত্রিক নতুন পৃথিবীর স্বপ্নই এই সব কিছুর প্রেরণা-প্রবর্তন।

17.6 সারাংশ

স্বাধীনতা, দেশভাগ এবং তার পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের সংি(প্ত পরিচয় এখানে দেওয়া হয়েছে। 'কবিতা ও কবি' অংশে রয়েছে সুকান্ত ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শক্তি(চট্টোপাধ্যায় এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিকর্মের সংি(প্ত পরিচয়। 'উপন্যাস ও ছোটগল্প' অংশে আলোচিত লেখক হলেন প্রবোধকুমার সান্যাল, সুবোধ ঘোষ, মনোজ বসু, নরেন্দ্রনাথ মিত্র এবং বিমল কর। 'গণনাট্য আন্দোলন ও বাংলা নাটক'-এর সংি(প্ত আলোচনাও এখানে স্থান পেয়েছে।

17.7 অনুশীলনী

1. নীচের প্রশ্নগুলির অতি সংি(প্ত উত্তর দিন
   (ক) কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের নাম ক(ন।
   (খ) সুবোধ ঘোষের তিনটি উল্লেখযোগ্য গল্প সংগ্রহের নাম ক(ন।
   (গ) গণনাট্য আন্দোলনের তিনজন বিশিষ্ট নাট্যকার কে কে?
2. নীচের প্রশ্নগুলির সংি(প্ত উত্তর দিন
   (ক) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিকর্মের সংি(প্ত পরিচয় দিন।
   (খ) প্রবোধকুমার সান্যালের উপন্যাস ও গল্পসংগ্রহের নাম উল্লেখ করে তাঁর সাহিত্যধর্মের সংি(প্ত পরিচয় দিন।
   (গ) 'মন্বন্তর' কীভাবে বিজন ভট্টাচার্যকে প্রভাবিত করেছিল?
3. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন
   (ক) স্বাধীনতা ও দেশভাগ পর্বের পটভূমি আলোচনা ক(ন।

(খ) কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিকৃতির পরিচয় দিন।

(গ) মনোজ বসু, বিমল কর এবং সমরেশ বসুর সাহিত্যকর্মের মূল্যায়ন ক(ন।

17.8 গ্রন্থপঞ্জি

1. বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত—ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
2. আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত—ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
3. গণনাট্য আন্দোলনের প্রথম পর্ব—দর্শন চৌধুরী
4. বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস—অজিতকুমার ঘোষ
5. বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
6. বাংলা উপন্যাসের কালান্তর—সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়
7. আধুনিক কবিতা পরিচয় (মনীষা)—অমরেন্দ্রনাথ চত্র(বর্তী
8. তিরিশের কবিতা এবং পরবর্তী—অ(ণকুমার সরকার
9. আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়—ড. দীপ্তি ত্রিপাঠী

একক 18 ❑ সংস্কৃতি এবং তার স্বরূপ

গঠন

18.0 উদ্দেশ্য
18.1 প্রস্তাবনা
18.2 মূলপাঠ
18.3 সারাংশ
18.4 অনুশীলনী
18.5 উত্তর সংকেত
18.6 গ্রন্থপঞ্জি

18.0 উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে সংস্কৃতি বলতে কী বোঝায়, তার একটি সাধারণ পরিচয় ও স্বরূপ সম্পর্কে নানা দেশে কালে মনীষীরা কী বলেছেন—তা যেমন আপনি জানতে পারবেন, তেমনি তা থেকে সংস্কৃতি সম্পর্কে আপনার সুস্পষ্ট ধারণা জন্মাবে। পরে প্রয়োজনমত সংস্কৃতি বিষয়ে আলোচনা করতে এবং লিখতে পারবেন।

18.1 প্রস্তাবনা

প্রাণীজগতে মানুষ উন্নত। কারণ, মানুষের সংস্কৃতি আছে। ইতর প্রাণীদের সংস্কৃতি নেই। এখানেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব। সংস্কৃতি হলো সভ্যতাজনিত উৎকর্ষ। মানুষের জীবনাচরণে এই উৎকর্ষের প্রকাশ। এ প্রকাশ বহুমুখী। ভৌগোলিক পরিবেশ এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সংস্কৃতির যোগটি ঘনিষ্ঠ। সংস্কৃতি অনুশীলন সাপে(। সংস্কৃতি বদলায়, তার রূপান্তর ঘটে। কালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে সংস্কৃতি। পৃথিবীর সব দেশেরই নিজস্ব সংস্কৃতি আছে। ভারতবর্ষ এক বিশাল দেশ। সুপ্রাচীন তার সংস্কৃতি। এ সংস্কৃতি বহু বিচিত্র। আবার প্রদেশ ভেদে তার রূপভেদ আছে। বাঙালি সংস্কৃতিতে একদিকে রয়েছে ভারতীয় উত্তরাধিকার, অন্যদিকে রয়েছে বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতি-সম্পদ।

18.2 মূল পাঠ সংস্কৃতি এবং তার স্বরূপ

সুনির্দিষ্ট একটি সমাজের সমস্ত কৃত্য, সমস্ত ভাবনা এবং জীবনযাপনের চর্চা ও চর্যা—সব মিলিয়েই তার সংস্কৃতি। সংস্কার থেকে সংস্কৃতি। সংস্কার হ'লো বুদ্ধি ও ইচ্ছাতীত জীবনগত নিগূঢ় বি(্বাস ও অভিপ্রায়। সংস্কৃতি সেই সংস্কারের ভাবজীবনগত সূক্ষ্ম প্রতিরূপ। যেমন, কেবল সংস্কার থেকেই সচেতন চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই কোনো কোনো বিষয় বা কর্ম সাধিত হয়ে থাকে, তেমনিই একটি জাতির মানুষও এক অর্জিত অখণ্ড উত্তরাধিকারকে নিজেদের অজান্তেই প্রয়োগ করে থাকে এবং এই মানববৈশিষ্ট্যই তাদের সচেতন চিত্ত-ভিত্তি রচনা করে থাকে। কোনো জাতির অন্তরের সেই গোপনচারী প্রবণতা ঐতিহ্যগত মনোলোকের সেই প্রচ্ছন্ন জীবনী-শক্তি(ই সংস্কৃতি।

প্রাচ্য-প্রতীচ্যের বহু বিশিষ্ট মানুষই সংস্কৃতি নিয়ে মন্তব্য করেছেন। যেমন—রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে ও রসরচনায়

সংস্কৃতিকে ব্যবহার করেছেন 'কালচার' শব্দের প্রতিশব্দরূপে। তাঁর মতে শিল্প হচ্ছে আত্মসংস্কৃতি। সম্যক্ রূপদানই সংস্কৃতি, তাকেই বলে শিল্প। আত্মাকে সুসংযত করে মানুষ যখন আত্মার সংস্কার করে, অর্থাৎ তাকে দেয় সম্যক্ রূপ, সেও তো শিল্প। অর্থাৎ, মানুষের আত্মার সংস্কারের মধ্য দিয়ে মানুষের আত্মার সম্যক্রূপদানের ব্যাপারটিই সংস্কৃতি। এর সঙ্গে কার্লাইল কথিত "created capable of being" (মানুষের সৃষ্ট সম্পদ) ধারণাটিরও মিল ও আত্মীয়তা রয়েছে। ম্যাথ্যু আরনলড্ একেই বলেছেন "an inward operation"—অন্তরের অভিব্যক্তি(। স্মরণযোগ্য ঐতরেয় ব্রাহ্মণের উক্তি('আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি'। অর্থাৎ শিল্পসমূহের দ্বারা আত্মাকে সুমার্জিত করা। বিদ্যা আর সংস্কৃতি এক নয়। রবীন্দ্রনাথ এ দুয়ের পার্থক্য নির্দেশ করেছেন 'শেষের কবিতা'য় 'কমল হীরের পাথরটাকে বলে বিদ্যে, আর ও থেকে যে আলো ঠিকরে পড়ে, তাকেই বলে 'কালচার'।

নৃ-বিজ্ঞানী এডওয়ার্ড টাইলর 1865-তে 'কালচার' শব্দটি সর্ব প্রথম ব্যবহার করেন 1924-25 খ্রিস্টাব্দে এর প্রতিশব্দরূপে 'কৃষ্টি' শব্দটি ব্যবহার করেন যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি। আর 1922 খ্রিস্টাব্দে এক মহারাষ্ট্রীয় বন্ধুর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় culture অর্থে 'সংস্কৃতি' শব্দটির প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং ি(তিমোহন সেন ঐতরেয় ব্রাহ্মণের 'আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি' ইত্যাদি ে(-াকের সা(ে সংস্কৃতির স্বরূপ নির্দেশ করেন। পরে, প্রধানত রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টাতেই 'সংস্কৃতি'-শব্দটি সাধারণভাবে বাংলায় গৃহীত এবং অতি-প্রচলিত একটি শব্দ হয়ে ওঠে।

সুনীতিকুমার তাঁর 'ইতিহাস ও সংস্কৃতি' প্রবন্ধে বলেছেন সভ্যতা-ত(র পুষ্প সংস্কৃতি(সংস্কৃতি মানুষের আধিমানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবন তথা সামাজিক জীবনের সৌন্দর্য-সমন্বিত প্রকাশ—এককথায় তার বাইরের-ভেতরের প্রাণভোমরা। অন্যদিকে নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'কৃষ্টি-কালচার-সংস্কৃতি' গ্রন্থে সুনীতিকুমারের সংস্কৃতি-সম্পর্কিত ধারণাকে রবীন্দ্র-ধারণারই অনুসরণ বলে মনে করেছেন। তাঁর গ্রন্থের প্রস্তাবনা অংশে রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত 'সংস্কৃতি' শব্দের প্রয়োগ যুক্তি(র ভিত্তিগত দুর্বলতা আছে—এমনই একটি মত প্রকাশ করে বলেছেন কালচার বা কৃষ্টি বা সংস্কৃতি বলতে যা বোঝানো হচ্ছে, তা হচ্ছে "intellectual development refinement, improvement by training, a type of civilization (বুদ্ধিগত বিকাশ, পরিমার্জনা, অনুশীলনের মাধ্যমে উন্নতি, সভ্যতার একটি প্রকার)। এর সঙ্গে কিছুটা মিল রয়েছে অক্সফোর্ড অভিধানে উদ্ধৃত 'culture' শব্দটির অর্থের "improvement by mental or physical training, intellectual development of cultivation, (মানসিক কিংবা শারীরিক অনুশীলনের সাহায্যে উন্নয়ন, চর্চার মাধ্যমে বুদ্ধিগত বিকাশ)। অথচ রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন—(1) কৃষ্টির ে(ত্র আছে তার চাষে-বাসে, আপিসে, কারখানায়। (2) সংস্কৃতির ে(ত্র সাহিত্যে, এখানে তার আপনারই সংস্কৃতি, সে তাতে আপনাকেই সম্যকরূপে করে তুলেছে, সে আপনিই হয়ে উঠেছে [সাহিত্যের পথে]।

নীহাররঞ্জন রায় পূর্বোক্ত(গ্রন্থেরই অন্যত্র 'সংস্কৃতি' সম্পর্কে বলেছেন সংস্কৃতি জীবনের সংস্কার সাধন এবং সেই সাধনত্রি(য়ার ফলশ্রুতি। সূচনায় পশু জীবনের সঙ্গে মানব জীবনের পার্থক্য স্বল্পই। সেই জীবনের নিয়তিই এই। মানুষ আজীবন চেষ্টা করে যাবে তার জীবনকে সমস্ত আবর্জনা ও মালিন্য থেকে মুক্ত(রাখতে, তার নিজেকে সংস্কৃত করতে, সর্ববিধ উপায়ে নিজের উন্নতি সাধন করতে। সেই সংস্কৃত জীবনের ফলশ্রুতিই হচ্ছে সংস্কৃতি। সংস্কৃতির স্বরূপ-সন্ধানে নীহাররঞ্জন কেবল আত্মিক দিকটিকেই গ্রহণ করেননি, বাস্তব ও মানসিক দিকগুলিকেও যথোচিত মূল্য দিয়েছেন। এর কারণ সম্ভবত এই যে মানবসত্তাকে খুবই যুক্তি(সঙ্গত-ভাবে জৈবিক-মানসিক-

আত্মিক—তিনভাগে ভাগ করে নেওয়া যায়। আর এই তিন নিয়েই এক মানবজাতির যে পরিপূর্ণতা-উত্তরণ-পরিমার্জন, তার দ্যোতক culture বা সংস্কৃতি।

সংস্কৃতির অন্তঃকাঠামো [infrastructure] গড়ে ওঠে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপরে। সামাজিক মানুষ জীবনের সমস্ত সাধনাই এর অঙ্গ। এক কথায় জৈব প্রয়োজন, বাস্তববোধ, সৌন্দর্যবোধ, আবেগ-আকাঙ(া, মনন-কল্পনার কর্ম-কৌশলের সামগ্রিক প্রকাশই সংস্কৃতি। এর রূপ গড়ে ওঠে—বিশেষ পরিবেশ ও বিশিষ্ট জীবনধারণের প্রকৃতির ওপর। একটি বিশেষ সংস্কৃতি সৃষ্টি হয় তার ধারকদের জীবন পরিবেশ, জীবিকা-প্রণালী, জীবনযাত্রার উপকরণ এবং প্রাকৃতিক-ভৌগোলিক পরিবেশ ও সামগ্রিকভাবে সমাজ সম্বন্ধে সামগ্রিক অভিব্যক্তি(তে। একটি সংস্কৃতির বিস্তার হয় সংি(-ষ্ট জাতি/গোষ্ঠীর বস্তু ও ভাবগত সমস্ত বিষয়কে একসঙ্গে নিয়ে।

আসলে 'সংস্কৃতি মানবসমাজের জীবনচর্যার সম্যকরূপ কৃতি'। 'সংস্কৃতি'-র প্রতিশব্দ 'কৃষ্টি' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থে 'কর্ষণ-শব্দের সঙ্গে সম্পর্ক বোঝায়। মানুষের জীবনভূমি ও চিত্তকর্ষণের ফলেই কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়। খেত কর্ষণে ফসল ফলে আর মনোভূমি কর্ষণে 'বাস্তবজীবন সৌধ' বা উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎপাদন সম্পর্কের ভিত্তিতে গঠিত সমাজ কাঠামোর পটভূমিতে 'সাংস্কৃতিক উপরি সৌধের উদ্ভব ও বিকাশ' ঘটে। প্রাগুক্ত(গ্রন্থে এই সব আলোচনার মধ্য দিয়ে গ্রন্থকার এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে 'সংস্কৃতির মূলে জৈব-প্রয়োজন ও মানস-সাধনার যুগপৎ সক্রি(য়তা পরিলি(ত হয়'।

সংস্কৃতির ব্যবহারিক ও মানসিক দিক—দুটিকে আরও সুস্পষ্টভাবে এবং বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখিয়েছেন গোপাল হালদার তাঁর 'সংস্কৃতির রূপান্তর' গ্রন্থে। দুই অর্ধসত্যের মিলন-বিরোধে এক পূর্ণসত্যের অভিব্যক্তি(র কথা তিনি বলেছেন এবং সেই পূর্ণসত্যই সংস্কৃতির অভিব্যঞ্জক। তাঁর মতে সংস্কৃতির তিন অঙ্গ—(1) মূলভিত্তি material means, অর্থাৎ, 'জীবন সংগ্রামের বাস্তব উপকরণসমূহ।' যেমন ব্যবহৃত দ্রব্য, অস্ত্রশস্ত্র, আহার্য ও পানীয় পাত্র ইত্যাদি। (2) প্রধান আশ্রয় social structure অর্থাৎ, সামাজিক রূপ বা সামাজিক কাঠামো। সমাজের সদস্যদের পারস্পরিক সম্বন্ধ, রীতিনীতি, আচার-বিচার, উৎসব-অনুষ্ঠান ইত্যাদি আশ্রয়ী রূপটি। (3) মানবসম্পদ super structure অর্থাৎ, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, নৃত্য, গীতি, অভিনয় ইত্যাদি। গোপাল হালদারের পরিণামী নির্ণয় 'তাহা হইলে আমরা যে মনে করি কালচার জাতিগত, দেশগত, ধর্মগত, তাহাও যেমন অর্ধসত্য, তেমনি সাধারণভাবে আমরা যে মনে করি, কালচার মানে কাব্য, গান, চা(কলা, বড়জোর দর্শন বা বিজ্ঞান পর্যন্ত, তাহাও তেমনি অর্ধসত্য।' সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বাঙালীর সংস্কৃতি' গ্রন্থে বাঙালি সংস্কৃতির আলোচনার প্রাগুক্ত(পূর্ণসত্যের পরিচয় দিতে চেয়েই বস্তুগত সংস্কৃতি, আচার-অনুষ্ঠানমূলক সংস্কৃতি এবং মানসিক-আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি—এই তিনটি দিক থেকে বাংলার ও বাঙালির সংস্কৃতিকে ল(্য করেছেন।

18.3 সারাংশ

'সংস্কার' > 'সংস্কৃতি'। সংস্কার শব্দের দুটি অর্থ (1) পরিবেশ, ঐতিহ্য এবং সমাজবিধিসমূহ থেকে সৃষ্টি হওয়া স্বতঃস্ফূর্ত বি(্বাস বা ধারণা(এবং (2) পরিশীলিত করা। 'সংস্কৃতি'-র মধ্যে এই দুটি অর্থই নিহিত। কোনও বিশেষ একটি জাতি বা গোষ্ঠীর সব ধরনের মানসিক এবং ব্যবহারিক চর্চা ও চর্যা—সব মিলিয়েই সংস্কৃতি।

সংস্কৃতির স্বরূপ নিয়ে প্রাচীন কাল থেকে এ-অবধি বহুবিধ সংজ্ঞা নির্দেশ করা হয়েছে(যেমন

(ক) "আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি।" *(ঐতরেয় ব্রাহ্মণ)*

(খ) "কমল হীরের পাথরটাকে বলে বিদ্যে, আর ও থেকে যে আলো ঠিকরে পড়ে, তাকেই বলে কালচার।" *('শেষের কবিতা'/রবীন্দ্রনাথ)*

(গ) "সংস্কৃতি মানুষের আধিমানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবন তথা সামাজিক জীবনের সৌন্দর্য সমন্বিত প্রকাশ।" *('ইতিহাস ও সংস্কৃতি'/সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়)*

(ঘ) "সংস্কৃতি জীবনের সংস্কার সাধন এবং সেই সাধনত্রি(য়ার ফলশ্রুতি।" *('কৃষ্টি-কালচার-সংস্কৃতি'/নীহাররঞ্জন রায়)*

(ঙ) "Improvement by mental or physical training, intellectual development of cultivation". *(Shorter Oxford Dictionary)* [মানসিক কিংবা শারীরিক অনুশীলনের সাহায্যে উন্নয়ন, চর্চার মাধ্যমে বুদ্ধিগত বিকাশ।]

মানবসত্তার তিনটি ভাগ জৈবিক-মানসিক-আত্মিক। এই তিনটি নিয়ে মানুষের যে পূর্ণতা-উত্তরণ-পরিমার্জন—তারই দ্যোতক হল সংস্কৃতি। আর তার অন্তঃকাঠামো গড়ে ওঠে সামাজিক-অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপরে(বিস্তার হল সং(-ষ্ট জাতি/গোষ্ঠীর বস্তু এবং ভাবগত সমস্ত বিষয়কে নিয়ে। তবে, সংস্কৃতি বা কৃষ্টি [culture] কেবলমাত্র দেশগত, জাতিগত, ধর্মগত ঐতিহ্যের বোধ নয় যেমন, ঠিক তেমনই আবার শুধুমাত্র কাব্য, সংগীত, চিত্রকলা, দর্শন, বিজ্ঞানের মধ্যেও তার সম্পূর্ণ পরিচয় মেলে না। ঐ দুই ধরনের উপকরণের একত্র সমন্বয়ের মধ্যেই সংস্কৃতির পূর্ণাবয়ব রূপটি বিধৃত থাকে।

□ টীকা

□

আত্মসংস্কৃতি	নিজেকে অর্থাৎ নিজের সত্তাকে যা সুসংস্কৃত বা পরিশীলিত করে।
created capable of being	(পরিশীলিত) হয়ে ওঠার যোগ্যরূপে সৃষ্ট হওয়া।
an inward application	অভ্যন্তরমুখী একটি প্রয়োগ।
আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি	যে শিল্পগুলির দ্বারা আত্মা (বা সত্তা)-কে সুমার্জিত করা যায়।
ঐতরেয় ব্রাহ্মণ	ঋগ্বেদের দু'টি ব্রাহ্মণের একটির নাম ঐতরেয় ব্রাহ্মণ। বলা হয়, ভূমি দেবতার বরে ইতরার পুত্র ঐতরেয় মহিদাস ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। এর আটটি পঞ্চিকা বা বিভাগ আছে। প্রতিটি বিভাগ পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত(। প্রায় ষোলোটি অধ্যায়কে 'অগ্নিষ্মেক' থেকে ত্র(মান্বয়ে 'অগ্নিহোত্রের' শেষে রাজ্যাভিষেক প্রণালী বর্ণিত হয়েছে।
material means	বস্তুগত উপকরণ।
social structure	সামাজিক কাঠামো।
super structure	বহিঃসৌধ/বহির্কাঠামো।
বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ	বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা পরিচালিত বস্তুবাদ। বস্তুবাদ একটি দার্শনিক ধারা, যার ভিত্তি—বি(ে বস্তুময় এই বি(াস। বস্তু সত্তাই আদি, চেতনা, বস্তুর একটা ধর্ম, তা গৌণ, এবং এটি বস্তুর উপরই নির্ভরশীল।

দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিকোণ	দ্বন্দ্ব এবং সমন্বয় ত্র(মান্বয়ে ঘটে চলে—এই মর্মে যে ভাবনার অভিব্যক্তি(ঘটে, তার পরিপ্রে(িত।

18.4 অনুশীলনী

নীচের প্র(গুলির উত্তর ক(ন। উত্তর শেষে 71 পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

1. শূন্যস্থান পূরণ ক(ন
   (ক) কোনো জাতির সেই গোপনচারী প্রবণতা..... ..... সেই ..... জীবনী শক্তি(ই .....।
   (খ) মানুষের আত্মার .....মধ্য দিয়ে মানুষের .... রূপ দানের ..... সংস্কৃতি।
   (গ) কমল ..... পাথরটাকে বলে ....., আর ও থেকে যে .... পড়ে, তাকেই বলে .....।
   (ঘ) জৈব প্রয়োজনে, ..., ... আবেগ-আকাঙ(া ..... কর্ম-কৌশলের সামগ্রিক প্রকাশই .....।
   (ঙ) (গোপাল হালদারের মতে) কালচার .... তাহাও যেমন অর্ধসত্য, তেমনি আমরা যে মনে করি..... মানে কাব্য ....., বড় জোর ..... বা ..... পর্যন্ত, তাহাও তেমনি .....।
2. নীচের উদ্ধৃত বাক্য/বাক্যাংশ ঠিক না ভুল বোঝাতে টিক ( ) চিহ্নি(ত ক(ন।

	ঠিক	ভুল
(ক) জীবনযাপনের চর্চা ও চর্যা সব মিলিয়ে তার সংস্কৃতি/সংস্কার থেকে সংস্কৃতি।	☐	
(খ) (রবীন্দ্রনাথের) মতে শিল্প হচ্ছে আত্মসংস্কৃতি।		
(গ) রবীন্দ্রনাথ বলেছেন সভ্যতা-ত(র পুষ্প সংস্কৃতি।		
(ঘ) ি(তিমোহন সেন প্রথম ঐতরেয় ব্রাহ্মণ্যের সা(্যে 'সংস্কৃতি' শব্দটির প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।		
(ঙ) নৃ-বিজ্ঞানী এডওয়ার্ড টাইলর 'কালচার' শব্দটিকে সর্ব প্রথম ব্যবহার করেন। প্রতিশব্দরূপে 'কৃষ্টি কালচার' শব্দটি ব্যবহার করেন যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি।		

3. সঠিক উত্তরে টিক ( ) চিহ্নি(ত ক(ন।
   (ক) 'কৃষ্টি' শব্দটি ব্যবহার করেন
   1. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
   2. যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি
   3. নীহাররঞ্জন রায়

(খ) 'সভ্যতা-ত(র পুষ্প সংস্কৃতি'—বলেছেন
1. নীহাররঞ্জন রায়
2. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
3. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

(গ) "কালচার জাতিগত, দেশগত, ধর্মগত তাহাও যেমন অর্ধসত্য, তেমনি কালচার মানে কাব্য, গান, চা(কলা, বড়জোর দর্শন বা বিজ্ঞান, তাহাও তেমনি অর্ধসত্য"—বলেছেন।
1. গোপাল হালদার
2. নীহাররঞ্জন রায়
3. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(ঘ) "সংস্কৃতি জীবনের সংস্কার সাধন এবং সেই সাধন ত্রি(য়ার ফলশ্রুতি"—বলেছেন
1. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
2. নীহাররঞ্জন রায়
3. গোপাল হালদার

4. অর্থ বা পরিচয় লিখুন
   (ক) ঐতরেয় ব্রাহ্মণ
   (খ) দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিকোণ
   (গ) 'আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি'
   (ঘ) বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ
   (ঙ) সংস্কৃতি
5. (ক) সংস্কৃতি বলতে আপনি কী বোঝেন সং(পে আলোচনা ক(ন।
   (খ) রবীন্দ্রনাথ 'সংস্কৃতি' বলতে কী বুঝেছেন, সং(পে লিখুন।
   (গ) 'সংস্কৃতি'র সংজ্ঞায় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতামত সং(পে লিখুন।
   (ঘ) কৃষ্টি এবং সংস্কৃতি দু'টি শব্দের রবীন্দ্রনাথ পার্থক্য করেছেন কেন বুঝিয়ে দিন।
   (ঙ) নীহাররঞ্জন রায়ের 'সংস্কৃতি' সম্পর্কে মতবাদটি সং(পে আলোচনা ক(ন।

18.5 উত্তর সংকেত

1. (ক) অন্তরের, ঐতিহ্যগত মনোলোকের, প্রচ্ছন্ন সংস্কৃতি।
   (খ) সংস্কারের, আত্মার, সম্যক্, ব্যাপারটিই।
   (গ) হীরের, বিদ্যে, আলো, ঠিকরে, কালচার।
   (ঘ) বাস্তববোধ, সৌন্দর্যবোধ, মনন-কল্পনার, সংস্কৃতি।
   (ঙ) জাতিগত, দেশগত, ধর্মগত, কালচার, গান, চা(কলা, দর্শন, বিজ্ঞান, অর্ধসত্য।
2. (ক) ঠিক, (খ) ঠিক, (গ) ভুল, (ঘ) ভুল, (ঙ) ঠিক।

3. (ক) যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি
   (খ) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
   (গ) গোপাল হালদার
   (ঘ) নীহাররঞ্জন রায়

4 ও 5 উত্তর সংকেত নিষ্প্রয়োজন। পাঠ্যবস্তু ল(ক(ন।

18.6 গ্রন্থপঞ্জি

1. নীহাররঞ্জন রায় কৃষ্টি-কালচার-সংস্কৃতি।
2. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস।
3. গোপাল হালদার সংস্কৃতির রূপান্তর।

একক 19 ❑ বাঙালির সংস্কৃতি ও বাঙালি জাতি

গঠন

19.0 উদ্দেশ্য

19.1 প্রস্তাবনা

19.2 মূলপাঠ 1

19.3 সারাংশ 1

19.4 অনুশীলনী 1

19.5 মূলপাঠ 2

19.6 সারাংশ 2

19.7 অনুশীলনী 2

19.8 উত্তর সংকেত

19.9 গ্রন্থপঞ্জি

19.0 উদ্দেশ্য

এই এককটিতে বাঙালির সংস্কৃতি ও বাঙালি জাতির ইতিহাস অনুসন্ধান করতে গিয়ে কতকগুলি পুরাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক তথ্য উপস্থিত করা হয়েছে। তথ্যগুলি থেকে বাংলার ভৌগোলিক সীমায় আগত অনার্য জনগোষ্ঠীর ওপর কখন কীভাবে আর্য-প্রভাব বর্তাল তা দেখানো হয়েছে। প্রাসঙ্গিক আলোচনা থেকে আপনি বাঙালি-সংস্কৃতির ভাষাভাষীদের ঐতিহ্য ও তার জাতিসত্তা সম্পর্কে যেমন জানতে পারবেন, তেমনি সাধারণভাবে কিছু আলোচনাও করতে পারবেন(প্রয়োজনে কিছু প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব হবে।

19.1 প্রস্তাবনা

বাঙালি-সংস্কৃতির পরিচয় নিতে গিয়ে দেখা গেছে, খ্রিঃপূঃ 300 থেকে খ্রিঃ 500—এই 800 বছরের মধ্যে বাংলায় বসবাসকারী জনজাতি অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও উত্তর ভারতের মিশ্র আর্য-ভাষাভাষী এই তিনের মিলনে-মিশ্রণে সৃষ্ট বাঙালি জাতি উন্নততর আর্যভাষার চাপে তাদের মৌলিক ভাষা ত্যাগ করে মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা মাগধী অপভ্রংশকে গ্রহণ করেছে। এই সময়েই বাংলার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র বরেন্দ্রভূমিতে পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠা। তাদের সঙ্গে উত্তর ভারতের মিশ্র আর্য হিন্দুগণ বাঙালির জাতিসত্তা গঠনের সঙ্গে সংস্কৃতির ওপরও অনিবার্য প্রভাব বিস্তার করে। এই প্রে(াপটে বাঙালি জাতি ও তার সংস্কৃতির বিকাশ, বিস্তার ও বৈচিত্র্য কীভাবে সম্পাদিত হয়েছে, তার কিছু পরিচয় বর্তমান এককে দেওয়া হয়েছে। অন্তরঙ্গ পাঠের মধ্য দিয়ে আপনি এককটি থেকে বাঙালি জাতি ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে পারবেন।

19.2 মূলপাঠ 1

বাঙালির সংস্কৃতি বাঙালি জাতির সংস্কৃতি। যে জনসমষ্টি বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষা-রূপে ঘরোয়া ভাষা-রূপে ব্যবহার করে সেই জনসমষ্টিই বাঙালি জাতি। বাংলাদেশে বাংলাভাষী জনসমষ্টির মধ্যে দেশের জলবায়ু ও তার আনুষঙ্গিক ফল-স্বরূপ দেশের উপযোগী বিশেষ জীবনযাত্রার পদ্ধতিকে অবলম্বন করে মুখ্যত প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতের ভাবধারায় পুষ্ট হয়ে বিগত সহস্রাধিক বছর ধরে যে বাস্তব, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, তাকেই 'বাঙালির সংস্কৃতি' বলেছেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

বাঙালির সংস্কৃতির সঙ্গে তিনটি প্রসঙ্গ অনবচ্ছিন্নরূপে বিজড়িত। এক, বাংলা ভাষা(দুই, বাঙালি জাতি ও জাতিসত্তা(তিন, সার্বভৌমসত্তা ও প্রান্তিক সত্তাবোধ— ভারতীয় ভাবধারা ও প্রাদেশিক ভাবধারা।

বাংলা ভাষার ইতিহাস মিলন-সংগীত গাইবার ইতিহাস। সুনীতিকুমার এর তিনটি পর্যায় চিহ্নি(ত করেছেন তাঁর 'বাঙ্গালির সংস্কৃতি' গ্রন্থের 'জাতি সংস্কৃতি ও সাহিত্য'-প্রবন্ধে।

(এক) খ্রিঃ 300 থেকে খ্রিঃ পূঃ 500 পর্যন্ত—800 বছর বাংলার আর্যীকরণ অনার্যভাষা ত্যাগ করে আর্যভাষা (মধ্য ভারতীয় আর্য মাগধী প্রাকৃত) গ্রহণ করেছে বাংলার মানুষ(আবার এই সময়েই ব্রাহ্মণ্যধর্ম-সাহিত্য (পুরাণ-ইতিহাস) এবং বৌদ্ধ ও জৈন মতবাদ গ্রহণ করেছে এরা। পরিণাম— সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে পরিবর্তন এবং অস্ট্রিক-দ্রাবিড় ও উত্তর ভারতের মিশ্র আর্য—তিন জাতির মিলনে বাঙালি জাতির সৃষ্টি।

(দুই) খ্রিস্টিয় সপ্তম শতকের প্রথম পাদে সমস্ত বাংলা আর্যভাষী হয়েছে, খ্রিঃ 740-এ বরেন্দ্রভূমিতে পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে এবং বাঙালি জাতির নতুন গৌরবের অধ্যায় সূচিত হয়েছে। এই সময়ে যেমন সংস্কৃত-চর্চা দেখা গেছে, তেমনি বাংলাভাষাও স্বতন্ত্র ভাষা রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে মাগধী প্রাকৃত এবং তার অপভ্রংশ থেকে।

(তিন) খ্রিস্টিয় নবম-দশম শতকের মধ্যভাগে পাওয়া গেছে প্রাচীন বাংলা ভাষায় সৃষ্ট সাহিত্য(এখানেই প্রথম আর্য-ভাষাভাষী বাঙালি জাতিগঠনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালির সংস্কৃতির সূত্রপাত উত্তরভারতে বা নিখিল ভারতের সর্বজয়ী হিন্দুমন নিয়ে। পরবর্তীকালে খ্রিস্টিয় দশম শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় পর্বে পাল-যুগে তা আরও স্পষ্ট এবং স্বাতন্ত্র্যদীপ্ত(পাল-সেন যুগে বাঙালির সংস্কৃতির ভিত্তিস্থাপনা এবং মূল সুরটিও রচিত।

এদেশে আর্যভাষার প্রসার আর্যদের আগমনে(পঞ্জাবে আর্যভাষার স্থাপন, তারপর মধ্যদেশে প্রসার। সুদূর অতীতের অন্ধকারে বৈদিক যুগ বা তার পূর্ব থেকেই উত্তর ভারতে আর্য-দ্রাবিড়ের সংঘাত ও সম্মিলন চলছিল। অপে(াকৃত সভ্য আর্য-দ্রাবিড় উত্তর ভারতের শি(া, ভাষা ও সভ্যতার বাহন হওয়ায় প্রাচীন কাল থেকেই কন্নড়ী, তেলেগু ও তামিলে সংস্কৃতের প্রভাব পড়েছে। বাংলায়ও যে অনার্য ভাষীরা বেশ প্রবলভাবেই প্রাধান্য নিয়ে ছিল, তা বেশ বোঝা যায় বাংলাদেশের স্থানীয় নামে। এখন বাংলায় অনেক নাম আর্যরূপ দিয়েছে, অনেক নাম বদলে গেছে(কিন্তু খ্রিস্ট প্রথম হাজার বছরের মধ্যে বাংলার পরগনা গ্রাম আর নদী ইত্যাদির নামে অনার্যত্ব বা আর্য-অনার্যের মিশ্রণের চিহ্(দেখা যেত। বাংলায় পুরোনো তাম্রশাসনে পাওযা যায় এমন কিছু নাম—আউহাগড্ডি, নাড্ডিনা, সোজলন্দী, বালহিট্টা, সোব্বড়ি প্রভৃতি। এই সব নাম-রূপের মধ্যে রয়ে গেছে মহামিলনের সংগীতের সুর(এদের মধ্যে

অনার্য নামগুলি কিছুটা আর্যরূপ নিয়েছে(কিন্তু পরিত্যক্ত(হয়নি।—এসব কথা রয়েছে সুনীতিকুমারের 'সাংস্কৃতিকী' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে।

সুনীতিকুমার এই সম্মিলনের আরও সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত দিয়ে অন্যত্র বলেছেন ভারতের ইতিহাসের আরম্ভ আর্যভাষীদের আগমন থেকে(কিন্তু তার ইমারতের বুনিয়াদ হচ্ছে প্রাগার্য যুগে—ভারতের নিজস্ব দ্রাবিড় সভ্যতায়। আদিকালে আর্যেরা কখন কোন্ সময়ে নিজেদের ভাষা আর সভ্যতা গড়ে তোলে, তা জানা যায় না। অনেকের বিশ্বাস এই ভাষা, এই সভ্যতার স্রষ্টা প্রোটো-নর্ডিক [বা, আদি-নর্ডিক] নামে একটি জাতি। আদি আর্য সভ্যতা যা এদের মধ্যে বিকশিত হয়েছিল, তা সমসাময়িক মিশর, ব্যবিলন, এজিয়ান সভ্যতার কাছে দাঁড়াতেই পারে না(অনার্য জাতির সংস্পর্শে আর সাহচর্যে অর্ধবর্বর, খুব সম্ভব মিশ্র-আর্য, গ্রিক-পারশিক-হিন্দু সভ্যতা গঠনে অংশগ্রহণ করে। 'প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, কিন্তু ধর্মচিন্তা ও সভ্যতার ইতিহাস, ভারতের আর্য ও দ্রাবিড় ভাষা মুখ্যত এই আর্য-অনার্য সম্মিলনের ইতিহাস'।

তাই উত্তর ভারতের মিশ্র-আর্য দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক জাতির মিলনের মধ্য দিয়ে যখন বাঙালি জাতির সৃষ্টি, আবার আর্যভাষার মধ্যভারতীয় মাগধী প্রাকৃত এবং বাংলায় প্রচলিত মাগধী প্রাকৃতের অপভ্রংশের মিলনে স্থানীয় অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ভাষার আর্যীকরণের মধ্য দিয়ে যখন বাংলা ভাষার সৃষ্টি, এবং যখন ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ-জৈনধর্মগত আর্য-সংস্কার, সাহিত্য-রীতি-নীতি অধিগৃহীত আর জীবনের চর্চায় ও চর্যায় বিজড়িত, তখনও মিলনের-মিশ্রণের মধ্য দিয়ে যে বাঙালি সংস্কৃতির উদ্ভাবন তাতে বেজে ওঠে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতের ভাবধারার সুর—নিখিল ভারতীয় সভ্যতার-সংস্কৃতির সম্মিলনের ধর্ম-সংগীত।

আর্য-উপনিবেশের ফলে এক সময় আর্যদের ভাষা, ধর্ম, সামাজিক প্রথা ও সভ্যতার অন্যান্য দিকগুলি বাংলায় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। লুপ্ত হয়েছিল প্রাচীন অনার্য ভাষা। সমাজ গঠিত হয়েছিল বর্ণাশ্রমের নিয়মানুসারে। এর কারণ—যখন কোনো প্রবলতর উন্নত জাতি এবং কোনো দুর্বলতর অনুন্নত জাতি পরস্পরের সংস্পর্শে আসে, তখন দুর্বলতর অনুন্নত জাতিটি নিজের সত্তা হারিয়ে প্রবলতর ও উন্নত জাতিটির মধ্যে মিশে যায়। তবে এতে তার পুরোনো ভাষা, ধর্ম ও আচার-অনুষ্ঠানের বিলুপ্তি সম্পূর্ণভাবে ঘটে না, নতুনের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। 'বাংলাদেশের ইতিহাস' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে এ সম্পর্কে আলোচনা করে অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার জানিয়েছেন 'বাংলাদেশেও এই নীতির অন্যথা হয় নাই। বাংলার প্রাচীন অনার্য জাতি সর্বপ্রকারে আর্যসমাজে মিশিয়া গিয়াছে।'

তবে এখানে 'আর্যসমাজ' বলতে বোঝানো হয়েছে 'মিশ্র-আর্য'কে। আসলে বহু প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর লোকজন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দিক থেকে এসে বাংলাদেশে বসবাস করতে থাকে, বসতি স্থাপন করে। কালক্র(মে তাদের মধ্যে রক্তে(র মিশ্রণ ঘটে যায়। এমন কী হিন্দু-বৌদ্ধ আমলেও এ দেশে খাঁটি আর্য রক্ত(ছিল না। রক্তে(র মিশ্রণের সঙ্গে সঙ্গে 'এনিমিজ্‌ম্'[১] বা সর্বআত্মাবাদ, 'প্যাগানিজ্‌ম'[২] বা প্রকৃতি-উপাসনা বৌদ্ধমত ব্রাহ্মণ্য ধ্যান-ধারণা প্রভৃতি মিলেমিশে একটা সমন্বিত লোকধর্মও তৈরি হয়ে গিয়েছিল। এই লোকাচারমূলক ধর্মে বিশ্বাস, বর্ণসংকরত্ব থাকলেও একালে জাতি বলতে যা বোঝানো হয়, তেমন কোনো সচেতনতা তৎকালীন বাংলা এবং ভারতবর্ষের কোনো অঞ্চলেই ছিল না। কেবল রাজায় রাজায় যুদ্ধ হ'ত,

[১] সর্বআত্মাবাদ (Animism)—জড়বস্তুর মধ্যে আত্মা বা সত্তার অস্তিত্ব কল্পনাকারী ভাবধারা। দেবতা-ভাবনার আদি-অংকুর এই তত্ত্বের মাধ্যমে খুঁজে পাওয়া যায়।

[২] প্রকৃতি-উপাসনা (Paganism—ধর্মবিশ্বাসের আদিমতম রূপ।

উলুখাগড়ার প্রাণ যেত এবং সব বিজয়ীই ভারতের 'মহামানবের সাগরতীরে' এক দেহে লীন হয়ে যেত। কিন্তু যা সম্মিলিত হ'ত, কিন্তু নীল হ'ত না, তা হ'ল ভাষা। প্রাচীন দেশজ ও ত্র(মবিবর্তিত ভারতীয় আর্যশব্দের সংমিশ্রণে যে সব নতুন ভাষা গড়ে উঠেছিল তার অন্যতম বাংলাভাষা। তার লিখিত দলিল চর্যাপদ। রচয়িতারা খ্রিঃ অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর। এক কথায়, গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছিল বাংলাভাষা। 'বাঙ্গালীর সংস্কৃতি'-গ্রন্থের 'জাতি সংস্কৃতি ও সাহিত্য'-প্রবন্ধে তার সুস্পষ্ট অভিমত 'পালরাজগণের রাজ্যের প্রতিষ্ঠার দুই শতকের মধ্যেই মাগধী প্রাকৃত এবং বঙ্গদেশে প্রচলিত মাগধী প্রাকৃতের অপভ্রংশ হইতে একটু বিশিষ্ট মূর্তিধারণ করিয়া, বাঙ্গালাভাষা, একটি স্বতন্ত্রভাষা হইয়া দাঁড়াইল(এবং খ্রিষ্টীয় দশম শতকের মধ্যভাগ হইতে বৌদ্ধগু(দের হাতে এই স্বতন্ত্র ভাষায়, অর্থাৎ প্রাচীন বাঙ্গালায়, সাহিত্যসৃষ্টি—গান রচনা—হইতে লাগিল।'— বাঙালি জাতির মতই বাংলাভাষার উদ্ভবের মূলেও রয়েছে সংমিশ্রণের ধর্ম।

সুনীতিকুমার বাঙালি জাতি, বাংলাভাষা এবং বাঙালির সংস্কৃতির মধ্যে একটি পারস্পরিক যোগসূত্র রচনা করেছেন('বাঙ্গালীর সংস্কৃতি'-গ্রন্থের 'জাতি সংস্কৃতি ও সাহিত্য'-প্রবন্ধটিতে তিনি বলেছেন

(এক) 'ভাষা না হইলে nation বা জাতি হয় না(এবং ভাষা সম্বন্ধে সচেতন না হইলে জাতীয়তাবোধও আসে না।'

(দুই) 'আর্যভাষী বাঙ্গালী জাতির গঠনের সঙ্গে সঙ্গে ... বাঙ্গালীর সংস্কৃতির সূত্রপাত হয়।'

বাঙালি জাতির সৃষ্টি, বাংলাভাষার উদ্ভব এবং বাঙালি সংস্কৃতির ভিত্তিস্থাপন—মূল সুর, বন্ধনী সংরচন এবং বাংলাভাষার প্রথম সাহিত্যসৃজন—সবই হয়েছে একই সঙ্গে।

19.3 সারাংশ 1

বাংলাকে মাতৃভাষা এবং ঘরোয়া ভাষারূপে যারা ব্যবহার করে, সাধারণভাবে তারাই বাঙালি বলে গণ্য। বঙ্গভূমির প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং সেই সঙ্গে অনুষঙ্গে গড়ে ওঠা বিশেষ ধরনের জীবনচর্যাকে যারা পু(ষানুত্র(মে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অবলম্বন করে চলেছে বাঙালি তারাই।

বাংলা ভাষার শব্দসম্ভার এবং ব্যবহারিক প্রযুক্তি(র স্বরূপ অন্বেষণ করলেই বাঙালির জাতি-পরিচয়টি উদ্ভাসিত হয়। এদেশে আর্যভাষার ব্যাপ্তির আগেই অস্ট্রিক এবং দ্রাবিড় ভাষাবর্গের প্রচলন হয়েছিল। জনগোষ্ঠীর মধ্যেও তাই অস্ট্রিক এবং (কিছুটা) দ্রাবিড় বংশধারা প্রবাহিত আছে। উত্তর ভারতের আর্যভাষী বিভিন্ন আল্পীয় নরগোষ্ঠীর মানুষেরা এখানে এসে অস্ট্রিক ও ভূমধ্যসাগরীয় দ্রাবিড় অবতংসদের সঙ্গে মিশে যেতে থাকে সুপ্রাচীনকাল থেকেই। এই বিমিশ্রণের ফলেই সৃষ্টি হয়েছে এখনকার বাঙালি জাতির। তাদের জীবনযাত্রা, ভাষা, ধর্মবি(্বাস, আচার, সংস্কার, রীতি-নীতির মধ্যে এই জন্যেই উত্তরভারতের মিশ্র-আর্যভাষী, অস্ট্রিক, দ্রাবিড় এবং উত্তরাঞ্চলে কিছু মঙ্গোলয়েড বা ভোটচীনীয় জাতিগোষ্ঠীর উত্তরাধিকার খুঁজে পাওয়া যায়। ভাষার মূল চরিত্রটি অবশ্য মধ্যকালীন ইন্দো-আর্যভাষা, মাগধী প্রাকৃত থেকে সঞ্জাত হয়ে নব্য-ইন্দো-আর্যভাষাগোষ্ঠীর পরিমণ্ডলেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে(বাকিটা মুখ্যত অস্ট্রিক, দ্রাবিড় এবং পরবর্তী সময়ে সামান্য হলেও বিদেশী অনুসূত্রবাহী। এই জন্যে বাঙালির মধ্যে একদিকে সার্বভৌম-ভারতীয়, অন্যদিকে প্রান্তিক-বঙ্গীয়—দুই পরিচয়-সঞ্জাত ভাবধারারই সহাবস্থান ঘটেছে। চেহারার মধ্যে সেই 'ভারতীয়ত্ব' প্রকট(আর প্রতিটি অঞ্চলের নিজস্ব, নির্দিষ্ট ভাষার মধ্যে ব্যক্ত(হয় 'প্রান্তিকতা'। ভাষাই জাতীয়তার দ্যোতক বলে

বাংলাভাষার প্রতিষ্ঠা হবার সঙ্গে বাঙালিজাতি এবং তার ফলশ্রুতিরূপে বাংলার সংস্কৃতির প্রাথমিক উদ্ভব হয়েছে ভিন্ন এক শতকে গোড়ার দিকে। এর আগের হাজারখানেক বছর ধরে চলে তার প্রস্তুতি। ব্রাহ্মণ্যধর্ম, সাহিত্য এবং বৌদ্ধ-জৈন মতবাদের অভিঘাত পড়েছে সেই সময়ে।

19.4 অনুশীলনী 1

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর ক(ন। উত্তর করা হয়ে গেলে 82 পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন

1. শূন্যস্থান পূরণ ক(ন

   (ক) খ্রিঃ _____শতকের প্রথম পাদে সমস্ত বাংলা_____হয়েছে, খ্রিঃ 740 ও বরেন্দ্রভূমিতে _____রাজবংশের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে এবং জাতির নতুন _____ অধ্যায় সূচিত হয়েছে।

   (খ) _____উপনিবেশের ফলে এক সময় _____ভাষা _____ _____ প্রথম ও _____ অন্যান্য দিকগুলি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল(_____হয়েছিল প্রাচীন _____।

   (গ) যখন কোনো _____ও _____জাতি এবং কোনো _____ও অনুন্নত জাতি পরস্পরের _____আসে, তখন _____ও _____জাতিটি নিজের _____হারিয়ে _____ও _____জাতিটির মধ্যে মিশে যায়।

   (ঘ) প্রাচীন _____ও ত্র(মবিবর্তিত ভারতীয় _____ _____ যে সব নতুন ভাষা গড়ে উঠেছিল তার অন্যতম _____।

2. নীচের উদ্ধৃত বাক্য বা বাক্যাংশ ঠিক না ভুল টিক (✓) চিহ্(দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

	ঠিক	ভুল
(ক) অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও উত্তর ভারতের মিশ্র-আর্য—তিন জাতির মিলনে বাঙালি জাতির সৃষ্টি।	☐	
(খ) হিন্দু বৌদ্ধ আমলেও এদেশে (বাংলায়) খাঁটি আর্য রক্ত(ছিল।		

3. সঠিক উত্তরে টিক ( ) চিহ্(ত ক(ন।

   (ক) বাঙ্গালাভাষা একটি স্বতন্ত্র ভাষা হইয়া দাঁড়াইল
   1. সপ্তম শতকে
   2. নবম শতকের শেষে
   3. দশম শতকের মধ্যভাগে

   (খ) 'ভাষা না হইলে Nation বা জাতি হয় না' বলেছেন
   1. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
   2. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

4. (ক) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের দেওয়া 'বাঙ্গালীর সংস্কৃতি'র পরিচয় উল্লেখ ক(ন।

5. (খ) 'এনিমিজ্‌ম্' ও 'প্যাগানিজ্‌ম্' শব্দ দুটির প্রকৃত অর্থ বুঝিয়ে দিন।

19.5 মূলপাঠ 2

সুনীতিকুমার বাঙালির সংস্কৃতির যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তার মধ্যেই ভারতীয় সত্তা ও বাঙালি সত্তা—এই দুটি প্রসঙ্গ বিভাজন হয়ে গেছে। বাংলা ভারতীয় উপমহাদেশের একটি প্রদেশ। অন্যান্য প্রদেশের মতই এরও পুষ্টি ঘটেছে ভারতীয় ভাবধারায়। আচার্য সুনীতিকুমার তাই ভারতীয় সত্তাটিকে 'সার্বভৌম সত্তা' এবং বাঙালি সত্তাটিকে 'প্রান্তিক সত্তা' বলেছেন। বাঙালি জাতি, বাংলাভাষা এবং বাঙালি সংস্কৃতির সৃষ্টিমূলেও এই দুই সত্তার সংযুক্তি(

(এক) 'অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও উত্তরভারতের মিশ্র আর্য-এই তিন জাতির মিলনে বাঙালী জাতির সৃষ্টি হইল।'

(দুই) 'গঙ্গার মতো আর্যভাষার নদী বাঙ্গালা দেশেও বহিল, এই নদীর স্রোতে দেশের প্রাচীন অনার্যভাষা ভাসিয়া গেল-আর্যভাষা প্রকৃত এই বাঙ্গালায় আসিয়া ত্র(মে বাঙ্গালা ভাষার রূপ ধারণ করিল, প্রাকৃতের সঙ্গে তাহার ধাত্রীরূপে সংস্কৃতও আসিল।'—ভাষার ইতিহাস অনুসারে পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠার দুই শতকের মধ্যেই মাগধী প্রাকৃত এবং বাংলায় প্রচলিত মাগধী প্রাকৃতের অপভ্রংশ থেকে একটু স্বতন্ত্র মূর্তিধারণ করে, বাংলাভাষা এক স্বতন্ত্র ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।— এর মধ্যে এক মিলন সংগীত অল(উদগীত।

(তিন) পাল ও সেন আমলে বাঙালি সংস্কৃতির ভিত্তি যখন স্থাপিত হয়, তখনও ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ প্রভাব বা উত্তরভারতীয় আর্যের সার্বভৌম সুরটির সংস্কার তার মধ্যে থেকে গেছে। এমন কি 'যে ছাঁচে সৃজ্যমান বাঙালী জাতিকে ঢালা হইল, মোটের উপর সেই ছাঁচ এখনও বাঙালী সমাজে বিদ্যমান।'—ফলত, উৎস থেকেই বাঙালির সংস্কৃতিতে সার্বভৌম ও প্রান্তিক দুই সংস্কৃতির সম্মিলিত প্রবাহ বিদ্যমান।

—এসব থেকে এক কথায় বলা যায় বাঙালি একদিকে ভারতের, অন্যদিকে বিশেষভাবে বাংলার। তবে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মানুষের মধ্যে সংস্কৃতি, জীবন চর্চা-চর্যা, ভাষা এবং অন্যবিধ ((ত্রে সার্বভৌম ও প্রান্তিক সত্তার উপস্থিতি থাকলেও অন্যান্য প্রদেশের মানুষের সঙ্গে ধর্মীয়-মানসিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ইত্যাদি ((ত্রে সাদৃশ্য-সমতা থাকলেও ভাষাগত ঐক্যবন্ধন নেই বলে বাঙালির সঙ্গে অন্য প্রদেশের নিগূঢ় ঐক্য সূচিত হতে পারে না। 'জাতীয়তার স্বাজাত্যের প্রধান আধার ভাষা'। বাঙালি যে কোনো অঞ্চলে যে কোনো রাষ্ট্রের যে কোনো রাজনীতি-ধর্মের আর্থিক সঙ্গতির হোক না কেন, স্বাজাত্য-অনুভব বাংলা ভাষার কারণেই থেকে যায়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের প্রাদেশিক ভাষাভাষীকে একটি বিশেষ রাষ্ট্রীয়-ভাষার ঐক্য সূত্রে বাঁধার চেষ্টা হলেও প্রান্তিক সত্তার প্রবল প্রভাবকে যেমন অতিত্র(ম করা যায় না, তেমনি প্রান্তিক জনগণের পৃথকত্ব ও সত্তা-সম্পর্কীয় আত্মাভিমান থাকায় ভারতবর্ষে সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় ঐক্য-বিধানের জন্য প্রান্তিক সত্তার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ও বিনাশ সম্ভব নয়। সুনীতিকুমারের মতে—এই প্রান্তিক সত্তার প্রাণ হচ্ছে প্রান্তিক ভাষাই। ভারতবর্ষের এক-একটি প্রদেশে এক-একটি ভাষা এবং জাতির সংজ্ঞানুসারে এক-একটি ভাষা অবলম্বনে গড়ে উঠেছে এক-একটি জাতি। সেই সব জাতি বৃহত্তর ভারতবর্ষের অন্তর্গত, সকলেই হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ব্যবহার করে, কিন্তু কখনোই রাষ্ট্রভাষাকে প্রান্তিক ভাষার ওপরে স্থান দেয় না। তাই ভারতবর্ষের যে কোনো জাতির কথা বলতে গেলে যেমন সার্বভৌম সত্তার কথা বলতে হয়, তেমনি প্রান্তিক সত্তাকেও সমান মূল্য ও মর্যাদা দিতে হয়। বাঙালি জাতির বাঙালি সংস্কৃতির কথায় তাই যেমন ভারতবর্ষের

কথা বা সার্বভৌম সত্তার কথা থাকে, তেমনি বাঙালিত্বের কথা বা প্রান্তিক সত্তার কথা থাকে ভারত—সার্বভৌম, সাধারণ(বাংলা—প্রান্তিক, বিশেষ।

সুনীতিকুমার একটি বিশিষ্ট (ে ত্র নির্দেশ করে সার্বভৌমত্বের দিকটিকে দেখিয়েছেন—আমাদের চেহারায় রয়েছে এক সাধারণ অনন্য-দেশলভ্য ভারতীয়ত্ব (তা ধরা পড়ে আমাদের ফরসা বা শ্যামবর্ণে, মুখ-চোখের আদলে, চাহনির বিশেষত্বে, চলনে-বলনে। তাই প্রাদেশিক বা বিশিষ্ট ধর্মীয় গোষ্ঠীর বিশিষ্টতার চিহ্(মুছে দিয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের মানুষকে যদি একই রকমের পরিচ্ছদ পরিয়ে দেওয়া হয়, তবে বোঝা শক্ত(হয় তারা কে কোন্ প্রদেশের লোক(বরং তাদের সকলকেই যেন একরকম মনে হয়। এর কারণ—সাধারণ একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে ভারতবর্ষের সব প্রদেশের মানুষের চেহারায় হাবেভাবে চলনে-বলনে, দৃষ্টিতে। এটাই ভারতীয়ত্ব—এটাই সার্বভৌমত্ব। তবে, এই বাহ্যিক সার্বভৌমত্বের মত সত্যতা রয়ে গেছে সংস্কৃতি ও সভ্যতার (ে ত্রে 'আমাদের অতীতের কথার আলোচনা কালে, আমাদের জাতি ও জাতীয় সংস্কৃতি, ভাষা ও সাহিত্য বিচারের কালে, বাংলার পটভূমিকায় নিখিল ভারতবর্ষকে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতবর্ষকে বিস্মৃত হইব না।' দেখা যায় বাংলার ও বাঙালির বিভিন্ন (ে ত্রে রয়েছে এই সার্বভৌমত্বের বিভিন্ন চিহ্(

এক। জাতি সৃষ্টিতে—উত্তরভারতের মিশ্র আর্যের সঙ্গে মিলিত হয়েছে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় জাতি(সৃজ্যমান বাঙালি জাতিকে ঢালা হয়েছে নিখিল-ভারতীয় সর্বজয়ী মনে ছাঁচে।

দুই। সংস্কৃতির ভিত্তিস্থাপনার কালে—নিখিল ভারতীয় (ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ) সুরটিতেই বাঁধা হয়েছে মূলসুর।

তিন। সভ্যতাগত (ে ত্রে—উত্তরভারতের গাঙ্গেয় সভ্যতাই নবসৃষ্ট আর্যভাষী বাঙালি জাতির জন্মনীড়।

চার। ভাষা সৃষ্টির (ে ত্রে—বাংলা ভাষা উত্তর ভারতে উদ্ভুত আর্যভাষা প্রাকৃত থেকে উৎপন্ন।

পাঁচ। ভৌগোলিক-নৃতাত্ত্বিক (ে ত্রে—বাংলা মূলতই হিমাচল কন্যা গঙ্গার দান।

—এসব তথ্য থেকে বোঝা যায় বাঙালি সংস্কৃতি ও সভ্যতার (ে ত্রে সার্বভৌম ভারতীয় সত্তাকে কখনোই অস্বীকার করা যায় না। এ সম্পর্কে 'বাঙ্গালীর সংস্কৃতি' গ্রন্থেই সুনীতিকুমারের অত্যন্ত মূল্যবান এবং চমৎকার একটি মন্তব্য রয়েছে 'বাঙালী তাহার আধুনিক সংস্কৃতিতে হয়তো চার আনা ইউরোপীয়, তাহার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উপরে নির্ভর করে সে কতটা ইউরোপীয় হইবে,—এবং আট আনা ভারতীয়(বাকি চার আনায় সে বাঙালী এবং চার আনার মধ্যে আবার অনেকটা ভারতীয়ত্বের বিকার মাত্র,—বাকিটুকু খাঁটি বাঙালী, অর্থাৎ গ্রাম্য বাঙালী'। সুনীতিকুমারের মতে—খাঁটি বাঙালিত্ব দেখা যায় পল্লীগাথার মলুয়া-মদিনা-কমলা প্রভৃতি চরিত্রে, আর খাঁটি ভারতীয়ত্বের প্রকাশ উমায়-সীতায়-সাবিত্রীতে। কিন্তু উমা-সীতা-সাবিত্রীরা সকলেই বাঙালির প্রাণের প্রিয় এবং আত্মার আত্মীয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু উত্তর ভারতের হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন সংস্কৃতি যতই প্রভাব বিস্তার করে বাঙালির জাতীয় সত্তা ও সংস্কৃতিকে সার্বভৌম সত্তা দ্বারা নিয়ন্ত্রণ ক(ক না কেন, প্রান্তিক সত্তা বা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যই বাঙালিকে জাতি-রূপগত কেন্দ্রীয় ঐক্যদান করেছে এবং কখনোই বাঙালির প্রান্তিক বৈশিষ্ট্যটিকে তার সাংস্কৃতিক (ে ত্র থেকে বিলুপ্ত করে দিতে পারেনি। সুনীতিকুমার এ নিয়ে যে বিশেষ দৃষ্টান্তটি দিয়েছেন, তাও এখানে উল্লিখিত হতে পারে—গু(র মৃত্যুর পরে দ্রাবিড়-নিষাদ-কিরাতেরা ঢিবি বা এডুক গড়তো(বৌদ্ধ সংস্কৃতির ধারায় এই ঢিবিই পরিণত হয়েছে স্তূপে বা চৈত্যতে(হিন্দু-সংস্কৃতিতে তা রূপ গ্রহণ করেছে সমাধির(এবং বাঙালি মুসলমানেরা সেই আদি ধারণা নিয়েই বানিয়েছে পীরের কবর বা দরগা বা আস্তানা। এসবের মধ্যে মূল ঢিবির ধারণাটি থেকেই গেছে। এই প্রান্তিক বৈশিষ্ট্যটিকে কোনোভাবেই মুছে দেওয়া যায় নি। বরং এই ধারণাই কেন্দ্রীয় ঐক্যবোধ গড়ে তুলেছে বিভিন্ন ধর্মের ও গোষ্ঠীর মধ্যে।

সুনীতিকুমার এই নিয়ে আর একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। বলেছেন—

> 'অস্ট্রিক জাতীয় লোকেরা ভারতে (পূর্ব ও মধ্যভারতে) প্রথমে কৃষিকার্য ও তদবলম্বনে সঙ্ঘবদ্ধ সুসভ্য জীবনের পত্তন করে। উহারা ধান পান কলা নারিকেলের চাষ করত(পাহাড়ের গা কাটিয়া ধানের খেত প্রস্তুত করিত। প্রথমটায় উহাদের চাষ চট্টগ্রাম অঞ্চলের জুমিয়াদের মতো(লাঙ্গলের জন্য তী(্ণমুখ কাষ্ঠদণ্ড ব্যবহার করিত (ধাতুর ব্যবহার তখনও জানা ছিল না বলিয়া)। ধনুর্বাণ উহাদের প্রধান অস্ত্র ছিল। একখণ্ড গুঁড়িকাঠে তৈয়ারী ডোংগায় এবং কতগুলি গুড়িকাঠ বাঁধিয়া তৈয়ারী ভেলার আকারের বড় বড় নৌকায় করিয়া উহারা বড় নদী, এমনকি সাগরও পার হইত। বাঙ্গালাদেশে এখনও তালগাছ খোদাই করিয়া তৈরী কোন্দার বহুল প্রচলন দেখা যায়।'

ডিঙি নৌকার বা ডোঙার আদি-ধারণাটি আর্যীকরণের সহস্রাধিক বছর পরেও অটুট থেকে গেছে, এই প্রান্তিকতাকে মুছে দেওয়া যায়নি। তবুও আমরা ভারতীয়—এক জাতি এক প্রাণ(বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যে আমরা তবুও বি(্বাসী। এর কারণ—ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন ভাষাভাষী ও বিভিন্ন বিশিষ্ট সংস্কৃতির মানুষের জীবন-সাধনার পন্থা ও চরম ল(্যের অভিন্নতা। ভারতে পৌরাণিক ধর্মের বি(্বাস-সংস্কার, শাস্ত্র-নির্দিষ্ট ক্রি(য়াকলাপ, ভক্তি(বাদের চর্চা ইত্যাদি এক ভাষা-নিরপে(অন্তরগত ঐক্যরচনা করেছে। তাই উত্তর ভারতের মানুষ দ(ি ণ ভারতের ভাষা না বুঝলেও দ(ি ণ ভারতের মন্দিরগুলোর ভাস্কর্য ও শিল্পকলায় রামায়ণ-মহাভারতের প্রস্তর-রূপায়ণ দেখে ভাষার অতীত এক গভীর ভাব-সংবেদনের সূত্রে এক অবিভাজ্যতার ও ঐক্যবোধের প্রতীতি অর্জন করে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'সাহিত্য ও সংস্কৃতির তীর্থ সঙ্গমে'-গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করে জানিয়েছেন—

> সমস্ত রীতিনীতি ও বাঙ্ময় প্রকাশের বিভেদ সত্ত্বেও আত্মার এই ঐক্যবন্ধন, আধ্যাত্মিক অনুভূতির এই সমপ্রাণতা অবিচ্ছিন্ন।

সতর্ক সচেতন চিন্তাভাবনা ছাড়াই শুধুমাত্র সংস্কার থেকেই কোনো কোনো বিষয় ও কর্ম সংঘটিত হয়ে থাকে। একইভাবে একটি জাতির মানুষও এক অর্জিত অখণ্ড উত্তরাধিকারকে নিজের অজ্ঞাতে, শুধু সংস্কার-বশেই প্রয়োগ করে থাকে এবং একসময় এই মানস-বৈশিষ্ট্য তাদের সচেতন চিত্তভিত্তি রচনা করে থাকে। কোনো জাতির অন্তরের সেই গোপনচারী প্রবণতা ঐতিহ্যগত মনোলোকের সেই প্রচ্ছন্ন জীবনী শক্তি(ই সংস্কৃতি এবং তা সৃজিত হয় জাতির গঠন-পর্বেই। বাঙালি জাতির ে(ত্রেও একথা সত্য। তাই বাঙালির সংস্কৃতির আলোচনায় বাঙালি জাতিগঠনের ইতিহাস বিশিষ্ট মূল্য-মর্যাদা দাবি করে স্বাভাবিকভাবেই।

'বাঙ্গালীর সংস্কৃতি' গ্রন্থের 'বাঙালীর ইতিবৃত্ত জাতি গঠনে'-প্রবন্ধটিতে আচার্য সুনীতিকুমার সং(িপ্তভাবে পাঁচটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন

প্রথম পর্যায়	প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ভারতের অধিবাসীদের পূর্ব পু(ষেরা আসে—প্রথমে আফ্রিকা থেকে 'নিগ্রোজাতীয় মানুষ'। তারা ছড়িয়ে পড়ে আসামে-বর্মায়-মালয়ে-আন্দামানে। তারা আসে আরব হয়ে, ইরাণের সাগরকূল ধরে, দ(ি ণ বেলুচিস্তানের পথে।
দ্বিতীয় পর্যায়ে	নিগ্রোদের পরে আসে অস্ট্রিকেরা। এদের হাতে নিগ্রোরা বিধ্বস্ত হয়ে যায়। এরা চাষবাস জানতো, কাপড় বুনতে পারতো। ভারতের সভ্যতার বুনিয়াদ পত্তন হয় এদেরই হাতে। কোল-খাসিয়া-নিকোবরী ভাষাতে এদের ভাষাই পরিবর্তিত আকারে থেকে গেছে।

এদেরই প্রত্য(বংশধর, মুণ্ডরী সাঁওতালী হো বিরহড় শবর—প্রভৃতি ভাষাভাষীরা। এরা বসবাস করতো সারা বাংলা জুড়ে।

তৃতীয় পর্যায় — অস্ট্রিকদের পরে আসে তুলনামূলকভাবে উন্নততর দ্রাবিড়েরা। এরা নগর সভ্যতা পত্তন করে। নিষাদদের মতো এরাও সমগ্র বাংলাদেশে বসবাস করতে থাকে। মালপাহাড়ি, ওঁরাও প্রভৃতি এদের প্রত্য(বংশধর।

চতুর্থ পর্যায় — দ্রাবিড়দের পরে পূর্বদেশ থেকে আসে নাক চ্যাপ্টা হলদে রঙ বেঁটেখাটো কিরাতেরা। হিমালয়ের দ(ণে-উত্তরবিহারে-উত্তরবঙ্গে-পূর্ববঙ্গে-আসামে এরা বসবাস করতে থাকে। তবে সভ্যতার (ে ত্রে এরা অস্ট্রিক-দ্রাবিড়দের মত অগ্রবর্তী ছিল না। কিন্তু উত্তরবঙ্গ আর পূর্ববাংলার বাঙালির গঠনে এদের প্রভাব পড়েছে।

পঞ্চম পর্যায় — শেষ স্তরে আসে মিশ্রআর্যভাষী গোষ্ঠীর মানুষেরা। পঞ্জাব-বিহার উত্তরপ্রদেশ সর্বত্র স্থানীয় অস্ট্রিক-দ্রাবিড়দের সঙ্গে বিবাহের মধ্য দিয়ে আর্যভাষীরা মিশ্রআর্যে পরিণত হয়। তাদের বাচন প্রকাশের বাহন হয় আর্যভাষা। এই ভাষা সংস্কৃত ও প্রাকৃত রূপ গ্রহণ করে সময়ান্তরে মগধ হয়ে বঙ্গে এসে স্থানীয় অস্ট্রিক-দ্রাবিড়দের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে বঙ্গ ভাষী জাতি বা বাঙালি জাতি গঠন করে।

অন্যদিকে জাতি গঠনের কথা বলতে অতুল সুর তাঁর 'বাংলা ও বাঙালীর বিবর্তন' গ্রন্থে বাঙালির মধ্যে বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর মানুষের রক্তে(র মিশ্রণের কথা বলেছেন। তাঁর মতে— প্রাক-দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মানুষই বাংলার প্রকৃত অধিবাসী(তাদের ভাষা অস্ট্রিক(তাদের বিস্তৃতি পাঞ্জাব থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের ইস্টার দ্বীপ পর্যন্ত। দ্রাবিড়েরা পরে এসে ধীরে ধীরে এদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল(এদের সঙ্গে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের জাতি-সমূহের মিল আছে বলে এদের মেডিটেরেনিয়ান নরগোষ্ঠীর মানুষ বলা হয়। দ্রাবিড়দের পরে এসেছিল ইউরোপের অ্যালপাইন নরগোষ্ঠীর সমতুল্য আর্যভাষাভাষী এক নরগোষ্ঠী। এখনও এদের অস্তিত্ব ধরা পড়ে বারাণসী থেকে বাংলার মানুষের চেহারায় গড়নে। এই আলপীয়েরা ছোট-কপালের মানুষ। এরা এশিয়া মাইনর বা বালুচিস্তান থেকে পশ্চিম সাগরের উপকূল ধরে এসে ত্র(মশ সিন্ধু কাথিয়াবাড় গুজরাট মহারাষ্ট্র দুর্গ কন্নাদ ও তামিলনাড়ুতে পৌঁছায়। আবার এদেরই একদল পূর্ব উপকূল ধরে বাংলা ও ওড়িশায় আসে। এছাড়াও খ্রিষ্টপূর্বাব্দ কালে উত্তর এশিয়ার তৃণভূমি অঞ্চল থেকে ভারতে পঞ্চনদের উপত্যকা অঞ্চলে এসে বসবাস স্থাপন করে বলিষ্ঠ-দীর্ঘকায়-লম্বা-মাথা-টিকালো-নাক-ভারী-ওজনের নর্ডিক গোষ্ঠীর মানুষ। পঞ্জাব কা(্মীর এবং উত্তরপ্রদেশের উচ্চবর্ণের মানুষের মধ্যে এদের অস্তিত্ব ল(্য করা যায়। ড. সুরের মতে— 'ভারতীয় জনসমাজের মধ্যে নর্ডিক-উপাদান পূর্বদিকে বারাণসী পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়। তার পূর্ব দিকে (অর্থাৎ বাংলায়ও) আলপীয় উপাদানও বেশী'। উচ্চ শ্রেণীর বা বর্ণের বাঙালিরা প্রায়শই আর্য-ভাষাভাষী আলপীয় নরগোষ্ঠীর লোক। অর্থাৎ, বাঙালি জাতি গঠনে বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে—

এক। আদি অস্ট্রিক, ভূমধ্যসাগরীয় ভোটচীনীয় এবং আলপীয় নরগোষ্ঠীর সম্মিলনের।

দুই। [{(অস্ট্রিক + দ্রাবিড়) + আর্যভাষী} + {অস্ট্রিক + দ্রাবিড় + ভোটচীনীয়}]
= বাঙালি জাতি। শারীরিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে অস্ট্রিকদের সঙ্গেই সাদৃশ্য বেশি দেখা যায়।

'মানব সমাজের গতি নিয়ন্ত্রিত হয় তার জীবনের প্রয়োজনে। মানুষের আশা ও ভয়, বর্তমানের চাপ ও ভবিষ্যতের কল্পনা, তার জীবনের পথ কেটে চলেছে। ইতিহাসের কাজ জীবনের এই বিচিত্রলীলাকে দর্শন করা,

মনন করা, নিদিধ্যাসন করা।'—বাংলা ও বাঙালির বিবর্তন গ্রন্থে অতুল সুরের এই মন্তব্য অনুসরণে অগ্রসর হ'লে ইতিহাস ও সংস্কৃতির অচ্ছেদ্য ও পরস্পর-নির্ভরশীল রূপটির পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙালির সংস্কৃতির সন্ধানে তাই অনুসরণ করতে হয় বাঙালি জাতিত্বে ভারত সংস্কৃতির ঐতিহাসিক স্বরূপ মূল্যকে এবং ইতিহাসের পথ ধরে বাঙালি জাতীয় সংস্কৃতি কী ভাবে রূপ গ্রহণ করেছে, তার পরিচয়কে। বলা বাহুল্য, সেই ইতিহাসে সহস্রাধিক বছরের কালসীমা যেমন রয়েছে, তেমন বিশেষভাবে রয়েছে একাধিক ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ—কখনো বাঙালি জাতি ও সংস্কৃতির সঙ্গে সুফি ও ইসলামী ধ্যানধারণা চর্চা-চর্যার যোগ এবং কখনো বা চৈতন্যদেবের মত যুগন্ধর ব্যক্তি(ত্বের আবির্ভাবে বাঙালির সংস্কৃতির গুণগত ও পরিমাণগত পরিবর্তনের যোগাযোগ। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বাঙ্গালীর সংস্কৃতি' গ্রন্থে ইতিহাসের পথ ধরেই বাঙালি সংস্কৃতির উদ্ভব বিকাশ বিবর্তনের পরিচয় জ্ঞাপন করেছেন।

19.6 সারাংশ 2

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন বাঙলাদেশের প্রতিটি মানুষের মধ্যে একদিকে ভারতীয় সত্তা অপর দিকে বাঙ্গালি সত্তা কাজ করে। তিনি ভারতীয় সত্তাটিকে 'সার্বভৌম সত্তা' আর বাঙালি সত্তাটিকে 'প্রান্তিক সত্তা' বলেছেন। তাঁর মতে বাঙালি জাতি, তার ভাষা ও সংস্কৃতি সৃষ্টির মূলেও এই দুই সত্তার পরিচয় আছে। পাল-সেন যুগে ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য বৌদ্ধ যা প্রধানতঃ উত্তর ভারতের আর্যদের কাছ থেকে পাওয়া তার সঙ্গে অনার্য প্রভাবে পুষ্ট বাঙালি সংস্কৃতি। ফলত উৎস থেকেই বাঙালি সংস্কৃতিতে সার্বভৌম ও প্রান্তিক দুই সংস্কৃতির সম্মেলন ঘটেছে। তথাপি একথা মানতেই হবে যে, বাঙালি সে যে কোনো অঞ্চলের রাষ্ট্রের অথবা রাজনীতির-ধর্মের-আর্থিক সঙ্গতির হোক না কেন,—তারা যে পরস্পর সাযুজ্য অনুভব করে সে তাদের ভাষার কারণে। অন্যবিধ (ে ত্রে সার্বভৌম ও প্রান্তিক সত্তার অনেক মিল থাকলেও, ভাষাগত ঐক্য বন্ধন নেই বলে নিগূঢ় ঐক্য সম্ভব হয় না। তবে সব প্রদেশের মানুষের মধ্যে অনেকটা বাহ্যিক মিল থাকায় এক ধরনের ভারতীয়ত্ববোধ গড়ে ওঠে। তার সামগ্রিক বিকাশ সম্ভব একমাত্র সাংস্কৃতিক ও সভ্যতার ঐক্যসূত্রে। আর এভাবেই আমরা ভারতীয়, একজাতি একপ্রাণ বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যে বি(াসী। এর কারণ, আমরা ভারতবাসীরা বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন ভাষাভাষী হয়েও, সংস্কৃতিতে জীবন-সাধনায় অভিন্নতা বোধ করি। কেন না, আমাদের জীবনের ল(্য এক ও অভিন্ন।

সুনীতিকুমার কতকগুলি উদাহরণ দিয়ে বাঙালি ও ভারতীয় বৈশিষ্ট্য বুঝিয়ে দিয়েছেন। গীতিকার মলুয়া-মদিনা-কমলার পাশাপাশি সীতা-সাবিত্রীর চরিত্র বা মন্দির ভাস্কর্যের শিল্পকলায় অতীত এ গভীর সংবেদনের সূত্রে এক অবিভাজ্যতার ও ঐক্যবোধের ধারণা তুলে ধরে তিনি আরও দেখিয়েছেন প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে কীভাবে নানা নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী পরম্পরাত্র(মে গড়ে তুলেছে ভারতীয় জনজাতি—নানা বৈচিত্র্যের মধ্যেও ঐক্যের ঐতিহ্য।

19.7 অনুশীলনী 2

নীচের প্র(গুলির উত্তর ক(ন। উত্তর শেষে 84 পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন। ভুল উত্তর চিহ্নি(ত করে সংশোধনে সচেষ্টা হোন।

1. শূন্যস্থান পূরণ ক(ন

(ক) ভাষা সৃষ্টির (ে ত্রে_____ভাষা _____উদ্ভুত _____ _____ থেকে উৎপন্ন।

(খ) _____ _____ _____বাংলা মূলতই _____কন্যা _____দান।

(গ) গু(র মৃত্যুর পরে দ্রাবিড় _____ _____ঢিবি বা _____গড়তো। _____ _____ধারায় এই ঢিবিই পরিণত হয়েছে _____বা _____(হিন্দু সংস্কৃতিতে তা রূপ গ্রহণ করেছে _____(এবং বাঙালি _____ সেই আদি ধারণা নিয়েই বানিয়েছে _____ কবর বা _____ বা _____।

2. সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্(দিন।

(ক) এদেশে প্রথম ধান পান কলা নারিকেলের চাষ করে
1. আর্যরা
2. অস্ট্রিকরা
3. দ্রাবিড়রা

(খ) অস্ট্রিকদের পরে ভারতে আসেন
1. কিরাতরা
2. নিগ্রোজাতীয় মানুষ
3. দ্রাবিড়রা

(গ) খ্রিস্ট পূর্বাব্দকালে উত্তর এশিয়ার তৃণভূমি অঞ্চল থেকে ভারতে পঞ্চনদের উপত্যকা অঞ্চলে বসবাস স্থাপন করে
1. নর্ডিক গোষ্ঠীর মানুষ
2. অ্যালপাইন নরগোষ্ঠীর মানুষ
3. দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মানুষ

3. কোন্‌টি ঠিক বা ভুল তা টিক (✓) চিহ্(দিয়ে বুঝিয়ে দিন

	ঠিক	ভুল
(ক) উচ্চশ্রেণীর বা বর্ণের বাঙালিরা প্রায়শই আর্য ভাষাভাষি নর্ডিক নরগোষ্ঠীর লোক।	☐	
(খ) বাঙালি জাতির শারীরিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে অস্ট্রিকের সঙ্গেই সাদৃশ্য বেশি দেখা যায়।		
(গ) পাল ও সেন আমলে বাঙালি সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপিত হয়।		

4. (ক) বাঙালির জাতিগঠনের সং(প্ত পরিচয় দিন।

(খ) বাঙালি জাতি-সত্তার নৃতাত্ত্বিক উপাদানগুলির উল্লেখ ক(ন।

(গ) সুনীতিকুমার বলেছেন—ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ও ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষের সকলকেই যেন একরকম মনে হয়।—এর কারণগুলি সং(েপে বুঝিয়ে দিন।

5. (ক) সংস্কৃতি শব্দটির প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য বুঝিয়ে দিন।

(খ) রবীন্দ্রনাথ 'কৃষ্টি' ও 'সংস্কৃতির' পৃথক অর্থ করেছেন। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত ব্যাখ্যা উল্লেখ ক(ন।

(গ) রবীন্দ্রনাথ উতরেয় ব্রাহ্মণ থেকে 'আত্মসংস্কৃতি' শব্দটি গ্রহণ করে নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এ সম্পর্কে সং(েপে আলোচনা ক(ন।

(ঘ) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও নীহাররঞ্জন রায়ের দুটি করে প্রধান বইয়ের নাম উল্লেখ ক(ন।

19.8 উত্তর সংকেত

18.4 অনুশীলনী 1

1. (ক) সপ্তম, আর্যভাষী, পাল, বাঙালি, গৌরবের
   (খ) আর্য, আর্যদের, ধর্ম, সামাজিক, সভ্যতার, বাংলায়, লুপ্ত, অনার্যভাষা
   (গ) প্রবলতর, উন্নত, দুর্বলতর, সংস্পর্শে, দুর্বলতর, অনুন্নত, সত্তা, প্রবলতর, উন্নত
   (ঘ) দেশজ, আর্যশব্দের, সংমিশ্রণে, বাংলা ভাষা
   (ঙ) জাতিগত, দেশগত, ধর্মগত, কালচার, গান, চা(কলা, দর্শন, বিজ্ঞান, অর্ধসত্য।
2. (ক) ঠিক, (খ) ভুল
3. (ক) দশম শতকের মধ্য ভাগে, (খ) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
4. উত্তর সংকেত নিষ্প্রয়োজন।

18.7 অনুশীলনী 1

1. (ক) বাংলা, উত্তরভারতে, আর্যভাষা, প্রাকৃত।
   (খ) ভৌগোলিক—নৃতাত্ত্বিক ে(ত্র, হিমাচল, গঙ্গার।
   (গ) নিষাদ, কিরাতেরা, এড়ুক, বৌদ্ধ সংস্কৃতির, স্তুপে, চৈত্যতে, সমাধির, মুসলমানেরা, পীরের, দরগা, আস্তানা।
2. (ক) অস্ট্রিকরা, (খ) দ্রাবিড়রা, (গ) নর্ডিক গোষ্ঠীর মানুষ।
3. (ক) ভুল, (খ) ঠিক, (গ) ঠিক।

4 এবং 5 নং প্র(ের উত্তর পাঠ্যবস্তুর মধ্যে আছে। তাই এ(ে ত্রে উত্তর সংকেত নিষ্প্রয়োজন।

19.9 গ্রন্থপঞ্জি

1. নীহাররঞ্জন রায় কৃষ্টি-কালচার-সংস্কৃতি, বাঙালির ইতিহাস।

একক 20 ভারত-সংস্কৃতি

গঠন

20.0 উদ্দেশ্য

20.1 প্রস্তাবনা

20.2 মূলপাঠ

20.3 সারাংশ

20.4 অনুশীলনী

20.5 উত্তর সংকেত

20.6 গ্রন্থপঞ্জি

20.0 উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে ভারতবর্ষের সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য ও তার স্বরূপ জানতে পারবেন। ভারত-সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা থেকে প্রয়োজনে প্রাসঙ্গিক আলোচনাও করা সম্ভবপর হবে।

20.1 প্রস্তাবনা

বর্তমান এককে ভারত-সংস্কৃতির সম্যক পরিচয় দিতে প্রধানত আচার্য সুনীতিকুমারের বক্ত(ব্যকেই অনুসরণ করা হয়েছে। তিনি ভারত-সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে 'সমন্বয়ী' দৃষ্টিভঙ্গী ও 'অহিংসার' ওপরেই বেশি গু(ত্ব আরোপ করেছেন। এ সম্পর্কে সং(িপ্ত আলোচনা এককটিতে পাওয়া যাবে।

20.2 মূলপাঠ 1

ইতিহাস অনুসরণ করলে বোঝা যায় নরডিক আলপীয় আর্যেরা এসে এ দেশের অনার্য অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় এবং মোঙ্গলীয় ভোটচীনীয় সংস্কৃতির পরাজিত জনগণের সঙ্গে ক্র(মশ মিলিত হয়ে ধীরে ধীরে বিজেতার দর্প ত্যাগ করে মিশ্র আর্যে পরিণত হয়েছেন। এই সমন্বয়ী ধর্ম থেকে সূচিত হয়েছে সংস্কৃতিগত এক সম্মিলনী। হিন্দু সভ্যতায় প্রথম থেকেই একটি বড়ো সাংস্কৃতিক সূত্র প্রকট হয়েছে—সমন্বয়। 'সংস্কৃতি'-প্রবন্ধে একথা বলেছেন সুনীতিকুমার। ঋগ্বেদে এই সমন্বয়ের কথাটি রয়ে গেছে 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'—'যাহা আছে তাহা এক(পণ্ডিতগণ তাঁহাকে ভিন্নরূপে বর্ণনা করেন' [ভারতীয় সংস্কৃতি ও সংস্কৃতভাষা সাংস্কৃতিকী]।

সমন্বয়ের কথাটিকে সুনীতিকুমার বুঝিয়ে দিয়েছেন অত্যন্ত সহজ-কথায় সহজ-ভাবে— যেখানে অনেক রকমের ধর্মমতকে অবলম্বন করে আছে এমন ভিন্ন ভিন্ন জনসমাজকে একত্র বাস করতে হয় আর্য ধর্মমতের স্বাধীনতা সবাই স্বীকার করে বলে, যেখানে নানা নতুন মত গড়ে ওঠে সেখানে, এই সব মতের একটু ঊর্ধ্বে যাঁরা উঠেছেন, তাঁদের মধ্যে নিত্য বা প্রধান স্বরূপগুলিকে বিচার করে আর লৌকিক বা অপ্রধান কথাগুলিকে গৌণ স্থান দিয়ে, তাদের অন্তর্নিহিত ভারসাম্যের দিকে ল(্য রেখে এই সব ধর্ম-মত নিয়ে একটি সমন্বয় একটি

সামঞ্জস্য করবার চেষ্টা হওয়া স্বাভাবিক। ভারতবর্ষের হিন্দুসভ্যতায় নানা মতের সমন্বয় এই ভাবেই হয়েছিল।—এ মত সুনীতিকুমার জ্ঞাপন করেছেন, 'ভারতধর্ম ও হিন্দুযুবকের কর্তব্য' প্রবন্ধে। হিন্দু সভ্যতা-সংস্কৃতির রূপটিকে একই প্রবন্ধে একটি অনুপম উপমায় প্রকাশ করেছেন সুনীতিকুমার ভারতীয় হিন্দুসভ্যতা যেন একখানা ধূপছায়া কাপড়(তার টানার সূতো আর্যসভ্যতা আর মনোভাব(আর পড়েনের সূতো অনার্যদের সভ্যতা আর মনোভাব, দুইয়ে জড়িয়ে হিন্দুসভ্যতার এই চমৎকার বস্ত্রখণ্ড—'টানা পড়েন দুইয়ের আলাদা অস্তিত্ব বার করতে গেলে, বি(-ষণের চেষ্টায় হিন্দু সভ্যতার সম্পূর্ণাঙ্গ যুগের পূর্বাবস্থায় গিয়ে পৌঁছুতে হয়, তখন কাপড় পাই না, পাই দুই বা তার বেশি প্রস্ত সূতো, অসম্পৃত্ত(অবস্থায় রয়েছে।'

সমন্বয় বলতে অন্যের ভালোটুকুতে ভালোবেসে তার সঙ্গে সহযোগিতার চেষ্টায় তাকে আত্মসাৎ করার চেষ্টাকে বোঝায়। সুনীতিকুমারের মতে 'এর সঙ্গে জড়িত আমাদের সভ্যতার দ্বিতীয় মূলকথা সত্যানুসন্ধিৎসা।' সুনীতিকুমার 'সংস্কৃতি' প্রবন্ধে একে বলেছেন 'তত্ত্বানুসন্ধিৎসা'।

'স্বাধীন মন, যাকে কোনও রকমের dogma বা অন্ধ মত চেপে রাখতে পারে না, এমন মন হচ্ছে এই সত্যানুসন্ধানের প্রধান সাধন'। 'সংস্কৃতি' প্রবন্ধে এর স্বরূপ নির্দেশ করেছেন সুনীতিকুমার বিচার বা অনুভূতির পথে, দৃশ্যমান জীবনের অন্তরালের শা(ত-সত্য বা সত্তার অনুসন্ধান ও জীবনে তাঁর উপলব্ধিই হচ্ছে মানুষের প্রধান কাজ। এই সত্যনিষ্ঠা থাকায় অজ্ঞানতা মূর্খতা গোঁড়ামি অন্ধবি(াসের আত্র(মণ-জনিত বিপন্নতা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে ওঠার আত্মশক্তি(ভারতীয় জাতি পেয়েছে।

ভারতসংস্কৃতির তৃতীয় বৈশিষ্ট্য রূপে অহিংসাকে নির্দেশ করে সুনীতিকুমার 'সাংস্কৃতিকী'র পূর্বোত্ত(প্রবন্ধে লিখেছেন 'প্রাণা যথাত্মনোহভীষ্টা ভূতানামপিমূতে তথা। আত্মৌপম্যোন ভূতেষু দয়াং কুর্বন্তি সাধবঃ।—এ তো হচ্ছে আমাদের দেশের সাধারণ কথা।' একদিকে বুদ্ধিশক্তি(স্ফূরণের স্বাধীনতা যেমন ভারত-সভ্যতা দান করেছে, তেমনি সর্ববিধ দম্ভকে চূর্ণ করে দিয়ে 'মানুষকে বি(ব্রহ্মাণ্ডের বিরাট শৃঙ্খলিত বস্তু বা জীব পরম্পরার মধ্যে একটি মাত্র বলে স্বীকার করেছে। ফলত ত্র(মশ জেগেছে—The Sacredness of all life— বোধটি, জেগেছে নম্রতা, জেগেছে দয়া ক(ণা মৈত্রীর বোধ। ব্রাহ্মণের যুগ থেকে এই দয়ার বাণী উদ্‌গীত হয়েছে 'দম্য, দত্ত, দয়ধ্বম্' (আত্মদমন কর, দাও, দয়াভাব পোষণ কর)—ব্রহ্ম-সাধনের এই প্রথম সোপান, বলেছেন উপনিষদ্। বৌদ্ধ মতে জৈন মতে এই জীবে দয়া বা অহিংসার পরমত্বের শি(া হিন্দু গ্রহণ করেছে। সুনীতিকুমার এসব আলোচনার পরে জানিয়েছেন—'হিন্দু চরিত্রের এই অনন্যসাধারণ মাধুর্য্য আর সৌকুমার্য, যে জিনিস দার্ঢ্য আর বীর্য্য থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, এই জীবে দয়ার ফলে হয়েছে।'

গ্রিক রাজা আন্তিআলাকিদাস-এর দূত হেলিওদোরস্ বিদিশায় যে গ(ড়স্তম্ভ স্থাপন করেন তাতে নিজের বৈষ(বধর্ম গ্রহণের কথা উৎকীর্ণ করেছেন, তাতেই তাঁর গৃহীত বৈষ(বধর্মের মূল নৈতিক আদর্শটিও উৎকীর্ণ হয়েছে—'ত্রিনি অমৃত পদানি [সু] অনুচিতানি নেয়ংতি [স্বগং]—দম ত্যাগ অপ্রমাদ।' সুনীতিকুমারের অনুবাদ 'তিনটি অমৃতপদ সুন্দরভাবে অনুষ্ঠান করলে স্বর্গে নিয়ে যায়— সে তিনটি হচ্ছে দম অর্থাৎ আত্মদমন, ত্যাগ আর অপ্রমাদ।'

দম 'ব্রহ্মচর্যের আদর্শ'। ত্যাগ 'আত্মসুখ লাভের কামনা, প্রতিষ্ঠার কামনা ত্যাগ'। সুনীতিকুমারের মতে এই ত্যাগই সব চেয়ে কঠিন। প্রমাদ 'বুদ্ধির মত্ততা, বুদ্ধিভ্রংশ অবস্থা'(এ থেকে মনকে র(া করতে হবে সমস্ত জড়িমা মুত্ত(হয়ে(সুনীতিকুমার লিখেছেন 'সহ বীর্যং করবাবহৈ—বীর্যের সঙ্গে যেন আমরা কাজ করি।'

সুনীতিকুমার 'সংস্কৃতি' প্রবন্ধে দম, ত্যাগ, অপ্রমাদ নিয়ে নাম-মাত্র মন্তব্য করেছেন। কিন্তু অন্যত্র বিস্তৃত

আলোচনায় মহাভারতের শান্তিপর্বের (ো-াকোদ্ধার করে জানিয়েছেন 'দম ত্যাগ অপ্রমাদ—এই তিনটি হচ্ছে ব্রহ্মের ঘোড়া(যে লোক মানসরথে শীল অর্থাৎ চরিত্রবত্তার রিশ্মর দ্বারা সমাযুক্ত(হয়ে আরোহণ করে, হে রাজা, সেই লোক মৃত্যুভয় ত্যাগ করে ব্রহ্মলোকে যায়।'

অন্যত্র সুনীতিকুমার জানিয়েছেন—হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির উৎপত্তি হয়েছিল এক মহৎ বাতাবরণের মধ্যে(এই অনুপ্রেরণা থেকে জাত জীবনীশক্তি(এখন অমৃত-রসপ্রবাহে প্রবাহিত। ভারতে এই মিশ্রসংস্কৃতির উদ্ভবের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা-জগতে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ দেখা দিল—উপনিষদ্, বৌদ্ধদর্শন, ব্রহ্মবাদ ও দেববাদ, ভক্তি(বাদ(এবং বিশিষ্টরূপে ভারতীয়ত্ব, যেখানে দেখা যায়—সব জীবে অহিংসার ভাব, জীবমাত্রেরই জীবনধারণের অধিকারকে স্বীকার করে নেওয়া। এখানে ব্রাহ্মণের সংযম ও তপস্যা এবং জ্ঞান ও সত্যানুসন্ধিৎসা, জৈন যতি ও বৌদ্ধ শ্রমণের সর্বজীবে ক(ণা ও মৈত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে এবং সমগ্র এশিয়াখণ্ডের জনগণের প(ে এইসব ভাব কর্মধারা, তৃষিতের কাছে প্রাণবারির মত এসেছে, এবং সাগ্রহে স্বাগত পেয়েছে। এইসূত্রে মানবজাতির সঙ্গে আত্মীয়তাবোধের আকাঙ(া জাগলো। জাগলো সব মানবের সুখ ও মো(র জন্য আকাঙ(া। ফলে দিবে আর নিবে—মিলাবে মিলিবে—ভাবটি, বসুধৈব কুটুম্বকম্ ভাবটি ফুটে উঠলো ভারত সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্রে। সুনীতিকুমার রবীন্দ্রনাথের বি(েভারতীর মধ্যে ভারত সংস্কৃতির এই প্রাণমন্ত্র আধুনিক ভারতেও গুঞ্জরিত হতে দেখেছেন। বি(েভারতীতে রবীন্দ্রনাথ বি(েনীড়ের স্বপ্ন দেখেছিলেন যত্র বি(ং ভবত্যেক, নীড়ম্(এ স্বপ্নও বসুধৈব কুটুম্বকম্-এর অন্যতর উচ্চারণ সূচিত করে। ভারত সংস্কৃতিতেই বি(েনীড় বাঁধতে পারে, 'সংস্কৃতি' প্রবন্ধে ভারত সংস্কৃতি ও সভ্যতার চিরপুণ্য বাণীটির পরিচয় সুনীতিকুমার দিয়েছেন।

20.3 সারাংশ

নরডিক-আলপীয় আর্যরা ভারত ভূখণ্ডের অনার্য, অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও মোঙ্গলীয় ভোটচীনীয়দের পরাজিত করলেও শেষ পর্যন্ত বিজেতার দর্প ত্যাগ করে তাদের সঙ্গে মিশে যায়। এই মিলন বা সমন্বয়ই হোল ভারতীয় সংস্কৃতির প্রধান সূত্র। অন্যের ভালকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করে তাকে নিজের করে নেওয়াই সমন্বয়ের প্রধান পরিচয়। এরই সঙ্গে জাতি ও সভ্যতার মূলকথা—সত্যানুসন্ধিৎসা। সত্যানুসন্ধান কখনও কোন মতকে আঁকড়ে ধরে থাকে না।

ভারত সংস্কৃতির অপর বড় কথা তার অহিংসা। মানুষ যেহেতু বি(ের বস্তু বা জীবন পরম্পরার মধ্যে একটি—তাই, তার জীবন সম্পর্কে জেগেছে নম্রতা, জেগেছে দয়া-ক(ণা, মৈত্রী বোধ। এ থেকে তাই ভারতবর্ষের মানুষ দম, ত্যাগ ও অপ্রমাদে বি(াস করেছে। এ থেকেই মানুষে মানুষে আত্মীয়তা, মানবজাতির সুখ ও মো(র আকাঙ(ার জন্ম। ফলে দিবে আর নিবে, মিলাবে-মিলিবে 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' হ'ল ভারত সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। এ পথেই রবীন্দ্রনাথ বি(েনীড়ের স্বপ্ন দেখেছেন। ভারত সংস্কৃতিতেই একমাত্র বি(েনীড় বাঁধতে পারে। এটি হ'ল এই এককের মূল কথা।

20.4 অনুশীলনী

নীচের প্র(গুলির উত্তর ক(ন। উত্তর শেষে 88 পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন

1. শূন্যস্থান পূরণ ক(ন

   (ক) সমন্বয় বলতে __________ভালোটুকুকে __________তার সঙ্গে সহযোগিতার __________তাকে __________করার চেষ্টাকে বোঝায়।

(খ) স্বাধীন মন, যা কোনো রকমের __________বা __________ চেপে রাখতে পারে না, এমন হচ্ছে __________প্রধান __________।

(গ) ভারতে __________উদ্ভবের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা-জগতে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ দেখা দিল __________উপনিষদ্,__________ব্রহ্মবাদ ও দেববাদ __________(এবং বিশিষ্টরূপে______, যেখানে দেখা যায় সব _______ভাব, জীবমাত্রেই _______অধিকারকে স্বীকার করে নেওয়া।

(ঘ) (ভারতবর্ষে) ব্রাহ্মণের ________ও ________এবং ________ও _______জৈন _______ ও বৌদ্ধ __________সর্বজীবে __________ও __________সঙ্গে মিলিত হয়েছে এবং সমগ্র এশিয়াখণ্ডের জনগণের প(এইসব __________ __________সাগ্রহে __________ পেয়েছে।

2. সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্(দিন।

(ক) গ্রিক রাজার দূত হেলিওদোরস্ বিদিশায় গ(ড়স্তম্ভ স্থাপন করে উৎকীর্ণ করেছেন
1. (াত্রধর্ম গ্রহণের কথা
2. বৈষ(বধর্ম গ্রহণের কথা
3. শাক্ত(ধর্ম গ্রহণের কথা

(খ) আত্মসুখ লাভের কামনা, প্রতিষ্ঠার কামনা ত্যাগ হ'ল
1. অপ্রমাদ্য
2. দম
3. ত্যাগ

(গ) 'বি(্বং ভবত্যেক নীড়ম্' হ'ল
1. বি(্বভারতীর প্রাণমন্ত্র
2. রামকৃষ(মিশনের প্রাণমন্ত্র
3. শিল্পশাস্ত্রের প্রাণমন্ত্র

3. (ক) 'ত্রিনি অমৃত পদানি'—অমৃত পদ তিনটি কী কী উল্লেখ ক(ন।

(খ) সং(েপে আলোচনা ক(ন দম, ত্যাগ, অপ্রমাদ।

20.5 উত্তর সংকেত

1. (ক) অন্যের, ভালোবেসে, চেষ্টায়, আত্মসাৎ।
   (খ) dogma, অনুমত, সত্যানুসন্ধানের, সাধন।
   (গ) মিশ্রসংস্কৃতির, বৌদ্ধদর্শন, ভক্তি(বাদ, ভারতীয়ত্ব, জীবে, অহিংসার, জীবনধারণের
   (ঘ) সংযম, তপস্যা, জ্ঞান, সত্যানুসন্ধিৎসা, যতি, শ্রমণের, ক(ণা, মৈত্রীর ভাব কর্মধারা, স্বাগত।
2. (ক) বৈষ(বধর্ম গ্রহণের কথা (খ) ত্যাগ (গ) বি(্বভারতীর প্রাণমন্ত্র
3. (ক) দম, ত্যাগ অপ্রমাদ।
   (খ) সংকেত নিষ্প্রয়োজন। পাঠ্যবস্তু থেকেই উত্তর পাবেন।

20.6 গ্রন্থপঞ্জি

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—সাংস্কৃতিকী।

একক 21 ❑ সুফি-প্রভাব ও ইসলামি উপাদান বাঙালির সংস্কৃতি

গঠন

21.0 উদ্দেশ্য

21.1 প্রস্তাবনা

21.2 মূলপাঠ

21.3 সারাংশ

21.4 অনুশীলনী

21.5 উত্তর সংকেত

21.6 গ্রন্থপঞ্জি

21.0 উদ্দেশ্য

সুফি প্রভাব ও ইসলামি উপাদান বাঙালির সংস্কৃতি শীর্ষক এই এককে আপনি তুর্কি বিজয়ের পর বাঙালি-সংস্কৃতিতে ইসলাম ধর্মের যে প্রভাব পড়েছিল, তার সম্পর্কে কিছু জানতে পারবেন। এর পরিণতিতে, বাঙালির জীবনবোধ ও তার সংস্কৃতিতে যে সমস্ত উপাদান যুক্ত(হয়েছে, তার পরিচয় পাওয়া যাবে। এককটি পাঠ করে আপনি ইসলামি প্রভাবজাত বাঙালি সংস্কৃতির কতকগুলি বৈশিষ্ট্য যেমন জানবেন, তেমনি এ সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণাও আপনার জন্মাবে।

21.1 প্রস্তাবনা

তুর্কি বিজয়ের পর এ দেশে বসবাসকারী তুর্কিরা দিল্লীর সঙ্গে সংযোগ অনেকাংশে বিচ্ছিন্ন হওয়ায়, এ দেশের ধর্মদর্শন ও লোকায়ত বি(াসের প্রভাবে এবং শরিয়তী বন্ধন অনেকটা শিথিল হওয়ায় ত্র(মশ বাঙালি হয়ে ওঠে। এদের মধ্যে ত্র(মশ সুফি ধর্মমত প্রচারক সাধু, ফকির, দরবেশদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। বাংলার নিজস্ব ধর্মীয় উপাদানের মধ্যে মরমীয়ার অনুভব থাকায় সুফি প্রভাব বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে হিন্দুর সংহতির কাছে বাধা পায় শরিয়তী শক্তি(। তাই বাংলার সংস্কৃতিতে শরিয়তী উপাদান নয়, সুফি প্রভাব ব্যাপক ভাবেই আছে। বর্তমান একক এ সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করেছে।

21.2 মূলপাঠ

তুর্কি বিজয়ের সঙ্গেই বাংলার মুসলমান রাজত্বের প্রতিষ্ঠা এবং ইসলাম ধর্মের ব্যাপক প্রসারের সূত্রপাত। এর দুটি সম্ভাব্য ধারা—1. সুফি ধর্মাদর্শ, 2. শরিয়তী ইসলাম ধর্মাদর্শ। এর মধ্যে প্রবলতর, ব্যাপকতর, ও সফলতর ধারা হল প্রথমটি। তুর্কি-বিজয়ের পরে ভারতবর্ষে উত্তরভারতের মুসলমানদের আগমন বেশি সংখ্যায় হয়েছিল। সুনীতিকুমারের মতে এদের এক দলের মধ্যে ছিল সত্যকার আধ্যাত্মিক শক্তি(আর সততা। এরা উদার সুফিমতের ইসলামের প্রচারক ছিল এবং 'ভারতের অনুসন্ধানী চিত্ত জয় করতে স(ম হয়েছিল।' সুফিমতের মধ্যে ছিল সুফি-দর্শন আর অনুষ্ঠান। এই দুইয়ের প্রভাব পড়েছিল 'ভারতের আধ্যাত্মিক

আর ধর্মীয় জীবনে সহজভাবে...।' অন্যদিকে, দ্বিতীয় ধারাটি সর্বভারতীয় (ে ত্রেই প্রতিহত হয়েছিল হিন্দুর সংহতি শক্তি(র কাছে(যদিও মন্দির ভাঙা, হিন্দুর মেয়ে আর ধনরত্ন লুঠ করা, জোর করে ধর্মান্তরিত করার কাজ চলেছিল প্রায় নির্বাধভাবে। সুনীতিকুমার লিখেছেন 'তুর্কের শক্তি(প্রয়োগের বি(দ্ধে দাঁড়াল হিন্দুর শক্তি(, মুসলমান ধর্মপ্রচার বা ধর্মান্তরীকরণ তার গায়ে টক্কর খেয়ে পড়ল—হিন্দুর সংহতি-শক্তি(র কাছে তাকে হার মানতে হ'ল [গোঁসাই তুলসীদাস]। অবশ্যই এ (ে ত্র বিশেষ করে ধর্মগত (ে ত্র। তুর্কিনা তরীকার মাধ্যমে শরিয়তী ইসলামের প্রভাব বিস্তার প্রচেষ্টা বাংলায় তুর্ক-বিজয়ের আগে তেমন কোনো গু(ত্বপূর্ণ অবস্থান রচনা করতে পারেনি(পেরেছিল কিছুটা সুফিরা।

বাংলার তুর্কি-বিজয়ের পরবর্তীকালে দিল্লীর সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন প্রায় এদেশের বাসিন্দা হয়ে ওঠা তুর্কিরা ত্র(মশ বাঙালি হয়ে ওঠায় তাদের কঠোর শরিয়তী বন্ধন শিথিল হয়েছিল। ফলে তুর্ক বিজয়ের পরবর্তীকালে তুর্কিনা তরীকার মাধ্যমে ধর্মপ্রচারের প্রচেষ্টা-পূর্বে শরিয়তী ইসলামের কিছু ধর্মপ্রচারক এসে থাকলেও শরিয়তী প্রসার তেমনভাবে ঘটতে পারেনি। বরং সুফি ধর্মমত প্রচারক সাধু ফকির দরবেশ কলন্দর পীরের প্রভাব বৃদ্ধি পেল। সুফিদের দিক থেকে এর দুটি কারণ নির্ণয় করা যায়—1. সুফিমতের ঔদার্য প্রসারতা স্থিতিস্থাপকতা। মুসলমান আধ্যাত্মিকতার চরম বিকাশ হচ্ছে সুফি-দর্শনচিন্তায়। এই সুফি মতবাদের মধ্যে এমন অনেক জিনিস আছে, কোরানের অনুমোদিত সাধারণ ইসলামি চিন্তাধারার সঙ্গে যার মিল নেই—যার বি(েমানবিকতা আরও বেশি। যেমন সব ধর্মের মধ্য দিয়েই ঈ(েরকে পাওয়া যায়— আবশ্যকতা কেবল ভাবশুদ্ধির(যেমন—ব্রহ্ম বা ঈ(ের, আর মানুষের আত্মা, এই দুয়ের মধ্যে বাস্তবিক-ই কোনো পার্থক্য বা ভেদ নেই— যে ব্রহ্মাত্মবাদ আমাদের বেদান্তের শি(া দেয়। সুফিরা মানুষকে মুসলমান আর অ-মুসলমান—এই দুই বিরোধী পর্যায়ে ভাগ করেননি(আর ঈ(ের জগতে একমাত্র মুসলমানদেরই প্রতি বিশেষভাবে স্নেহশীল, এ রকম blasphemy বা ঈ(েরনিন্দা-মূলক চিন্তার অনুমোদন সুফিরা কখনও করেননি।... বিশেষ কোনো ধর্মের বাইরের বর্ণ বা চিহ্(ধারণ না করেও কোনো ভাবশুদ্ধিযুক্ত(আকাঙ্(া আর প্রার্থনার বলে ঈ(েরানুভূতির পথে মানুষ এগোতে পারে, সে দিকেও তাঁদের ল(্য ছিল। 2. তাঁদের আনুষ্ঠানিক ত্রি(য়াপদ্ধতির চমৎকারিত্ব। ভারত জয়ের প্রথম যুগে এঁরা (সুফিরা) সুদূর পল্লীঅঞ্চলে গিয়ে আস্তানা নিতেন, আর বুজ(গি বা কেরামতি জাহির করে, অর্থাৎ সিদ্ধাইয়ের ম্যাজিক দেখিয়ে, ব্রাহ্মণ পরিবেশ থেকে দূরে অবস্থিত অজ্ঞ আর নির(র মানুষদের বশে আনতেন। সহজ-সাধন, নাম-জপ প্রভৃতির দিকেই আকর্ষিত করা এঁদের প্রচারের একটা মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।...ফলে, ভিতর থেকেই হিন্দু সমাজ ভাঙন ধরার ল(ণ দেখা দিল।

সুনীতিকুমার 'বাঙ্গালীর সংস্কৃতি' গ্রন্থের জাতি সংস্কৃতি ও সাহিত্য-অধ্যায়ে যেমন ইসলামি শাসকদের ত্র(মশ বাঙালি হয়ে ওঠার কথা বলেছেন, ইসলামিকরণের কথা বলেছেন, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চবর্গীয়দের দ্বারা সাংস্কৃতিক সামাজিক ও ধর্মনৈতিক প্রতিরোধের কথা বলেছেন, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে সুফি মতবাদের প্রচার ও প্রসারের কথাও জানিয়েছেন এবং তার মধ্যে দারা শিক্হো-পরিকল্পিত দুই সাগরের সম্মেলনের রূপটির বা 'মজম্ উ-ল্-বহরৈন্'-র পরিচয় পেয়েছেন।

সেখানে তাঁর কথা 'বাঙ্গালা দেশে যে মতের মুহম্মদীয় ধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা খাঁটি শরিয়তী অর্থাৎ কোরান অনুসারী ইস্লাম নহে। শরিয়তী মত, অন্য কোনও ধর্মের সঙ্গে সহযোগ করিতে প্রস্তুত নহে(বাঙ্গালা দেশে ইসলামের সহিত সুফি মতই বেশী প্রসার লাভ করে। সুফি মতের ইসলামের সহিত বাঙ্গালার

সংস্কৃতির মূল সুরটুকুর কোনও বিরোধ হয় নাই। সুফি মতের ইসলাম সহজেই বাঙ্গালার প্রচলিত যোগমার্গ ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক সাধনমার্গের সঙ্গে একটা আপস করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিল।' প্রথমত, সুফিবাদ সর্বভারতীয় বৈষ(বাচার ও ভক্তি(বাদের সঙ্গে মিলেমিশে পরো(ভিতর থেকে গৌড়ীয় বৈষ(ব ধর্মান্দোলনের উৎসে কিছুটা সত্রি(য় হয়েছে। দ্বিতীয়ত, সুফি-ভক্তি(বাদ সাধনতত্ত্ব ও অনুষ্ঠান এদেশে প্রচলিত সহজিয়া সাধনতত্ত্বের সঙ্গে মিলে অনেক ছোটো-বড়ো গুহ্য সাধনাশ্রয়ী হিন্দু-মুসলিম ধর্ম-নিরপে(উপাসক সম্প্রদায়ের জন্ম দিয়েছে। তৃতীয়ত, হিন্দু নাথপন্থা ও ইসলামি পন্থা অনেকটা মিশ্রণের মধ্য দিয়ে এক সমান্তরাল ধারার সৃষ্টি করে নাথপন্থী সাধন ও সাহিত্যধারার পথকে প্রসারিত করেছে। চতুর্থত, দুই ধর্মভাবনার দ্বন্দ্ব ও মিশ্রণে সত্যপীর, সত্যনারায়ণ ইত্যাদির মতো লৌকিক দেবদেবী-কুলের সৃষ্টি হয়েছে।

সুনীতিকুমার দেখিয়েছেন, এর ফলে বাঙালির সংস্কৃতিতে মুসলমান উপাদান যেটুকু এসেছে, তা বাঙালির জীবন ও প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই এসেছে। বাঙালির হাজার বছরের সংস্কৃতির দিগ্‌দর্শনীতে বাংলার বাস্তব সভ্যতা, অনুষ্ঠানমূলক সংস্কৃতি এবং মানসিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি যে তালিকা পেশ করেছেন তার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে বাঙালি সংস্কৃতির ইসলামি উপাদান। বেতের কাজ, বাঁশের কাজ, গাজীর পট, হাতির দাঁতের শিল্প, গুড় পাটালি, মাংসপাকের বিশেষ রীতি(ঢাকার জামদানি, শ্রীহট্টের শীতল পাটি প্রভৃতির মধ্যে রয়ে গেছে বাস্তব সভ্যতাগত উপাদান। কাঁথা সেলাই, ত্রীড়া কসরৎ, ঈদের উৎসব শাহমাজারের অনুষ্ঠান ইত্যাদির মধ্যে আছে অনুষ্ঠানমূলক সংস্কৃতির উপাদান। বাউল, ভাটিয়াল, জারি, মারফতি মার্সিয়া গান এবং খেয়াল টপ্পা ঠুংরি ইত্যাদির (এগুলি উত্তরভারত থেকে কিছুটা মোগল সংস্কৃতির ছায়া নিয়ে এসেছে) মধ্যে এবং মোগল আমলে নিখিল ভারতীয় সভ্যতার স্বাদবাহী জৈসীয় পদুমাবৎ-এর কাব্যের অনুবাদ পদ্মাবতী ইত্যাদিতে রয়েছে মুসলমান উপাদান। কিন্তু এসব উপাদান এমনভাবে মিশে গেছে যে বিশিষ্ট ধর্মগত স্বাতন্ত্র্য তাতে আর থাকেনি, সবটাই হয়ে উঠেছে বাঙালি সংস্কৃতির সৌরভে সুরভিত।

সুনীতিকুমার 'বাঙ্গালীর সংস্কৃতি'-গ্রন্থে সংকলিত 'জাতি সংস্কৃতি ও সাহিত্য' প্রবন্ধের বর্জিত অংশে বাঙালি-মুসলমানদের সংকটের কথা জানিয়েছেন(তা উৎসাহী-পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তির প্রত্যাশায় উদ্ধার করা হ'ল—

'বাঙ্গালী মুসলমান এখনও মনে প্রাণে খাঁটি বাঙ্গালী থাকায়, নব-আলোচিত বঙ্গ-বহির্ভূত মুসলমানী সংস্কৃতি তাহার প্রাণের সমস্ত আকাঙ(া মিটাইতে পারিতেছে না। এই আলোচনা মুষ্টিমেয় ইংরাজি শি(িত মুসলমানদিগের মধ্যেই নিবদ্ধ, এবং ইহাদের জ্ঞান মূখ্যতঃ মুসলমান-সভ্যতা-বিষয়ক ইংরেজি পুস্তক হইতেই সংগৃহীত। বাঙ্গালী মুসলমান এখন বিষম দো-টানায় পড়িয়াছে। সজ্ঞানভাবে একটি জাতির মনের মোড় ফিরানো কঠিন ব্যাপার—অজ্ঞাতসারেই এই কার্য্য হইয়া থাকে। শি(িত বাঙালী মুসলমানদের কেহ কেহ এখন একটি "বাঙ্গালী মুসলমান সংস্কৃতি" গঠনের প্রয়াস করিতেছেন। সহজ বাঙ্গালীত্বের দাবিতে—বাঙ্গালীর ছেলে বলিয়া বাঙ্গালীর ঐতিহ্য, বাঙ্গালী সংস্কৃতি যে তাহারই, এই সহজ বোধে—বাঙ্গালী মুসলমান সমগ্র ভারতীয় বা হিন্দু সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী। এই উত্তরাধিকার কিন্তু এখন তাঁহার মনঃপূত হইতেছে না—কারণ ইহার সঙ্গে কোরানের বা আরব জগতের কোনও যোগ নাই। তাহার মনে অস্বস্তির ভাব আসিয়াছে। যতই কেন "মুসলমান ইতিহাস", "মুসলমান সভ্যতা" বলিয়া বাঙ্গালী চেষ্টা ক(ন না, খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতকে আরবেরা সিরিয়া, পারস্য ও মিশরে যে বীরত্ব দেখাইয়া সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল,

সেই বীরত্বের কাহিনীতে, ইংরেজিতে যাহাকে বলে legitimate pride—ন্যায়সংগত গর্ব—তাহা তাঁহার মনের অন্তঃস্থল হইতে অনুভব করা কঠিন। বাঙ্গালী মুসলমানের প(, সপ্তম শতকের আরব শৌর্য্য, বা দশম শতকের বাগ্‌দাদের আরব, পারস্য ও সিরীয় পাণ্ডিত্য ও মানসিক উৎকর্ষ, অথবা পঞ্চদশ শতকের তুর্কি বীরত্ব— কেবল সমধর্মিত্বের দোহাই পাড়িয়া এগুলি লইয়া গর্ব করিতে রসবোধ-যুক্ত(যে কোনও শি(িত বাঙ্গালী মুসলমানের মনে বাধো-বাধো লাগিবে, তাঁহার হাসি পাইবে(আমার "মুসলমানজাতি" কত বড়ো, এই গর্ব করিয়া ব্রাহ্মণ ঘরের ছেলে উর্দু কবি ইক্‌বালের উক্তি(— হে আন্দালুসিয়ার পুষ্পোদ্যান, সে দিন তোমার স্মরণে আছে কি, যে দিন তোমার শাখায় শাখায় আমাদের নীড় অবস্থিতি করিত (অর্থাৎ আমাদের জাতিকে কোন সময়ে স্পেন দখল করিয়াছিল)(মঘ্‌রেব (মরক্কোর) ম(ভূমির নদীর তীরে আমাদেরই আজান-ধ্বনি গুঞ্জিত হইয়াছিল (অর্থাৎ আমরা মুসলমানের মরক্কো জয় করিয়াছিলাম)—ইত্যাদি গৌরব-গাথা তাঁহার কাছে নিজ ভারতীয় বা বাঙ্গালীত্বের দৈন্যকে যেন উপহাস করিবে। কোন বাঙ্গালী রোমান-ক্যাথলিক খ্রিষ্টান গর্ব করে—"আমরা রোমান-ক্যাথলিক জাতির লোক, আমরা কত বড়ো! আমাদের জাতি স্পেন হইতে আমেরিকায় গিয়া আমেরিকা দখল করিয়াছিল— মেক্সিকো ও পে(র মতো দুই-দুইটা সুসভ্য জাতির রাজ্য হেলায় জয় করিয়া সেখানে আমাদের ধর্মের ধ্বজা উড়াইয়াছিল(আমাদের রোমান-ক্যাথলিক জাতি পর্তুগাল হইতে বাহির হইয়া ব্রেজিল দখল করিয়াছিল, ভারতের সমুদ্রপথে দোর্দণ্ডপ্রতাপে রাজত্ব করিত(আমাদের জাতি-ই ফ্রান্সে, ইটালীতে, স্পেনে, জার্মানীতে কত বড়ো-বড়ো গির্জা নির্মাণ করিয়াছে, ভাস্কর্য ও চিত্রবিদ্যায় কত কৃতিত্ব দেখাইয়াছে, কত দর্শন-শাস্ত্রের বই লিখিয়াছে, কত জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচার করিয়াছে",—তাহা হইলে ইহা যেমন শুনায়, তুর্কি, আরব, শামী, মিসরী, মঘরেবী ও হিস্পানীদের কীর্তি-কলাপ লইয়া সগৌরবে যদি মাতামাতি করে, তবে তাহা তেমনই যুগপৎ হাস্যকর এবং ক(ণার উদ্রেককর ব্যাপার বলিয়া সহৃদয় ব্যক্তি(-মাত্রেরই মনে লাগিবে।'

21.3 সারাংশ

তুর্কি বিজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলার মুসলমান রাজত্বের প্রতিষ্ঠা এবং সেই সঙ্গে ইসলাম ধর্মেরও প্রসারের সূচনা। ইসলামের দুটি ধারা সুফি ও শরিয়তী ধর্মাদর্শ। সুফি-দর্শন ও অনুষ্ঠানে বাঙালি ভাবাদর্শের অনেক মিল ছিল। সুফিদের মধ্যে সত্যকার আধ্যাত্মিকশক্তি(আর সততা ছিল, তাদের ঔদার্য ও সহনশীলতা বাঙালির ধর্মীয় জীবনে প্রভাব ফেলেছিল। শরিয়তী দর্শন মানুষকে মুসলমান আর অ-মুসলমানে ভাগ করে শক্তি(প্রয়োগ করে তাকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়। আগ্রাসী শক্তি(নিয়ে ধর্মান্তরকরণের ধর্মীয় কৃত্য পালন করা হচ্ছে বি(াস করে, তাই তাকে হিন্দুর সংহত শক্তি(র কাছে হার মানতে হয়েছিল।

এদিকে বাংলায় বসবাসকারী বিজয়ী তুর্কিরা কালত্র(মে দিল্লীর সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় ত্র(মশ বাঙালি হয়ে ওঠে। তাদের কঠোর শরিয়তী বন্ধন শিথিল হয়। সুফি মত প্রচারক সাধু, ফকির, দরবেশ, পীরের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। এঁরা বি(েমানবতার বাণী তুলে ধরেন। বলেন, সব ধর্মের মধ্য দিয়েই ঈ(েরকে পাওয়া যায়—প্রয়োজন ভাবশুদ্ধির বেদান্তের ব্রহ্মাত্মবাদের সঙ্গে তার আর ভেদ থাকে না।

বাংলাদেশে যে মুহম্মদীয় ধর্ম প্রসারিত হয়েছিল তা খাঁটি শরিয়তী ইসলাম নয়, সেখানে সুফিমতের প্রভাব ছিল সমধিক। সুফিমতের ইসলাম, সহজেই বাংলায় প্রচলিত যোগ ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক সাধন মার্গের সঙ্গে সমন্বিত হতে পেরেছিল। সুফিবাদ, বৈষ(ববাদ ও ভক্তি(বাদের সঙ্গে মিশে গৌড়ীয় বৈষ(ব

ধর্মান্দোলনকে বাস্তবায়িক করেছিল। এই সুফি ভত্তি(বাদ সাধনতত্ত্ব ও অনুষ্ঠান এদেশে প্রচলিত সহজিয়া সাধনতত্ত্বের সঙ্গে মিশে অনেক গূহ্য সাধন-পন্থা ও সাহিত্য ধারাকে প্রসারিত করেছে। হিন্দু ও সুফি ধর্মভাবনার মিশ্রণে সত্যনারায়ণ ও সত্যপীর-এর সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে বাঙালির সংস্কৃতিতে বহু ইসলামী উপাদান এসেছে—গাজীর পট, কাঁথা শিল্প, বাঁশবেতের কাজ, ঈদের উৎসব, পীরের মাজারের অনুষ্ঠান, ভাটিয়ালি, জারি, মারফতি গান প্রভৃতি স্মরণযোগ্য। খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরি প্রভৃতিতে মোগল সংস্কৃতির প্রভাব সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু এ সবের সবটাই হয়ে উঠেছে ত্র(মান্বয়ে বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতি। জায়সীর 'পদুমাবৎ'-এ মুসলমানী উপাদান থাকলেও তা বাঙালি জীবনে এমনভাবে মিশে গেছে যে, সেখানে আর তার ধর্মগত স্বাতন্ত্র্য থাকে নি।

21.4 অনুশীলনী

নীচের প্র(গুলির উত্তর ক(ন। উত্তর শেষে 94 পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

1. শূন্যস্থান পূরণ ক(ন

   (ক) এদেশের বাসিন্দা হয়ে ওঠা_____ত্র(মশ _____হয়ে ওঠায় তাদের কঠোর _____ বন্ধন _____হয়েছিল।

   (খ) সব ধর্মের মধ্য দিয়েই_____পাওয়া যায়, আবশ্যকতা কেবল _____ যেমন _____ বা _____আর মানুষের আত্মা।

   (গ) বাঙ্গালা দেশে যে মতের _____ প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা খাঁটি _____ অর্থাৎ ____ অনুসারী _____ নহে। _____ মত, অন্য কোনও ধর্মের সঙ্গে _____ করিতে প্রস্তুত নহে, বাঙ্গালা দেশে _____ সহিত _____ মতই বেশী প্রসার লাভ করে।

2. নীচের বত্ত(ব্যগুলি ঠিক বা ভুল তা টিক (✓) চিহ্নি(ত ক(ন

   (ক) সুফি-ভত্তি(বাদ সাধনতত্ত্ব ও অনুষ্ঠান এদেশে প্রচলিত সহজিয়া সাধনতত্ত্বের সঙ্গে মিশে অনেক ছোটবড়ো গুহ্য সাধনাশ্রয়ী হিন্দু-মুসলিম ধর্ম-নিরপে(উপাসক সম্প্রদায়ের জন্ম দিয়েছে। ☐

   (খ) (স্বতন্ত্র) দুই ধর্ম ভাবনার সংঘাতে সত্যপীর, সত্যনারায়ণ, দুটি লৌকিক দেবতার সৃষ্টি।

   (গ) বাঙালি মুসলমানের প(, সপ্তম শতকের আরব শৌর্য বা দশম শতকের বাগদাদের আরব পারস্য ও সিরীয় পাণ্ডিত্য...
   যে কোনো শি(িত বাঙালি মুসলমানের মনে বাধো বাধো লাগিবে

3. (ক) বাঙালি সংস্কৃতিতে ইসলামি উপাদানের সং(িপ্ত পরিচয় দিন।

   (খ) 'বাঙালি মুসলমান সংস্কৃতি' সম্পর্কে আপনার ধারণা বুঝিয়ে লিখুন। এ সম্পর্কে আপনার মতামত দিন।

21.5 উত্তর সংকেত

1. (ক) তুর্কিরা, বাঙালি, শরিয়তী, শিথিল।
   (খ) ঈশ্বরকে, ভাবশুদ্ধির, ব্রহ্ম, ঈশ্বর।
   (গ) মুহম্মদীয়, ধর্ম, শরিয়তী, কোরান, ইসলাম, শরিয়তী, সহযোগ, ইসলামের, সুফি।
2. (ক) (ক) ঠিক, (খ) ভুল, (গ) ঠিক।
3. ক ও খ—উত্তর সংকেত নিষ্প্রয়োজন।

21.6 গ্রন্থপঞ্জি

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—সাংস্কৃতিকী।
মুহম্মদ এনামুল হক বঙ্গে সুফি প্রভাব।

ককক 22 চাভাপ্রাদেবর্ত ভাতীক্ষ্যং-লীঙ্গাচ

নর্ঠ

22.0 ভূমিকা

22.1 প্রস্তাবনা

22.2 কোরার্থার (প্রথম অংশ) নির্দেশনা ভাব-আলোচনা

22.3 আলোচনা (প্রথম অংশ)

22.4 অনুশীলনী 1

22.5 কোরার্থার (দ্বিতীয় অংশ) নির্দেশনা অনুশীলনী

22.6 আলোচনা (দ্বিতীয় অংশ)

22.7 অনুশীলনী 2

22.8 উত্তর সংকেত

22.9 গ্রন্থপঞ্জি

22.0 ভূমিকা

[illegible]

22.1 প্রস্তাবনা

[illegible]

হয়েছে রসসাহিত্য ও আখ্যানমূলক কাব্য। নব্যন্যায় ও স্মৃতিশাস্ত্র চর্চার উজ্জীবন যেমন ঘটেছে, তেমনি নারীজীবনেও যে পরিবর্তন এসেছিল, সে প্রমাণ পাওয়া যায় সীতাদেবী, জাহ(বী দেবীর মতো আচার্য-পত্নীদের সম্মাননায়। এই সমস্ত ঘটনা শ্রীচৈতন্যপ্রভাবে সে সময়ের সৃজনশীলতার রূপটি তুলে ধরেছে।

22.2 মূলপাঠ (প্রথম অংশ) শ্রীচৈতন্য ভাব-আন্দোলন

"বীজের আত্মপ্রকাশের জন্য যেমন কর্ষিত (ে ত্র প্রয়োজন, সংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশের জন্যও তেমনি সুকর্ষিত মনোভূমি তথা পরিশ্রুত চেতনা আবশ্যক, তাই সংস্কৃতির স্রষ্টা মাত্রেই বিজ্ঞ এবং বিবেকবান, সুন্দরের ধ্যানী ও আনন্দের অন্বেষা, বুদ্ধি ও বৃদ্ধির সাধক, মঙ্গল ও মমতার বাণীবাহক এবং প্রীতি ও প্রফুল্লতার উদ্ভাবক। চরিত্রবল, মুক্ত(বুদ্ধি ও উদারতার ঐ(র্য এমন মানুষের সম্বল ও সম্পদ। বেদনামুক্তি(এবং আনন্দ অন্বেষাই এমন মানুষের জীবনসত্য। এ(ে ত্রে সিদ্ধির জন্য প্রয়োজন সুন্দর ও কল্যাণের প্রতিষ্ঠা(আর এই সৌন্দর্যপ্রতিষ্ঠা ও কল্যাণকামিতাই সংস্কৃতি।" চৈতন্যদেব মধ্যযুগে অনুরূপ সুকর্ষিত মনোভূমির পরিচায়ক স্রষ্টা পু(ষ এবং সৌন্দর্য অন্বেষী কল্যাণকামী ব্যক্তি(ত্ব। বিশিষ্ট শাসনতন্ত্রের বা বিশেষ আমলের আধিপত্যের পরিবর্তে কেবল তাঁরই ব্যক্তি(শিরোনামে তাই চিহ্নি(ত হয়ে থাকে মধ্যযুগের বাঙালি সংস্কৃতির একটি পর্ব। ইতিহাসের কাছে যদিও এ পর্ব হুসেন শাহী পর্বরূপে পরিচিত।

মধ্যযুগে বিজাতি-বিদেশী-বিভাষী-বিধর্মীর ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয়ের ফলে ব্রাহ্মণ্য সমাজের নির্জিত শ্রেণীর সমাজের মধ্যে যে চেতনা-চাঞ্চল্য ও দ্রোহ দেখা দিয়েছিল উত্তরভারতীয় আদর্শে, ইসলামি সাম্য ও সুফি তত্ত্বের অনুসরণে, বৌদ্ধ ঐতিহ্যের দেশে বাংলায় চৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম প্রচারের মাধ্যমে তা রূপ পেয়েছিল। এই বৈরাগ্যপ্রবণ প্রেমবাদ যেমন সেদিন ব্রাহ্মণ্য সমাজের ভাঙন ও ইসলামের প্রসার রোধ করেছিল, তেমনি পরিণামে বাঙালির সংস্কৃতিকে নব পুষ্টিও দান করেছিল। 'জাতি সংস্কৃতি ও সাহিত্য' প্রবন্ধে আচার্য সুনীতিকুমার সং(িপ্তভাবে সেই পরিচয় দান করেছেন এবং লিখেছেন 'শ্রীচৈতন্যদেবের শি(া ও জীবনী বাঙ্গালী সংস্কৃতিতে অনেকগুলি নূতন ধারা সৃষ্ট বা প্রবর্তিত করিয়াছিল।'

চৈতন্যদেবের অসাধারণ ব্যক্তি(ত্ব বদ্ধ হিন্দু-সমাজকে মুক্তি(দান করার জন্য বদ্ধদ্বার গৃহ ও অঙ্গন ছেড়ে শোভাযাত্রা করে নামগানের সাধনমন্ত্র দান করেছিল, বিভিন্ন পেশার ও বর্ণের মানুষের সঙ্গে ব্যক্তি(গত সম্পর্ক স্থাপন করে সহজ প্রাণাবেগে সকলকে একত্রিত করার মন্ত্রও দান করেছিল। গোঁড়া মুসলিমতন্ত্র ও নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে, স্মার্তক্রি(য়াকাণ্ডের জটিলতা, যান্ত্রিক শুষ্ক আচারসর্বস্বতা, ভণ্ডামী ও জাতপাতের বি(দ্ধে চৈতন্যদেব সোচ্চার হয়েছিলেন, প্রচলিত ধর্মের বি(দ্ধে তাঁর এবং তাঁর পরিকরদের অভিযানে ভক্তি(কেই একটি শক্তি(শালী সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক বিকল্পরূপে উপস্থিত করা হয়েছিল। ফলে হিন্দুধর্ম ব্যাপক সামাজিক ধর্মের রূপ লাভ করেছিল। চৈতন্যদেবের ব্যক্তি(ত্বের আকর্ষণে ঘরমুখো বাঙালি ঘর ছেড়ে নব উদ্যমে পুরী-গয়া-কাশী-মথুরা-বৃন্দাবন ও জয়পুরে গেল। ফলে বাঙালির ভৌগোলিক পরিধির বিস্তার ঘটলো।

শ্রীচৈতন্য জীবনী থেকে জানা যায়, কাজী শ্রীচৈতন্যের নেতৃত্বে নগর-সংকীর্তন বন্ধের আদেশ জারি করলে শ্রীচৈতন্য তা অমান্য করেন। নগর-সংকীর্তন অব্যাহত থাকে। জনমত কাজীর বি(দ্ধে যায়। শ্রীচৈতন্য হয়ে ওঠেন প্রতিবাদের প্রতীক। শুধু তাই নয়, হরিভক্তি(পরায়ণ চণ্ডালও দ্বিজশ্রেষ্ঠ, শ্রীচৈতন্যের এই উক্তি(প্রবল

উন্মাদনার সৃষ্টি করে। ধর্মীয় সংকীর্ণতাকে আঘাত করে। যবন-কুলজ হরিদাস বৈষ(ব ভক্ত(মণ্ডলীতে স্থান পান, মুসলিম রাজমর্যাদা ছেড়ে রূপ-সনাতনও ভক্তি(মার্গে দী(ত হন। ইসলামি আগ্রাসনের কাছে আত্মসমর্পণ না করে, আগ্রাসী শিবিরেই ভাঙন ধরিয়েছিলেন চৈতন্যদেব, নৃপতি হুসেন শাহই সহনশীলতার নীতি ঘোষণা করেছিলেন তাঁর প্রতি এবং কাজী আত্মীয়রূপেই তাঁকে স্বীকৃতি দেন।

আচার্য সুনীতিকুমার চৈতন্যজীবনীর কথা বললেও, তাঁর রচনায় জীবনী-সূত্রের কোনো পরিচয় তেমনভাবে দেননি। কিন্তু চৈতন্য-জীবনী থেকেই জানা যায় ভারত পরিক্র(মার সূত্রেই চৈতন্যদেব হিন্দুর ঐতিহ্যমণ্ডিত তীর্থভূমিগুলির মহিমা পুন(দ্ধার করে স্বাজাত্যবোধ উদ্বোধনের চেষ্টায় যেমন ব্রতী হয়েছিলেন, তেমনি বিধর্মী শাসককুলের বি(দ্ধে নিরস্ত্র অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলনও গড়ে তুলেছিলেন। তাই পরবর্তী পর্যায়ে উত্তরভারতের তথা উত্তরপ্রদেশের মথুরা-বৃন্দাবন-কাশী প্রভৃতি বৈষ(ব সাধনার পীঠস্থানেই শু(হয় ভারতের জাতীয়-সংহতির কাজ। বাঙালি মানসেও তার প্রভাব পড়ে।

চৈতন্য-ধর্মান্দোলন পরো(ত হলেও ইসলামি ধর্মসাধনার বিশেষত সুফি সাধনার ভাবসত্যকে আত্মসাৎ করে আপন অন্তর-শক্তি(কেই প্রমাণ করে। এই ধর্মান্দোলনের ফলে ধর্মাচরণের গণতন্ত্রীকরণ সম্ভব হয়েছিল। চৈতন্যদেবের কাছে জীবমাত্রেই কৃষ(-দাস এবং সঙ্গীত সাধনার সঙ্গীত বা কীর্তনের আকারে জন-সঙ্গীতে রূপান্তরিত। ফলে চৈতন্য-ধর্মান্দোলন এক সর্বমুখী আন্দোলনরূপে বাঙালির জীবনকে অন্তরে-বাইরে স্পর্শ করে নতুন সংস্কৃতির সূচনা করেছিল, যা চৈতন্যসংস্কৃতি বা চৈতন্যপ্রভাবিত সংস্কৃতি।

আচার্য চট্টোপাধ্যায় তাঁর রচনায় চৈতন্যজীবনীর পরিচয় যেমন দেননি, তেমনি তাঁর জীবন নিষ্কাশিত আচরণাবলীর প্রভাবে সাংস্কৃতিক জীবনে যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল, তার পরিচয়ও তেমন দেননি। কেবল বলেছেন ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে এক গৌরবময় বৃহত্তর বঙ্গ প্রতিষ্ঠার কথা। চৈতন্যদেব নাম-সংকীর্তনের মাধ্যমে জাতিভেদের মূলে আঘাত হেনেছিলেন, ব্রাহ্মণে-চণ্ডালে কোলাকুলি করার প্রে(াপট রচনা করেছিলেন, পঙ্‌ক্তি(ভোজন প্রচলিত করেছিলেন এবং বৈষ(ব কীর্তন মহোৎসবে সর্বসাধারণের জন্য দ্বার উন্মুক্ত(করে সুস্থ মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাই কেবল বাঙালির বহির্মুখিতা নয়, বাংলার আভ্যন্তর জীবনেরও সংকীর্ণতা-মুক্তি(র সূত্রে বৃহত্তর বঙ্গ রচনার প্রে(ত রচিত হয়েছিল চৈতন্য-প্রভাবেই। এই প্রভাবের কারণে বাঙালির আত্মিক উন্নতি—সংকীর্ণতা মুক্তি(। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের শিল্পস্তুতি অনুসারে সংস্কৃতি আত্মারই উন্নতিসাধন করে এবং সেই উন্নতির প্রকাশ ঘটে জীবন-প্রবাহে। বাঙালির জীবনেও তা ঘটেছিল।

22.3 সারাংশ (প্রথম অংশ)

তুর্কি বিজয়ের পর বাঙালি জীবনে প্রাথমিকভাবে যে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছিল, ব্রাহ্মণ্য প্রথা ও হিন্দু সংস্কৃতিকে র(ার যে চেষ্টা চলে আসছিল তার মধ্যে অনুদার কাঠিন্য ছিল। ফলে নিম্নবর্ণের হিন্দুকে ধর্মান্তরের

পাদটীকা শ্রীচৈতন্যের জন্ম 18 ফেব্রুয়ারি 1846। প্রথম বিবাহ 1501-1502। দ্বিতীয় বিবাহ 1507। বৈষ(বীয় ভাবের উন্মেষ 1509। সন্ন্যাস 25-26 জানুয়ারি, 1510। পুরী-গমন 4 ফেব্রুয়ারি 1510। দা(ণাত্যে ভ্রমণ এপ্রিল 1510-এ শু(। পুরীতে প্রত্যাগমন 1512। বৃন্দাবনে গমন 1515। এলাহাবাদে আগমন জানুয়ারি 1516। বারাণসীতে আগমন 1516। পুরীতে প্রত্যাবর্তন মে 1516। তিরোধান 29 জুন 1533। (তথ্য-উৎস মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্র(ম সুখময় মুখোপাধ্যায়)

পথে ঠেলে দিতে চৈতন্যদেব বৈধীধর্মের পরিবর্তে রাগমার্গের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করায় নতুন ভাব আন্দোলনে প্রয়াসী হলেন। তিনি ইসলামি সাম্য ও সুফিতত্ত্বের ভাবসত্যকে আত্মসাৎ করে প্রেমধর্ম প্রচার করেছেন। এজন্য তিনি হিন্দুসমাজকে মুক্তি(দেবার জন্য তার প্রেম-ভক্তি(কে শোভাযাত্রাসহ নামগানের মাধ্যমে গৃহাঙ্গন থেকে বাইরে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি কোল দিয়েছিলেন হরিভক্তি(পরায়ণ চণ্ডালকে। এমন কি যবনকুলজ হরিদাসকে বৈষ(ব ভক্ত(মণ্ডলীতে স্থান দিয়েছিলেন। প্রচলিত ধর্মের বি(দ্ধে তাঁর এই অভিমান ভক্তি(বাদকেই একটি শক্তি(শালী আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক বিকল্প হিসেবে উপস্থিত করেছিল। শ্রীচৈতন্যের ভারতপরিক্র(মা ঘরমুখো বাঙালিকে পুরী-গয়া, মথুরা-বৃন্দাবন যাত্রায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। শ্রীচৈতন্যই প্রথম কাজীর শাসনের বি(দ্ধে নিরস্ত্র অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর সর্বতোমুখী আন্দোলন, বাঙালির জীবনে নতুন সংস্কৃতির সূচনা করেছিল।

22.4 অনুশীলনী

নীচের প্র(গুলির উত্তর ক(ন। উত্তর শেষে 102 পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন

1. শূন্যস্থান পূরণ ক(ন
   (ক) বীজের আত্মপ্রকাশের জন্য যেমন_____প্রয়োজন, সংস্কৃতির _____ও _____ জন্যও তেমনি _____মনোভূমি _____আবশ্যক।
   (খ) বৈরাগ্যপ্রবণ_____ যেমন সেদিন _____সমাজের ভাঙন ও _____প্রসার রোধ করেছিল তেমনি পরিণামে _____নব পুষ্টিও দান করেছিল।
   (গ) চৈতন্যদেবের ব্যক্তি(ত্বের আকর্ষণে_____বাঙালি_____ ছেড়ে নব উদ্যমে_____কাশী _____ _____ও জয়পুরে গেল।
   (ঘ) শ্রীচৈতন্য-জীবনী থেকে জানা যায় কাজী শ্রীচৈতন্যের_____নগর-সংকীর্তণ_____জারি করলে _____অমান্য করেন।
   (ঙ) চৈতন্যদেব _____মাধ্যমে _____মূলে আঘাত হেনেছিলেন,_____ কোলাকুলি করার প্রে(াপট রচনা করেছিলেন, _____প্রচলিত করেছিলেন।
2. সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্(দিন

(ক) সংস্কৃতির স্রষ্টা মাত্রেই	1. বিজ্ঞ, বিবেকবান এবং সুন্দরের ধ্যানী 2. গোঁড়া মুসলিম তন্ত্রে বি(াসী 3. স্মার্তক্রি(য়াকাণ্ডে আস্থাশীল
(খ) চৈতন্যের জন্ম	1. 18 ফেব্রুয়ারি 1486 2. 4 ফেব্রুয়ারি 1485 3. 25-26 জানুয়ারি 1510
(গ) চৈতন্যের নবদ্বীপে বাসের সময় বাঙলার শাসনকর্তা	1. শেরশাহ 2. নাসি(দ্দিন শাহ 3. হুসেন শাহ

3. (ক) বাঙলার সংস্কৃতিতে চৈতন্যদেবের তিনটি অবদানের কথা সং(েপে লিখুন।
   (খ) "কাজী শ্রীচৈতন্যের নেতৃত্বে নগর-সংকীর্তন বন্ধের আদেশ জারি করলে শ্রীচৈতন্য তা অমান্য করেন।" এই ঘটনার তাৎপর্য বুঝিয়ে লিখুন।
   (গ) শ্রীচৈতন্য বাঙালির ভৌগোলিক পরিধির বিস্তার ঘটালেন।—তাৎপর্য বি(েষণ ক(ন।

22.5 মূলপাঠ (দ্বিতীয় অংশ) শ্রীচৈতন্য সৃজনশীলতা

শ্রীচৈতন্য-পরিবর্তিত ধর্মীয়-ভাবাবেগ মানুষের সৃজনশীলতাকে প্রবুদ্ধ করেছিল। পরমানন্দ লিখেছিলেন, 'নাচিতে জানি না তবু নাচিতে গৌরাঙ্গ বলিতে গাইতে জানি না তবু গাই'। এর ফল হয়েছিল দুটি—[ক] বৈষ(বভক্ত(রা সা(রতার জন্য ব্যস্ত হয়েছিল এবং তা প্রচারে সক্রি(য় হয়েছিল। [খ] বৃদ্ধি পেয়েছিল গীতিকবি ও বৈষ(ব কবিতার সংখ্যা। চৈতন্য-আন্দোলনে সংস্কৃত-বিদ্যাচর্চা কিছুটা গৌণ হওয়ায় বাঙলা ভাষার স্থান সুনির্দিষ্ট হয়েছিল। রচিত হয়েছিল ধর্মীয়-সঙ্গীত, চৈতন্যজীবনী, সন্তজীবনী। ভাষা হয়েছিল ভক্তি(প্রচারের মাধ্যম।

শ্রীচৈতন্য-প্রভাবেই বাঙলা ভাষার অভূতপূর্ব উন্নতি হয়। আচার্য সুনীতিকুমার পূর্বোক্ত(প্রবন্ধে সাহিত্যের কথা সূত্রকারে বলেছেন। শ্রীচৈতন্য-প্রভাবে পদাবলি সৃষ্টি-প্রাচুর্য লাভ করেছিল। তার চরিত্রগত পরিবর্তন ঘটেছিল ভক্তি(রসের সহজ প্রভাবে—বাৎসল্য রসাত্মক ও গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদের সংযোগের ফলে আদি-মধ্যযুগে দেববাদনির্ভর মানবতাবোধের অঙ্কুরোদগম চৈতন্যোত্তর সাহিত্যে সুস্থিত রূপ লাভ করেছিল। বৈষ(ব ধর্মে কৃষ(ও রাধা মানবমানবীর প্রতিরূপ হয়েছিলেন। কৃষে(র নরলীলাই সর্বোত্তম হয়েছিল। স্বয়ং শ্রীচৈতন্যই অন্তর্কৃষ(বহির্রাধা তাই মধ্যযুগে মানবমুখিতা মহৎ মনুষ্যত্বের তথা নরচন্দ্রমার স-ভক্তি(পূজারম্ভ। এই সময়েই মানুষের মধ্যে দেবতার অধিকার এসেছিল। দুর্লভ লোকোত্তর এই রসবুদ্ধি সর্বজনিনতা পেয়েছিল চৈতন্যজীবনাচারে(ফলে অসাধারণ নানাবিধ ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ হয়ে বি(েসাহিত্যের অঙ্গনে রোমান্টিক ও মিষ্টিক কাব্যের সমতুল্যতায় উত্তীর্ণ হয়েছিল মধ্যযুগের পদাবলি সাহিত্য।

আচার্য সুনীতিকুমার জীবনী-সাহিত্যের কথাও বলেছেন। শ্রীচৈতন্য-প্রভাবে সাহিত্যের সীমানায় ইতিহাস-বিবৃতির প্রত্য(তা এসেছিল। আর মানুষের জীবনের তথ্যনিষ্ঠ ও মননশীল তাত্ত্বিক ও দার্শনিক বি(েষণ গু(ত্ব অর্জন করেছিল। কবিতার ভাষায় বাংলার মনীষার শ্রেষ্ঠ ফসলরূপে পাওয়া গিয়েছিল শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকে। তথ্যনিষ্ঠা নিয়ে এসেছিল শ্রীচৈতন্যভাগবত। শ্রীচৈতন্য-তিরোভাবের মানসিক কারণটিকে দেখিয়ে পালাগান রচনা করেছিলেন জয়ানন্দ এবং জনমনের ইচ্ছাকে মূল্য দিয়ে শ্রীচৈতন্য-জীবনী রচনা করেছিলেন লোচনদাস।

গৌড়ীয় বৈষ(ব রসতত্ত্ব, দার্শনিক তত্ত্ব, বিবিধ কাব্য-নাটক সংস্কৃতে রচিত হওয়ায়, সেন যুগের পর থেকে সংস্কৃত-নিবন্ধ রচনায় সীমাবদ্ধ বাঙালির সংস্কৃত-চর্চার (েত্রও চৈতন্য-প্রভাবে প্রসারিত হয়েছিল।

অনুবাদ-সাহিত্যের ধারাতেও পরিবর্তন দেখা গেল এই পর্বে। ভাগবতের বীর্যপূর্ণ কাহিনীর জায়গায় প্রেমমূলক-কৃষ(লীলা-আখ্যান দেখা গেল(রামায়ণ, মহাভারতেও এসেছিল ভক্তি(রসের উচ্ছ্বাস। দেখা দিলেন ভক্ত(বৎসল রাম ও অতি পরিচিত বাঙালি গৃহাঙ্গনের কানু।

পূর্ব-চৈতন্যযুগের মঙ্গলকাব্য মূলত লোকজীবনের সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি আশ্রিত ছিল। চৈতন্যোত্তর মঙ্গলকাব্য এক সর্বাত্মক মিলনসূত্রে গ্রথিত। চৈতন্য-সংস্কৃতির মানবিকতাবোধের স্পর্শে সেগুলি নবরূপ পরিগ্রহ করল কাহিনীকাব্যের মধ্যে ছোট ছোট পদ বা লিরিক স্থান পেতে থাকল।

পদাবলির অনন্য সম্পদের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য-প্রভাবে যুক্ত(হয়েছিল কতকগুলি বিশিষ্ট গায়নরীতি—গরানহাটি, মনোহরাসাহী, রেনেটি, মন্দারিনি ইত্যাদি। তবে শেষ অবধি মনোহরসাহীই প্রচলিত ছিল। এইভাবে শ্রীচৈতন্য-প্রভাবেই উদ্ভাবিত হয়েছিল বাঙালির নিজস্ব সঙ্গীতের প্রাণস্বরূপ কীর্তন গান।

আচার্য সুনীতিকুমার শ্রীচৈতন্য-প্রভাবে নবদ্বীপের বিশেষ পরিস্থিতির কথা বলেছেন। এবং নবদ্বীপের সঙ্গে বহির্বঙ্গ এবং রাঢ়বঙ্গের বিশেষত বিষ্ণু(পুরের সংযোগের কথা উল্লেখ করেছেন, যা গ্রাম্য-সংস্কৃতি-নির্ভর বাংলার জীবনসংস্কৃতিতে নগর সংস্কৃতির বা নাগরিকতার প্রভাব বিস্তার করেছিল। শ্রীচৈতন্য-প্রভাবেই শিল্পকলায় খ্যাত বিষ্ণু(পুর যে বিশেষ সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল তার কথা সুনীতিকুমার জানিয়েছেন। বলেছেন 'ইহার কারণ যেমন একদিকে ছিল শ্রীচৈতন্যদেবের শি(া, অন্যদিকে ছিল বাঙ্গলাদেশের স্বাধীন মুসলমান নরপরিদের হাত হইতে মুক্ত(হইয়া মোগল সম্রাটের অধীন হওয়া।' বিষ্ণু(পুরের মল্লরাজাদের রাজ্যের অন্তর্গত গোপালপুর গ্রামে বৃন্দাবন থেকে নিয়ে আসা দুইগাড়ি ভর্তি পুঁথি লুঠ হবার পর শ্রীনিবাস লুণ্ঠিত পুঁথির খোঁজে এলেন বিষ্ণু(পুরে। সেখানে এক বিচার-সভায় তিনি সভাপণ্ডিত ব্যাসাচার্যকে পরাজিত করলেন। ব্যাসাচার্য এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষক অন্ত্যজ (বাগ্‌দিজাতীয়) রাজা বীর হাম্বীর শ্রীনিবাসের শিষ্য হয়ে বৈষ(ব ধর্ম গ্রহণ করলেন। বীর হাম্বীরের বৈষ(বীয় নাম হ'ল চৈতন্যদাস। লুণ্ঠিত পুঁথিও ফিরে পেলেন শ্রীনিবাস। বিষ্ণু(পুর এইভাবে শ্রীচৈতন্যপ্রভাবে পরিবর্তনের মুখোমুখি হয়েছিল।

শ্রীচৈতন্য-প্রভাবে সারস্বত সাধনা-সং(-ষ্ট সাংস্কৃতিক ((ত্রটি যে উজ্জীবিত হয়েছিল, পরিপুষ্টি লাভ করেছিল, তার পরিচয় দু'ভাবে আচার্য সুনীতিকুমার দিয়েছেন, [ক] সেই সময়ে বাঙালির বুদ্ধির প্রকাশ নব্যন্যায়ের ও স্মৃতিশাস্ত্রের পণ্ডিতদের মধ্যে কুল্লুক ভট্ট, মধুসূদন সরস্বতী, আগমবাগীশ শ্রীকৃষ(ানন্দ প্রমুখের টীকা ও সংকলনের মেধা যেমন দেখা যায়, তেমনি রূপ সনাতন শ্রীজীব বি(্বনাথ চত্র(বর্তী প্রমুখের পাণ্ডিত্যও দেখা যায়। [খ] বাঙালির প্রতিভা বাইরে বরণীয় হয়ে উঠেছিল—1728 খ্রিস্টাব্দে বিদ্যাধর পণ্ডিত জয়পুর নগর স্থাপনে সহায়তা করেছিলেন। মধুসূদন সরস্বতী শঙ্করাচার্যের মতকে উত্তরভারতে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

চৈতন্য-সংস্কৃতির প্রভাবে বাংলার নারীজীবনে এক পরিবর্তন এসেছিল। বৈষ(ব-গোষ্ঠীর পরিচালিকারূপে সীতাদেবী, জাহ(বা দেবীর মতো আচার্যপত্নীরা সম্মানিত হয়েছিলেন। বাংলার অন্দরমহলে স্ত্রী শি(ার প্রসার গু(ত্ব পেয়েছিল। সেখানে গৃহশি(া-রূপে বৈষ(বীরা নিযুক্ত(হতেন। অন্যদিকে ব্রাহ্মণ-নির্দেশিত আচার-আচরণের বি(দ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে চৈতন্যদেব বিধবা-বিবাহ প্রচলন করেন। নিজ পত্নীকে স্বনির্বাচিত করে তুললেন এবং তথাকথিত লৌকিক আচার-অনুষ্ঠানের পরিবর্তে মালাবদল বা কণ্ঠীবদলের বিবাহ প্রচলন করলেন। নামসংকীর্তনের সময় একই আসনে স্ত্রী-পু(ষের অবাধ যোগদান ল(্য করা গেল। ফলে বাঙালির জীবনধারা অর্থাৎ সংস্কৃতিও চূড়ান্ত পরিবর্তনের স্তর স্পর্শ করল।

চৈতন্যদেবের প্রভাবে বাঙালি যখন বহির্বঙ্গে ত্র(মশ প্রভাব বিস্তার করল, তখন বাংলার বাস্তব সংস্কৃতি তথা বাস্তুশিল্প বস্ত্র-সংস্কৃতি ইত্যাদির নবজীবন লাভ সম্ভব হয়েছিল। দিল্লী, আগ্রা, জয়পুর, চিতোর থেকে পারস্য তুরস্ক পর্যন্ত সর্বত্র রাজদরবারে ঢাকাই মসলিনের চাহিদা বেড়ে গিয়েছিল। ফলে বাংলার অর্থনৈতিক জীবনেও পরিবর্তন এসেছিল। আবার বাংলার বাঁশের তৈরি কুঁড়েঘরের বাঁকা ধাঁচটি রেওটি নাম রাজপুত মোগল বস্তুশিল্পে স্থান পেয়েছিল। ফলে বাঙালির গ্রামীণ সভ্যতা সেই প্রথম নিখিল ভারতীয় সভ্যতায় অংশগ্রহণে একটা বড় সুযোগ পেল। সপ্তদশ শতকেই উত্তরভারতের লোকভাষা হিন্দী থেকে বাংলাতে দুটি বই অনূদিত হয়েছিল—ভক্ত(মাল ও পদুমাবৎ। প্রথমটি বৈষ(ব গ্রন্থ, দ্বিতীয়টি সুফি প্রভাবিত রোমান্টিক

প্রেমের আখ্যান। চৈতন্য-প্রভাবে প্রশস্ত বাঙালি হৃদয় এদের গ্রহণ করেছিল, অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য-সংস্কৃতির প্রভাবে বাঙালি হয়েছিল নিখিল ভারতীয় সংস্কৃতির অংশীদার।

22.6 সারাংশ (দ্বিতীয় অংশ)

শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত ধর্মীয় ভাবাবেগ মানুষের মনে সৃজনশীলতাকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। বৈষ(ব ভক্ত(রা সা(রতায় আগ্রহী হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে অন্তরের টানে অনেকে বৈষ(ব গীতিকবিতা রচনা এবং সংস্কৃত বিদ্যাচর্চার পাশাপাশি বাংলা ভাষায় ধর্মীয় সংগীত, চৈতন্য ও অন্যান্য সন্ত জীবনী রচনা করেছেন। এভাবে বাংলা ভাষা হয়ে উঠেছিল ভক্তি(প্রচারের অন্যতম মাধ্যম। শ্রীচৈতন্য প্রভাবে প্রেমভক্তি(বাদ প্রচার-সূত্রে বাৎসল্য রসাত্মক গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ রচিত হওয়ায় দেববাদনির্ভর মানবতাবোধ কৃষে(র নরলীলাই সর্বোত্তম— চৈতন্যই অন্তর্কৃষ(বহির্রাধা-মতবাদের সূত্রপাত ঘটেছে। সংস্কৃতে গৌড়ীয় বৈষ(ব রসতত্ত্ব ও দার্শনিকতত্ত্ব প্রচারের পাশাপাশি বাংলায় জটিল দার্শনিক বি(-ষণাত্মক আলোচনা (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত) ও তথ্যনিষ্ঠ উপস্থাপনায় (শ্রীচৈতন্যভাগবত) এ সময় কোনো বাধা সৃষ্টি হয়নি। অনুবাদ সাহিত্যে ভাগবত যেমন পেয়েছি, কৃষ(লীলাত্মক আখ্যানমূলক কাব্যে তো বটেই, এমনকী রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদে ভক্তি(রসের উচ্ছ্বাস দেখা গেছে। কীর্তনে কতকগুলি গায়নরীতি প্রচলিত হয়েছে।

শ্রীচৈতন্য-প্রভাবে বাঙালি নব্যন্যায় ও স্মৃতিশাস্ত্রে যেমন পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছিল, তেমনি নগর স্থাপত্যবিদ্যায়ও খ্যাতির অধিকারী হয়েছিল। নারী জীবনেও যে পরিবর্তন এসেছিল তার প্রমাণ সীতাদেবী, জাহ(বা দেবীর মতো আচার্য পত্নীর সম্মাননায়। অন্দরমহলে স্ত্রীশি(ার প্রসার ঘটেছিল, বৈষ(বীদের গৃহে শি(কতায় নিযুক্ত(হতে দেখা গেছে। ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরোধিতা করে চৈতন্যদেব বিধবা-বিবাহ প্রচলন করলেন। স্বনির্বাচিত পাত্রীকে বিয়ে করে দুঃসাহস দেখালেন। লৌকিক আচার-অনুষ্ঠানের পরিবর্তে মালা বা কণ্ঠীবদল বিবাহের প্রচলন করলেন। নাম-সংকীর্তনে একই আসরে স্ত্রী-পু(ষের অবাধ যোগদান অনুমোদন করে বৈপ্-বিক পরিবর্তন আনলেন। এ সময়েই বস্ত্র ও বাস্তুশিল্পে বাঙালি চরমোৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছে। তার ঢাকাই মসলিনে এবং গৃহনির্মাণে বৈচিত্র্য সম্পাদনে।

22.7 অনুশীলনী 2

নীচের প্র(গুলির উত্তর লিখুন। উত্তর শেষে 103 পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

1. শূন্যস্থান পূরণ ক(ন
   (ক) কৃষে(র _____সর্বোত্তম। স্বয়ং শ্রীচৈতন্যই _____ _____।
   (খ) নব্যন্যায়ের ও স্মৃতিশাস্ত্রের পণ্ডিতদের মধ্যে _____ _____ প্রমুখের টীকা সংকলন এবং _____ _____ শ্রীজীব _____ চত্র(বর্তী প্রমুখের পাণ্ডিত্যও দেখা যায়।
   (গ) (চৈতন্যদেব) লৌকিক _____অনুষ্ঠানের পরিবর্তে _____বা _____বিবাহ প্রচলন করলেন।
   (ঘ) _____শতকে উত্তর ভারতের লোকভাষা _____ থেকে বাংলাতে দুটি বই অনূদিত হয়েছিল _____ও _____।

2. বক্তব্য ঠিক না ভুল তা নির্দিষ্ট ঘরে টিক (✓) চিহ্ন দিয়ে দেখান

	ঠিক	ভুল
(ক) বৈষ্ণবভক্তরা সাধনার জন্য ব্যস্ত হয়েছিলেন।	☐	
(খ) বাংলার অন্দরমহলে স্ত্রীশিক্ষার জন্য সীতাদেবী জাহ্নবাদেবীর মতো আচার্যপত্নীরা নিযুক্ত হতেন।		
(গ) ব্রাহ্মণ নির্দেশিত আচার-আচরণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে চৈতন্যদেব বিধবা-বিবাহ প্রচলন করেছিলেন।		
(ঘ) বাংলার বাঁশের তৈরি কুঁড়েঘরের বাঁকা ধাঁচা রেটি নামে রাজপুত মোগল বাস্তুশিল্পে স্থান পেয়েছিল।		

3. সঠিক উত্তরে টিক ( ) চিহ্ন দিন

(ক) বিষ্ণুপুরে মল্লরাজাদের রাজ্যে বৃন্দাবনের পুঁথি লুঠ হবার পর পুঁথির খোঁজে এসেছিলেন—	1. চৈতন্যদাস 2. শ্রীনিবাস 3. ব্যাসাচার্য
(খ) শঙ্করাচার্যের মতকে উত্তর ভারতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন—	1. কুল্লুক ভট্ট 2. শ্রীজীব গোস্বামী 3. মধুসূদন সরস্বতী

4. (ক) 'মধ্যযুগে মানবমুখিতা মহৎ মনুষ্যত্বের তথা নরচন্দ্রমার স-ভক্তি পূজারম্ভ।'—মন্তব্যটির তাৎপর্য বুঝিয়ে লিখুন।

(খ) 'বাঙালি মনীষার শ্রেষ্ঠ ফসলরূপে পাওয়া গিয়েছিল শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকে।'—উক্তিটি কতটা যুক্তিযুক্ত আলোচনা করুন।

(গ) চৈতন্যপ্রভাবে পদাবলি কীর্তনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল কতকগুলি বিশিষ্ট গায়নরীতি।—গায়নরীতিগুলির নাম উল্লেখ করুন।

22.8 উত্তর সংকেত

21.4 অনুশীলনী 1

1. (ক) কর্ষিত, ক্ষেত্র, উদ্ভব, বিকাশের, সুকর্ষিত।
   (খ) প্রেমবাদ, ব্রাহ্মণ্য, ইসলামের, বাঙালির সংস্কৃতিকে।
   (গ) ঘরমুখো, ঘর, পুরী-গয়া, মথুরা-বৃন্দাবন।
   (ঘ) নেতৃত্বে, বন্ধের, আদেশ, শ্রীচৈতন্য, তা।
   (ঙ) নাম-সংকীর্তনের, জাতিভেদের, ব্রাহ্মণের-চণ্ডালে, পঙ্‌ক্তিভোজন।
2. (ক) বিজ্ঞ, বিবেকবান এবং সুন্দরের ধ্যানী।
   (খ) 18 ফেব্রুয়ারি, 1486।
   (গ) হুসেন শাহ্।

3. (ক) 1. শাসককুলের বি(দ্ধে নিরস্ত্র অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন।
2. নামসংকীর্তনের মাধ্যমে জাতিভেদের মূলে আঘাত হেনেছিলেন।
3. পঙ্‌ক্তি(ভোজন প্রচলিত করেছিলেন এবং বৈষ(বকীর্তন মহোৎসবে সর্বসাধারণের জন্য দ্বার উন্মুক্ত(করে দিয়েছিলেন।

(খ) ও (গ) বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

22.7 অনুশীলনী 2

1. (ক) নরলীলাই, অন্তর্কৃষ(, বহির্রাধা
(খ) কুল্লুক ভট্ট, মধুসূদন সরস্বতী, রূপ, সনাতন বি(্বনাথ।
(গ) আচার, মালাবদল, কণ্ঠীবদলের।
(ঘ) সপ্তদশ, হিন্দী, ভক্ত(মাল, পদুমাবৎ।
2. (ক) ঠিক, (খ) ভুল, (গ) ঠিক, (ঘ) ঠিক।
3. (ক) শ্রীনিবাস, (খ) মধুসূদন সরস্বতী।
4. (ক) ও (খ) আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।
(গ) গরানহাটি, মনোহরসাহী রেনেটি, মন্দারিনি।

22.9 গ্রন্থপঞ্জি

1. সাংস্কৃতিকী—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।
2. কৃষ্টি, কালচার, সংস্কৃতি—নীহাররঞ্জন রায়।
3. বাংলা, বাঙালী, ও বাঙালীত্ব—আহমদ শরীফ।

একক 23 ❑ বাঙালির সংস্কৃতি হাজার বছরের

গঠন

23.0 উদ্দেশ্য

23.1 প্রস্তাবনা

23.2 মূলপাঠ (প্রথম অংশ)

23.3 সারাংশ (প্রথম অংশ)

23.4 অনুশীলনী 1

23.5 মূলপাঠ (দ্বিতীয় অংশ)

23.6 সারাংশ (দ্বিতীয় অংশ)

23.7 অনুশীলনী 2

23.8 মূলপাঠ (তৃতীয় অংশ)

23.9 সারাংশ (তৃতীয় অংশ)

23.10 অনুশীলনী 3

23.11 মূলপাঠ (চতুর্থ অংশ)

23.12 সারাংশ (চতুর্থ অংশ)

23.13 অনুশীলনী 4

23.14 উত্তর সংকেত

23.15 গ্রন্থপঞ্জি

23.0 উদ্দেশ্য

খ্রিস্টিয় নবম-দশম শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এই হাজার বছরের দীর্ঘ যাত্রায় বাঙালি-সংস্কৃতির যে রূপ-রূপান্তর ঘটেছে তার পরিচয় তুলে ধরা এই এককের উদ্দেশ্য।

- এই এককটি পাঠ করে আপনি বাঙালির সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের পটপরিবর্তনের সঙ্গে কেমন করে সাংস্কৃতিক জগতের ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে তা বুঝতে পারবেন।

- বাংলার সংস্কৃতিতে দেশি-বিদেশি উপাদান কীভাবে যুক্ত(হচ্ছে তা জানতে পারবেন।
- বাংলার সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে জানা ও বোঝা থেকে আপনি নিজেই এ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

23.1 প্রস্তাবনা

প্রাচীন ও মধ্যযুগ থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত নানা উপাদান ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বাঙালি-সংস্কৃতিতে যুক্ত(হয়েছে। এই এককে নবম-দশম থেকে ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত—এই হাজার বছরের সংস্কৃতির সংি(প্ত ইতিহাস ব্যাখ্যা বি(-ষণ করে দেখান হয়েছে। প্রসঙ্গত্র(মে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মত উদ্ধৃত করে আলোচনা করা হয়েছে।

বর্তমান এককে আলোচনার সুবিধার জন্য হাজার বছরের ইতিহাসের এই বিবর্তন ধারাকে কয়টি পর্বে ভাগ করা হয়েছে। প্রাক-তুর্কি আত্র(মণ পর্যন্ত—প্রাচীন যুগ, তুর্কি আত্র(মণের পর থেকে অষ্টাদশ শতক—মধ্যযুগ, ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে প্রথম বি(্বযুদ্ধ পর্যন্ত—আধুনিক যুগ, প্রথম যুদ্ধোত্তরকাল থেকে একাল পর্যন্ত অতি-আধুনিক যুগ। এখানে প্রথম পর্বের চর্যাপদ সম্পর্কে কিছু ধারণা দেবার পর প্রধানত দ্বিতীয় তৃতীয় পর্বের ইতিহাস সংি(পে বিবৃত হয়েছে।

এই পাঠে মূল রচনাকে চারটি অংশে বিভক্ত(করা হয়েছে পাঠের সুবিধার জন্য। প্রত্যেকটি অংশের পরে মূলপাঠের সংি(প্তসার ও অনুশীলনী রয়েছে। পাঠক আগে অনুশীলনীর উত্তর করে পরে উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে ভুল সংশোধন করতে পারবেন। প্রয়োজনে পরের অংশ পড়ার পূর্বে আগের অংশটি আর একবার পড়ে নেবেন।

23.2 মূলপাঠ (প্রথম অংশ)

বাঙালি-সংস্কৃতির সূত্রপাত বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে, অর্থাৎ খ্রিস্টিয় নবম-দশম শতাব্দীতে হাজার বছরের সংস্কৃতি অর্থে ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রসারিত যে সংস্কৃতি। কিন্তু এই হাজার বছরকে সুনীতিকুমার বিংশ শতাব্দীর প্রথম বি(্বযুদ্ধকালীন সময় পর্যন্ত সাধারণভাবে চারটি সময় পর্বে ভাগ করে নিয়েছেন (1) চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত, (2) অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত, (3) ঊনবিংশ শতাব্দী, (4) প্রথম বি(্বযুদ্ধের কাল পর্যন্ত। প্রথম দুটিতে প্রাচীন ও মধ্যযুগ-সীমায় বাংলার নিজস্ব সাংস্কৃতিক প্রকাশ(অর্থাৎ সম্মিলনের সুর, দেশীয় ও হিন্দু-বৌদ্ধ ঐতিহ্য, গ্রামিণতা, ধর্ম-নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন প্রসঙ্গ এবং দেশ ও জাতিগত চারিত্র্য রয়ে গেছে। অবশ্য এই দুটি পর্বকে চারটি কালপর্বে [রাজনৈতিক দিক থেকে] ভাগ করা যায়, তুর্কি আত্র(মণ পর্ব, তুর্কি-বিজয় পরবর্তী সুলতানি পর্ব, মোগল শাসন পর্ব, মোগল শাসন পর্ব এবং নবাবি অমল। একটি সারণি-সহায়তায় বক্ত(ব্য স্পষ্ট করা যেতে পারে—

হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি
(সাধারণ বিভাজন)

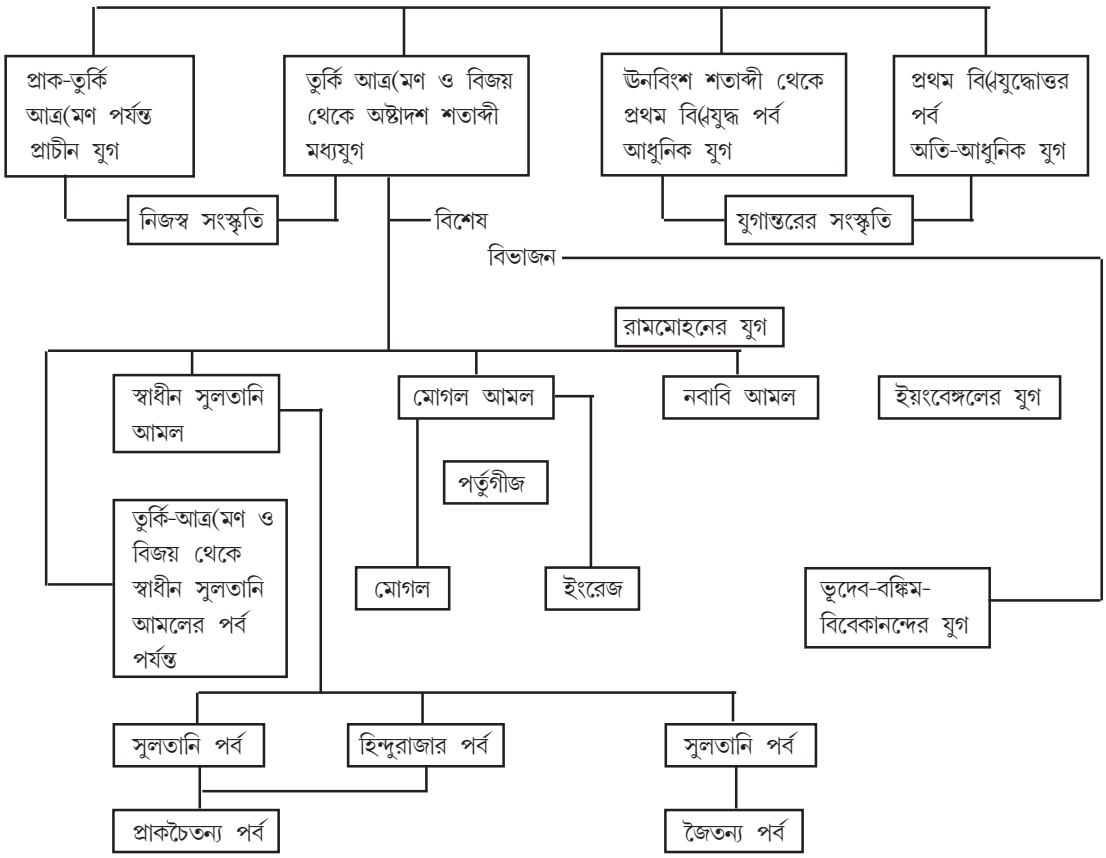

হাজার বছরের সংস্কৃতির তুর্কি আত্র(মণ পূর্ব পর্ব বলতে বোঝায় মৌর্য যুগ থেকে সেন যুগ। এ পর্বে আর্য-অনার্য সংস্কৃতির মিলন-মিশ্রণ ঘটেছে। এ পর্ব বাঙালির জাতিসত্তা পরিস্ফুটনের পর্ব। একে পাঁচ ভাগে ভাগ করে নেওয়া যায়

1. মৌর্য যুগ জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্যবাদের দ্বন্দ্ব(

2. গুপ্ত যুগ ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতিষ্ঠা(

3. শশাঙ্কের যুগ ব্রাহ্মণ্যবাদীদের দ্বারা বৌদ্ধ-পীড়ন(

4. পাল যুগ বর্ধিষু(ব্রাহ্মণ্য প্রভাবে প্রত্যয়হারা বৌদ্ধদের স্বাচ্ছন্দ্য বিনাশ এবং শঙ্করাচার্যের মায়াবাদের প্রচণ্ডতায় বৌদ্ধমতের অবলুপ্তির আশঙ্কা(

5. সেন যুগ ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রবল প্রতাপ এবং বৌদ্ধতন্ত্রের গোপন চর্চা। হিন্দু সমাজে বৌদ্ধদের আত্মগোপন আর প্রচ্ছন্নভাবে স্বধর্ম র(ণ। পাল ও সেন যুগের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে ধর্মীয়-পরিস্থিতির বিশিষ্ট রূপগ্রহণের পর্বেই বাংলাভাষার সৃষ্টি এবং চর্যাপদের জন্ম।

চর্যাপদের মধ্যেই রয়ে গেছে বাঙালির আধ্যাত্মিক ও মানসিক সংস্কৃতির উপাদান। এখান থেকেই

প্রকৃতপ(বাঙালি-সংস্কৃতির সূত্রপাত। আচার্য সুনীতিকুমার রাজনৈতিক সময়-পর্বের কথা বললেও, ধর্ম নিয়ে বিরোধ মিলনের কথা বলেননি(কেবল বলেছেন জৈন-বৌদ্ধ-হিন্দু সংস্কৃতির ছাঁচে ঢালা বাঙালির মনটির কথা এবং লিখেছেন 'খ্রিষ্টিয় দশম শতকের মধ্যভাগ হইতে বৌদ্ধগু(দের হাতে এই স্বতন্ত্র ভাষায় অর্থাৎ প্রাচীন বাঙ্গালায় সাহিত্য সৃষ্টি-গান রচনা হইতে লাগিল।'

সুনীতিকুমার সংস্কৃতির যে তালিকা দান করেছেন তার কোনো-কোনোটির মধ্যে তুর্কি আত্র(মণ পূর্বযুগের সংস্কৃতির পরিচয় রয়েছে। যেমন

(1) চর্যাপদে আছে বেত ও বাঁশের কাজের কথা।

(2) বাংলার প্রাচীনতম পাটাচিত্র 986 খ্রিস্টাব্দে মহীপালদেবের সময় অঙ্কিত বৌদ্ধগ্রন্থ অষ্টসাহস্রিকা পারমিতা পুঁথির মলাট।

(3) হাজার বছরের ঐতিহ্যমণ্ডিত শাঁখাশিল্পের উৎপত্তি কখন কীভাবে হয়েছিল জানা যায়নি।

(4) চর্যাপদে কাপড় বোনার তথা তাঁত বোনার জীবিকার কথা আছে।

(5) মাদুর বিছিয়ে পরমসুখে নৈরামণির নিশিযাপনের কথাও চর্যায় পাওয়া যায়।

(6) কৃষিশিল্পের কথা বিশেষত আমন চাষের কথা রয়েছে চর্যায়।

(7) নৌকার উল্লেখ এবং বাণিজ্যের প্রসঙ্গ রয়েছে 'সোনে ভরিতী ক(ণা নাবী'—ইত্যাদি বিশিষ্ট পদে।

(8) বাঙালির ভোজন (চির তথা সংস্কৃতির পরিচয় রয়েছে প্রাকৃত-অপভ্রংশ প্রকীর্ণ কবিতায় 'মোইলি মচ্ছা নালিচা গচ্ছা দিজ্জই কন্তা খাঅ পুণবন্তা'।—বলাবাহুল্য, এগুলি সবই প্রাক-তুর্কি আত্র(মণ পর্বের বাঙালির বাস্তব-সভ্যতার পরিচায়ক।

প্রাক্-তুর্কি আত্র(মণ পর্বের অনুষ্ঠানমূলক সংস্কৃতির পরিচয়ও দিতে গিয়ে অন্তত তিনটি প্রসঙ্গ ও তিনটি দৃষ্টান্ত এ(ত্রে দেওয়া যেতে পারে—(1) চর্যাকার বলেছেন ডোম্বীর কুঁড়েতে তখন ব্রাহ্মণদের যাওয়া নিষেধ ছিল, তবুও 'ছোই ছোই যাঅ ব্রাহ্মণ নাড়িআ'—এ হল সামাজিক বিধি(চর্যাকারের কথায় আগমপুঁথি শাস্ত্রমালা মন্ত্র এসব নিরর্থক, সদগু(র কথায় মধ্যপথে গমন করাই শ্রেয়—এ হল ধর্ম-সাধন-সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠানের রীতির ইঙ্গিতবহ। (2) চর্যায় রয়েছে কাহ(পাদ বিয়ে করতে চলেছেন, সঙ্গে চলেছে বাজিয়ের দল এবং বরযাত্রী(বিয়ে করে কাহ(জাতিচ্যুত হয়েছেন, কারণ কন্যাটি কাপালী-জোমনী।—এ হল সামাজিকতা ও সামাজিক বিধির প্রতিফলন। (3) চর্যায় আছে ডোমনীর নাচ-গানের প্রসঙ্গ।

আর বাংলার মানসিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির কথা বলতে গিয়ে প্রাক্-তুর্কি আত্র(মণ-পর্বের অন্তত তিনটি প্রসঙ্গের উল্লেখ করা যায় (1) জয়দেব, (2) বৌদ্ধ চর্যাপদ, (3) বাংলার যাত্রা (চর্যায় নটপেটিকার কথা যেমন আছে, তেমনি বলা আছে 'বুদ্ধ নাটক বিষমা হোই')। এছাড়াও সুনীতিকুমার যখন বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট-বস্তু গীতিকবিতার কথা বলেন, পদাবলির ঐতিহ্যের উল্লেখ করেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই চর্যাপদের গীতিকবিতাচিত সং(প্ত গড়ন, ভাব সংহতির কথা স্মরণে আসে এবং মধুর-কোমল-কান্ত পদাবলির স্বরূপ গীতগোবিন্দ ও জয়দেবের কথা মনে আসে।

23.3 সারাংশ (প্রথম অংশ)

নবম-দশম থেকে হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতিকে আলোচনার সুবিধার জন্য চারটি পর্বে বিভক্ত(করা হয়েছে। মৌর্য থেকে সেনযুগ পর্যন্ত—প্রথম পর্বে আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির মিলনে বাঙালির জাতিসত্তার

বিকাশ ঘটেছে। এই পর্বে মৌর্য, গুপ্ত, পাল যুগের জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্যবাদের মধ্যে দ্বন্দ্বে ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতিষ্ঠায় প্রথমে বৌদ্ধপীড়ন ঘটে, ফলে বৌদ্ধ মতবাদ প্রায় অবলুপ্তির দিকে চলে যায়। সেনযুগেও তার ব্যতিত্র(ম ঘটেনি। এজন্য এদেশে বৌদ্ধতন্ত্রের চর্চা হয়েছে গোপনে। এ সময়ে বাংলা ভাষার সৃষ্টি ও চর্যাপদের জন্ম। চর্যাপদ এ পর্বের বাঙালি সংস্কৃতির ধারক। এরই মধ্যে নিহিত আছে বাঙালির আধ্যাত্মিক ও মানসিক সংস্কৃতির উপাদান। চর্যাপদ থেকে বাংলার প্রকৃতি, তার সমাজ, ধর্ম, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, শিল্প-বাণিজ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। অনুষ্ঠানমূলক সংস্কৃতির ((ত্রে সামাজিক বিধি নিষেধের পরিবর্তে চর্যাকারেরা সদগু(র কথাকেই মান্যতা দিয়েছেন। আধ্যাত্মিক-মানসিক সংস্কৃতিতে চর্যাগান ও 'বুদ্ধ নাটক'-এর কথা স্মরণে আসে।

23.4 অনুশীলনী 1

নীচের প্র(গুলির উত্তর ক(ন। উত্তর শেষে 122 পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন

1. শূন্যস্থান পূরণ ক(ন
   (ক) হাজার বছরের সংস্কৃতির তুর্কি আত্র(মণ-পূর্ব পর্ব _____ মৌর্য যুগ থেকে _____। এ পর্বে_____ _____সংস্কৃতির_____। এ পর্ব বাঙালির_____পরিস্ফুটনের পর্ব।
   (খ) পালযুগ বর্ধিষু(_____ প্রভাবে প্রত্যয়হারা _____স্বাচ্ছন্দ্য বিনাশ এবং _____ _____ প্রচণ্ডতায় _____অবলুপ্তির আশঙ্কা।
   (গ) চর্যাপদে আছে _____ও _____ কাজের কথা।
   (ঘ) (চর্যাপদে) _____ উল্লেখ এবং _____ প্রসঙ্গ রয়েছে 'সোনে ভরিতী _____' ইত্যাদি বিশিষ্ট পদে।
   (ঙ) চর্যাকারের কথায় _____ শাস্ত্রমালা _____ এ সব নিরর্থক, _____ কথায় _____ গমন করাই শ্রেয়।
2. সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্(দিন
   (ক) চর্যাপদের রচনাকাল
      1. খ্রিস্টিয় নবম শতক ☐
      2. খ্রিস্টিয় দশম শতক
      3. 1050 খ্রিস্টাব্দ।
   (খ) চর্যাপদে আছে
      1. কাঠের সূক্ষ্ম কা(কার্যের কথা
      2. বেত ও বাঁশের কাজের কথা
      3. হাতির দাঁতের কাজের কথা
3. (ক) 'মোইলি মচ্ছা নালিচা গচ্ছা দিজ্জই কন্তা খাঅ পুণবন্তা'—বাক্যটির বাংলা অর্থ লিখুন।
   (খ) 'সোনে ভরিতী ক(ণা নাবী' পদাংশটির অর্থ লিখুন।

23.5 মূলপাঠ (দ্বিতীয় অংশ)

তুর্কি আত্র(মণোত্তর-পর্বের কথা বলতে গিয়ে সুনীতিকুমার আত্র(মণ-বিজয় ও তার পরবর্তীকালের কথা বলেছেন। এর তিনটি পর্ব—

(1) অভিঘাতের পর্ব এই সময়ে তুর্কি আত্র(মণে বাঙালি তার সর্বভারতীয় ঐতিহ্য ও চরিত্র থেকে বিচ্যুত ও বিপর্যস্ত। তুর্কি আত্র(মণ প্রতিরোধ তাদের প(ে তেমনভাবে সম্ভব হয়নি। ফলে বৈতসী বৃত্তিগ্রহণ ও অস্তিত্ব র(ণ। এই পর্বে খিলজী শাসকেরা মুসলিম আত্র(মণকারীদের ধারা অনুসরণ করে বৌদ্ধ মঠ ও হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেন এবং মুসলমান সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনও বোধ করেন। কিন্তু বৌদ্ধদের ওপর হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদীদের পীড়নও অস্বীকার করা যায় না। বখতিয়ারের পরে আলি মর্দান স্বৈরতন্ত্রী শাসকরূপে খিলজী আমীর ও হিন্দু প্রজাদের ওপর অত্যাচার চালান। ফলে দুটি বিপ্রতীপ মে(নিকটবর্তী হওয়ার সম্ভাবনা সূচিত হয়।

(2) সম্মিলনের প্রথম ইঙ্গিত তুর্কি আমলের দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রথম সাংস্কৃতিক সম্মিলনের ইঙ্গিত দেখা দেয়। কারণ আইয়াজ খিলজীর সময়ে মোগল-অত্যাচারে অতিষ্ঠ মধ্য এশিয়ার গুণী-জ্ঞানী সুফি-সন্তের দল বাংলায় চলে আসেন। আইয়াজ খিলজীর ওপর প্রজা-সমর্থন ও প্রজাদের ভালবাসা থাকায় দিল্লীর সুলতানের সঙ্গে সন্ধি-ভাঙ্গার সাহস তিনি দেখান। ফলে, স্বাধীন সুলতানি আমলের সূচনা হয়। এই সময়ে ও পরবর্তীকালে ইসলামি শাসকেরা ত্র(মশ বাঙালি সমাজ ও জীবনের সঙ্গে নিজেরা মিলেমিশে যেতে থাকেন, এমনকী বাঙালি রমণী বিবাহও করেন, তাদের সন্তানেরাও বাংলাভাষী হয়ে ওঠে। ফলে এক সম্মিলিত সাংস্কৃতিক এবং জাতিগত রূপ নিয়ে বাঙালি প্রথম আত্মপ্রকাশ করে।

(3) সম্মিলনের পর্ব একদিকে বাঙালির মধ্যে হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন সংস্কৃতির মিলন, তার সঙ্গে বাংলার আদি অস্ট্রিক দ্রাবিড় সংস্কৃতির ও গ্রামীণ সংস্কৃতির উত্তরাধিকার, অন্যদিকে ইসলামি সংস্কৃতির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা। ফলে এই পর্বে বাঙালির সংস্কৃতির (ে ত্র উর্বর হয়ে ওঠে। অর্থাৎ, মুসলমানদের মধ্যে যখন বিজয়ীর মনোভাব দূর হতে শু(করে যখন বিজেতা ও বিজিত পরস্পরের প্রয়োজন বোঝে, তখনই তাদের মধ্যে মিলন সম্ভাবনা দেখা দেয় এবং তখনই ভাষা ও সংস্কৃতি ত্র(মশ রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। রচিত হয় সাহিত্য, তবে সংস্কৃতে নয়, তুর্কিতে নয়, বাংলায়। সম্ভবত এই ঐতিহাসিক সত্যকে উপলব্ধি করেই দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন 'আমাদের বি(্বাস, মুসলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয়ই বঙ্গভাষার এই সৌভাগ্যের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।..... গৌড়ে(রগণের উৎসাহই বঙ্গভাষায় শ্রীবৃদ্ধির প্রধান কারণ'। এছাড়াও প্রধানত মুসলিম রাজদরবারকে অবলম্বন করেই হিন্দু মধ্যবিত্ত-শ্রেণী জন্ম নিয়েছিল। ল(ণীয়, তুর্কি আত্র(মণ ও বিজয়পর্বে বাঙালির কাব্যানুশীলন বন্ধ হয়ে যায় নি। এই যুগে অভিধান, স্মৃতি, পুরাণ, ধর্ম বিষয়ক রচনা যেমন পাওয়া যায়, সদুক্তি(কর্ণামৃত গাহাসত্তসঈ প্রভৃতি সংস্কৃত ও প্রাকৃত খণ্ড কবিতার সংকলন এবং গীতিগোবিন্দের অনুসরণে রচিত সংস্কৃত কাব্যও তেমনি পাওয়া যায়।

সুলতানি আমলকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নেওয়া যায়—

(ক) স্বাধীন সুলতানি আমলে বাংলাভাষা-ভাষী অঞ্চলের নামকরণ হয় 'বাঙ্গালা' এবং অধিবাসীরা 'বাঙ্গালী' পরিচয় লাভ করে। এর ফলে বাঙালি জাতিরূপে সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করে থাকে।

(খ) এই সময়েই সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় ব্যাপকভাবে সাহিত্য রচনার সূত্রপাত হয়, সুলতানেরা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সব ধর্মের সাহিত্যকর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন।

(গ) বহিরাগত হলেও বাংলায় স্বাধীন সুলতানেরা বাংলাদেশকে স্থায়ী বাসভূমিরূপে গ্রহণ করেন। তাই রাজনৈতিক কারণ হোক বা না হোক, এদেশের মানুষের সমর্থন ও সহযোগিতা তাঁদের কাম্য ছিল(এই জন্যই তাঁরা হয়তো বাংলা সাহিত্যচর্চায় উৎসাহ দিতেন। জাতিগত চেতনা সৃষ্টির মাধ্যমে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা স্থাপনের সর্বোত্তম মাধ্যম যে ভাষা ও সাহিত্য তথা সংস্কৃতি—এই সত্যটি তাঁরা জানতেন বা বুঝেছিলেন।

(ঘ) নানান মত দর্শন ও ধর্ম-বি(্বাসের সংমিশ্রণজাত সুফিবাদে বি(্বাসী ধর্ম-প্রচারকেরা এদেশে সমাদর পেয়েছিলেন। ঐতিহাসিকদের ধারণা দেবমূর্তি ও মন্দির ভাঙার কিছু দৃষ্টান্ত থাকলেও, সম্মিলনের তুলনায় সেই সব ধ্বংসের পরিমাণ অনেক কম। বরং পীর-ফকির-দরবেশ-আউলিয়া প্রভৃতির প্রচারে কেরামতিতে চমৎকৃত ও মোহগ্রস্ত সাধারণ বৌদ্ধ ও অন্যান্য ধর্মের মানুষ মূলত ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও ধর্মীয়দের প্রতি বিরূপতা থেকেই মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে। এই মুসলমান ধর্মের মধ্যে শরিয়তী-কাঠিন্য ও রক্ত(চ(ছিল না, বরং সুফি প্রভাবিত হওয়ায় তা অনেকটা উদার ছিল।

(ঙ) স্বাধীন সুলতানি আমলেই চৈতন্যের মত সংস্কারক প্রেম-ভক্তি(বাদী আচার-অনুষ্ঠান বর্জিত লোকধর্ম প্রচার করার ফলে ব্রাহ্মণ্যধর্মের চতুর্বর্ণ-প্রথাশ্রিত বিভেদ-বৈষম্য সংকীর্ণতা দূর হয়ে যায়। ঈ(্বরের বিচারে সব মানুষের মর্যাদা সমান—এই ধারণা যেন প্রতিষ্ঠিত হয়। এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য চৈতন্য-মতবাদের পাশাপাশি সুফি সাধকেরাও প্রায় একই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন। ফলে সম্মিলনের অবকাশ আরো ভালোভাবে সূচিত হয়েছিল সুলতানি আমলে। 'জাতি-সংস্কৃতি ও সাহিত্য' প্রবন্ধে আচার্য সুনীতিকুমার এ প্রসঙ্গে বলেছেন "বাঙ্গালাদেশে প্রচলিত ইসলাম ধর্ম বাস্তবিকই 'মজম-উ-ল্-বহ্রৈন্' অর্থাৎ 'দুইটি সাগরের সম্মিলন' হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।" 'মজম-উ-ল্-বহ্রৈন্'-নামে একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন দারা শিকো। তাতে ছিল হিন্দু মুসলিম সম্মিলনের কথা।

পূর্বোক্ত(প্রবন্ধেই সুনীতিকুমার অবশ্য এই সুলতানি পর্বের মধ্যে রাজা কংসনারায়ণ বা দনুজমর্দন দেবের কথা উল্লেখ করে বলেছেন—বাঙালির মধ্যে স্বাধীন জাতি সত্তার প্রতিষ্ঠা ও বিস্তারের প্রবণতা দেখা যায় তাঁদের সময়েই এবং তাঁদের কারোর পৃষ্ঠপোষকতাতেই কৃত্তিবাস তাঁর অনুবাদকাব্য রচনা করেন। কিন্তু পণ্ডিতেরা প্রায় সকলেই এখন একমত যে কৃত্তিবাসের গৌড়ে(্বর আর যিনিই হোন না কেন, তিনি তাহিরপুরের বড় জমিদার রাজা কংসনারায়ণ নন বা দনুজমর্দনদেবও নন। 1976-এ এ বিষয়ে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহের সিদ্ধান্ত রাজা গণেশের ধর্মান্তরিত পুত্র অন্তরে হিন্দু ঐতিহ্যের অধিকারী কিন্তু বিধর্মী গৌড়-অধিপতি জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহই কৃত্তিবাসের গৌড়ে(্বর(তাঁরই রাজ্যলাভের (1418 খ্রিঃ) দু-চার বছরের মধ্যেই কৃত্তিবাসের রামায়ণ অনুবাদ নিষ্পন্ন হয়।

সুলতানি পর্বে বাঙালির সাহিত্য-সংস্কৃতির শ্রীবৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে আচার্য সুনীতিকুমার আরেকটি ধারণা ব্যক্ত(করেছেন। তা হল ব্রাহ্মণ্য ও তার অনুগামীদের নব উৎসাহে বেদ উপনিষৎ পুরাণ ও তন্ত্রের সমন্বয়ে সৃষ্ট নব হিন্দুধর্মের প্রচার এবং সংস্কৃত-প্রীতির পরিবর্তে লোকভাষা বাংলায় জনসাধারণের কাছে ও মুসলমান ধর্মের মানুষের সম(হিন্দু সাহিত্য ধর্মশাস্ত্র ইতিহাস প্রাচীন উপাখ্যানের অন্তর্নিহিত রোমান্স ও উচ্চ-আদর্শ প্রচারের চেষ্টা এবং অভিপ্রায়। এমন চেষ্টা ও অভিপ্রায়ের কারণ বিদেশী শাসকের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী সহজবোধ্য ধর্ম এসে গ্রামের জনসাধারণকে আকৃষ্ট করেছিল। এই অবস্থা দেখে যে হিন্দু ব্রাহ্মণ বা বৌদ্ধ

মতাবলম্বীরা এতদিন আভিজাত্যের শি(ার গর্বে দেশের জনসাধারণের কথা ভাবেননি, তাঁরা সজাগ হয়েছিলেন।

কংসনারায়ণ বা দমনুজমর্দনদেবকে নিয়ে বা কৃত্তিবাসের গৌড়েশ্বরকে নিয়ে যতই বিতর্ক থাকুক না কেন, যা নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই তা হল এই যে বাঙালির মধ্যে কর্ম-চেষ্টা এবং জাতীয় সাহিত্যের প্রচার চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে একই সঙ্গে চলছিল। আবার বাংলার স্থানীয় পুরাণকথা, যেগুলি সংস্কৃতে লিখিত হয়নি বলেই ভারতের অন্যান্য অংশে গৃহীত হতে পারেনি, সেগুলিও মঙ্গলকাব্যাকারে বাংলাদেশে বহুল প্রচলিত হল(তাদের দেওয়া হল জাতীয় সাহিত্যের তথা সংস্কৃত পুরাণের মত আকার(মঙ্গল-কাব্যগুলি যে বাংলার লৌকিক পুরাণ—এ নিয়ে বিতর্ক খুব প্রবল ও ব্যাপক নয়।

এইভাবে রামায়ণ মহাভারত ভাগবত শিবায়ন ও অন্যান্য পুরাণের আখ্যানের সঙ্গে বেহুলা-লখিন্দর, কালকেতু-ফুল্লরা, ধনপতি-খুল্লনা, লাউসেন, গোপীচাঁদের কথা বহুল-প্রচারিত হয়েছিল। আচার্য সুনীতিকুমার বাংলার সংস্কৃতির ত্রয়ী অবলম্বনের দিগদর্শনীতে 'বাঙ্গালার মানসিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি' বলে যে সব সাহিত্য-নিদর্শনকে নির্দিষ্ট করেছেন তাতে রামায়ণ মহাভারতের বাংলা রূপ, শাক্ত(শৈব ও বৌদ্ধ মঙ্গলকাব্যের উপাখ্যান— বেহুলা-লখিন্দরের কথা, কালকেতু-ফুল্লরার ও ধনপতি-খুল্লনার কথা এবং লাউসেন কথার উল্লেখ আছে। মধ্যযুগের সাহিত্য-কীর্তির মধ্যেই বাঙালির সংস্কৃতির পরিচয় লুকিয়ে রয়েছে।

তুর্কি বিজয়ের পরে বহির্বঙ্গে মিথিলায় ন্যায় ও স্মৃতিশাস্ত্র পঠন-পাঠনের জন্য বাঙালি গমন করলে বাঙালি ছাত্রদের মাধ্যমে মিথিলা থেকে সেই সব শাস্ত্র এবং বিশেষভাবে বিদ্যাপতি ঠাকুরের গান বাংলায় এসেছিল। অর্থাৎ বাংলায় আবার নতুনভাবে জ্ঞানচর্চার সম্ভাবনা সূচিত হয়েছিল। 'এইভাবে বাঙ্গালার পণ্ডিতের হাতে দুই দিকে কাজ চলিল। বাঙ্গালার সংস্কৃতির দুইটি দিকই ইঁহারা পুষ্ট করিতে লাগিলেন।'। সংস্কৃত আশ্রয় করে চলল বাঙালির মনন-চর্চা এবং কাব্য-কবিতার মাধ্যমে চলল বাঙালির হৃদয়ভাবের চর্চা। এই দুটি দিকই প্রবল ও পরিপুষ্ট হয় চৈতন্যদেবকে আশ্রয় করেই।

চৈতন্যদেবকে আশ্রয় করেই বাংলার নিজস্ব কীর্তন-সংগীতের প্রতিষ্ঠা, পদাবলির বিস্তার, চৈতন্য-দর্শননির্ভর চরিতসাহিত্য—কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্যচরিতামৃত এবং বিভিন্ন সংস্কৃত জীবনী-গ্রন্থ দর্শন ও তত্ত্বগ্রন্থ ইত্যাদির বিস্তার। চৈতন্যদেবই ঘরমুখো বাঙালিকে বাইরের আলো বাঁশবাগানের অন্ধকারের ওপারের জগতে পৌঁছে দিলেন। সুনীতিকুমার জানিয়েছেন 'ঘরমুখো বাঙালি পুরী, গয়া, কাশী, বৃন্দাবন, জয়পুর এবং আরো পশ্চিমে যাত্রা করেছিল' এবং এইভাবে 'ষোড়শ সপ্তদশ শতকে এক সত্যকার গৌরবময় বৃহত্তর বঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিল'। ফলে গ্রাম-জীবন ও সংস্কৃতিকে নিয়ে যে বাঙালি-সংস্কৃতি পুষ্টি লাভ করেছিল, তা ত্র(মশ প্রাচীন ভারতের মতই গ্রাম ও নগরকে নির্ভর করে আপন সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রকাশ শু(করেছিল। বাংলায় নগরের প্রাধান্য ছিল না। প্রাক্-চৈতন্যযুগে নগর আসলে বড় এবং বহু গ্রাম নিয়ে গড়ে উঠেছিল। তখন নগর বলতে ছিল নবদ্বীপ। বাংলাদেশের নগর জীবন ছিল গ্রাম-জীবনেরই বিস্তৃত সংস্করণ। কিন্তু পর-চৈতন্য ও চৈতন্য-পর্বে ল(ণাবতী আর বিষু(পুর নগর-সভ্যতার প্রতিভূ হয়ে উঠেছিল। সুনীতিকুমার ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে বিষু(পুরের সমৃদ্ধির ও বড় হয়ে ওঠার দুটি কারণ নির্দেশ করেছেন এক—ওড়িশা ও দ(ি ণ ভারতের পূর্ব-উপকূলের সংযোগ-পথে বিষু(পুরের অবস্থান(দুই—বিষু(পুর ও নবদ্বীপের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ।

সুনীতিকুমার দিগ্‌দর্শনীতে যেমন বিষু(পুরের রেশমশিল্পের কথা বলেছেন, তেমনি পিতল-কাঁসার বাসনের কথাও জানিয়েছেন। বিষু(পুরের পোড়ামাটির কাজ বা টেরাকোটার কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন।—এসবের

মধ্য দিয়ে সজীব থেকেছে বাংলার লোকশিল্প। কিন্তু মানসিক আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির (ে ত্রে বিশেষত গানের (ে ত্রে বিষু(পুরী ঘরানার সূত্রপাতের পর্বও এই সময় থেকেই(সুনীতিকুমার তাঁর দিগ্দর্শনীতে এর উল্লেখ করেননি।

মোগল-শাসনের শেষ পর্যন্ত বাঙালির মধ্যে জাতি ও সংস্কৃতির সম্মিলনের ধারা অব্যাহত থেকেছে। আলাওল ও ভারতচন্দ্রের রচনায় তার পরিচয় রয়েছে। তবে দুই কবির রচনায় গ্রাম্যতার অনুপস্থিতি এবং নগর-সংস্কৃতির ভাবরসে পুষ্ট কাব্যকীর্তি সূচিত হয়েছে। ইতিহাস সা(্য দেবে, প্রায় সব মোগল সম্রাটেরই রাজপুত-মহিষী ছিল। ফলে সর্বভারতীয় পরিপ্রে(তে এই পথে সাংস্কৃতিক সম্মিলনের অবকাশ গড়ে উঠেছিল। মোগল সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হওয়ায় বাংলা এবং বাঙালির প(ভারত-আত্মার ও ভারত-সংস্কৃতির সঙ্গে কিছুটা যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব হয়েছিল। আচার্য সুনীতিকুমার বলেছেন 'মোগল সাম্রাজ্যের সহিত যুক্ত(হইয়া, বাঙ্গালার প(আংশিকভাবে সমগ্র ভারতের প্রাণের স্পন্দন পাওয়া সম্ভব হইল'। 1538-39-এ হুমায়ুন গৌড় দখল করার পরে, মধ্যে 1539-75 বাদ দিলে, আকবরের প্রতিনিধি মুনিম্ খানকে দিয়ে 1576-এ মোগল শাসনের সূত্রপাত ও 1716 খ্রি. নাগাদ মোগল সাম্রাজ্যের অবনতি এবং মুরশিদকুলির স্বাধীন নবাবী আমলের সূচনার মধ্য-পর্বের বাঙালির কথা বলেছেন সুনীতিকুমার। এ প্রসঙ্গে তিনি বাঙালি হিন্দু এবং বাঙালি মুসলমান উভয়েরই কথা বলেছেন। কিন্তু জানিয়েছেন 'মুসলমান সংস্কৃতি [অর্থাৎ আরবী, ফারসী ও উত্তরভারতীয় মুসলমান মনোভাব বা বাস্তব-সভ্যতা] রীতি-নীতি এবং চিন্তা-প্রণালী বাঙ্গালী মুসলমানের জীবনে তেমন কার্যকরী হয় নাই'। সুনীতিকুমারের এই মত নিয়ে বিতর্ক থাকলেও বিতর্ক নেই এখানে যে—(1) বাংলার বিদ্যাধর পণ্ডিতের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল জয়পুর নগর স্থাপনে। (2) বাংলার পণ্ডিত ও গোস্বামীরা উত্তরভারতের ধর্ম-জীবনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। (3) মধুসূদন সরস্বতীর মত বাঙালি পণ্ডিত-দার্শনিক শঙ্করাচার্যের মতকে উত্তরভারতে আবার প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। (4) দিল্লী, আগ্রা, জয়পুর, চিতোর থেকে পারস্য, তুরস্ক পর্যন্ত রাজদরবারে ঢাকাই মসলিনের কদর ও চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল। (5) বাংলার বাঁশের ধাঁচা রাজপুত মোগল বাস্তুশিল্পে গৃহীত হয়েছিল, তার নাম রেওটি।—তবে এ সব কিছুই দেওয়া-নেওয়ার দিকটা ত্র(মশ পূর্ণ হয়ে উঠেছিল এই সময়ের বাঙালির সাংস্কৃতিক-জীবনে।

প্রসঙ্গান্তরে বিশেষত আধ্যাত্মিক ও মানসিক-সংস্কৃতির (ে ত্রেও তা সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়— (1) উত্তরভারতের লোকভাষা (হিন্দী) থেকে নাভাজী দাসের 'ভক্ত(মাল' বাংলায় অনূদিত হয়েছিল। (2) মালিক মুহম্মদ জায়সীর হিন্দি 'পদুমাবৎ'-এর বঙ্গানুবাদও হয়েছিল। আর দু-টিই হয়েছিল সপ্তদশ শতকে। দ্বিতীয় গ্রন্থটির সঙ্গে যুক্ত(ছিল কিছুটা সুফি ধারণা-বিমিশ্র ঐতিহ্য।

সুনীতিকুমার তাঁর দিগদর্শনীতে মোগল যুগের বাস্তব সভ্যতা [বিষু(পুরের টেরাকোটা (স্থাপত্য) ষোড়শ-সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতক(পট, যমপট, কালীঘাটের পট (চিত্রবিদ্যা) ষোড়শ শতক-অষ্টাদশ শতক(হাতির দাঁতের মূর্তি, চুড়ি, কৌটা (কা(শিল্প), অনুষ্ঠানমূলক সংস্কৃতি [সত্যনারায়ণ পূজা, দোল, রাস, (হিন্দু)(ঈদ, মহরম ইত্যাদি (মুসলিম)] এবং মানসিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির [পাঁচালি-যাত্রা-ধ্রুপদ-খেয়াল ইত্যাদি] পরিচয় দিয়েছেন।

23.6 সারাংশ (দ্বিতীয় অংশ)

তুর্কি আত্র(মণের পর বাংলার জনজীবনে কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে। প্রাথমিক প্রতিরোধে অসমর্থ বাঙালি বৈতসীবৃত্তি গ্রহণ করে অস্তিত্ব র(ায় সচেষ্ট হয়েছে। পরে স্বাধীন সুলতানি আমলে বাঙালি একদিকে হিন্দু-

বৌদ্ধজৈন সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়, অন্যদিকে অস্ট্রিক-দ্রাবিড় সংস্কৃতির লোকায়ত বি(াস ও ইসলামি সংস্কৃতির দ্বারা পুষ্ট হয়ে জাতিগতভাবে উন্নততর রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এটি সম্ভব হয়েছিল বিজেতা ও বিজিত উভয়েই পরস্পরের প্রয়োজন বুঝেছিল বলেই। দেখা গেল দেশের বিদ্বৎমণ্ডলী সুলতানের দরবারে নিযুক্ত(হচ্ছেন। মুসলিম রাজদরবারকে অবলম্বন করে হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছে। এ যুগেই অভিধান, স্মৃতি, পুরাণ রচনা যেমন পাওয়া যায়, তেমনি 'সদুক্তি(কর্ণামৃত', 'গাহাসত্তসঈ' প্রভৃতি সংস্কৃত ও প্রাকৃত খণ্ড কাব্য রচিত হয়েছে। এ সময়েই চৈতন্যের মত সংস্কারক প্রেম-ভক্তি(বাদী আচার-অনুষ্ঠান বর্জিত লোকধর্ম প্রচার করেছেন, যার বক্ত(ব্য ঈ(রের বিচারে সব মানুষই সমান—এ কথা সুফি সাধকরাও বলতেন। ফলে দুই সংস্কৃতির সম্মিলন সহজতর হয়েছিল। দারা শিকোর 'মজম-উল্-বহ্রৈন্' অর্থাৎ 'দুই সাগরের মিলন'-এর বক্ত(ব্যের ফলে বাংলাদেশের এই ধর্মীয় সমন্বয়বাদী বক্ত(ব্যের মিল আছে। এ সময়ে বাংলা সাহিত্যও সুলতানের আনুকূল্য পেয়েছিল, কৃত্তিবাস তা স্বীকার করেছেন। ব্রাহ্মণ্য আভিজাত্যের এতদিন সংস্কৃত লেখাই যেখানে প্রচলিত ছিল, সেখানে লোকভাষা বাংলায় সাহিত্য ধর্মশাস্ত্র ইতিহাস রচনা করায় বিদেশী শাসকবর্গের সঙ্গে জনসাধারণও তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। ফলে এইভাবে রামায়ণ মহাভারত পুরাণের সঙ্গে মনসা-চণ্ডী-ধর্মমঙ্গল গোপীচাঁদের গান বহুল প্রচারিত হয়েছিল। এই সমস্ত রচনার মধ্যেই বাঙালি সংস্কৃতির পরিচয় রয়েছে।

তুর্কি বিজয়ের পর বাঙালি মিথিলায় যায় ন্যায় ও স্মৃতিশাস্ত্র পাঠের জন্য, সেখান থেকে শাস্ত্রের সঙ্গে বিদ্যাপতির পদ বাংলায় নিয়ে আসে। এর ফলে বাংলায় নতুন করে জ্ঞানচর্চার সঙ্গে কাব্যচর্চারও পুষ্টি ঘটেছে। মধ্যযুগে চৈতন্যদেবকে আশ্রয় করে বৈষ(ব শাস্ত্র ও কাব্যচর্চার যেমন বিকাশ ঘটেছিল তার সঙ্গে কীর্তনের ব্যাপক প্রসার এবং নতুন নতুন গায়ন পদ্ধতির প্রচলন ঘটেছে। চৈতন্যদেবের দ(িণ ও উত্তরভারত পরিব্র(মা ঘরমুখো বাঙালিকে নতুন বি(ের সন্ধান দিয়েছে—পুরী-গয়া মথুরা-বৃন্দাবন যাত্রা এবং গৌরবময় বৃহৎবঙ্গের প্রতিষ্ঠা করেছে। জাতি ও সংস্কৃতির এই সম্মিলন মোগল শাসনের শেষ পর্যন্ত চলেছে। প্রায় সব মোগল সম্রাটেরই রাজপুত মহিষী ছিল। ফলে সর্বভারতীয় পটভূমিকায় এটিও সাংস্কৃতিক সমন্বয়ে সহায়ক হয়েছিল। বাংলার বিদ্যাধর পণ্ডিত যেমন জয়পুর নগর স্থাপনে এবং বাংলার বাঁশের ধাঁচা 'রেওটি' রাজপুত মোগল বাস্তুশিল্পে গৃহীত হয়েছিল, তেমনি মধুসূদন সরস্বতী উত্তর ভারতে শঙ্করাচার্যের মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছিলেন। ঢাকাই মসলিন তো দেশে-বিদেশে আদরণীয় হয়েছিল। এসবের মধ্যে রয়েছে বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয়।

23.7 অনুশীলনী 2

নীচের প্র(গুলির উত্তর ক(ন। উত্তর শেষে 123 পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

1. শূন্যস্থান পূরণ ক(ন
   (ক) বৌদ্ধদের ওপর _____ _____ পীড়নও _____করা যায় না।
   (খ) ইসলামি শাসকেরা ক্র(মশ _____ সমাজ ও _____ সঙ্গে নিজেরা _____ যেতে থাকেন, এমনকী _____ বিবাহ করেন, তাদের _____ _____ হয়ে ওঠে।

(গ) একদিকে বাঙালির মধ্যে _____ _____ _____ সংস্কৃতির মিলন, তার সঙ্গে বাংলার আদি _____ _____ সংস্কৃতির ও _____ সংস্কৃতির _____, অন্যদিকে _____ সংস্কৃতির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা।

(ঘ) চৈতন্য মতবাদের পাশাপাশি _____ _____ প্রায় একই ধরনের _____ পোষণ করতেন।

2. সঠিক উত্তরে টিক ( ) চিহ্ন দিন

(ক) রামায়ণ রচয়িতা কৃত্তিবাসের গৌড়েশ্বর
1. দনুজমর্দনদেব ☐
2. রাজা গণেশ
3. জালালুদ্দিন মুহম্মদ শাহ্

(খ) 'ভক্তমাল' গ্রন্থের রচয়িতা
1. মধুসূদন সরস্বতী
2. নাভাজী দাস
3. শঙ্করাচার্য

3. নীচের বক্তব্যগুলি ঠিক না ভুল তা নির্দিষ্ট ঘরে টিক ( ) চিহ্ন দিয়ে দেখান

	ঠিক	ভুল
(ক) চৈতন্যদেব ঘরমুখো বাঙালিকে বাইরের আলোয় পৌঁছে দিয়েছেন।	☐	
(খ) কৃত্তিবাসের গৌড়েশ্বর তাহিরপুরের জমিদার রাজা কংসনারায়ণ।		
(গ) বহিরাগত হলেও বাংলার স্বাধীন সুলতানেরা বাংলাকে স্থায়ী বাসভূমিরূপে গ্রহণ করেন।	☒	
(ঘ) সাধারণ বৌদ্ধ ও অন্যান্য ধর্মের মানুষ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও ধর্মীয়দের প্রতি বিরূপতা থেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে।		
(ঙ) মঙ্গলকাব্যগুলি যে বাংলার লৌকিক পুরাণ—এ নিয়ে বিতর্ক খুব প্রবল।		

4. (ক) দারা শিকোর বইয়ের নাম ও তার অর্থ লিখুন।

(খ) মধ্যযুগে বিষ্ণুপুরের খ্যাতির কারণগুলি লিখুন।

(গ) সুনীতিকুমার ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে বিষ্ণুপুরের সমৃদ্ধির ও বড় হয়ে ওঠার দুটি কারণ নির্দেশ করেছেন।—কারণ দুটি উল্লেখ করুন।

23.8 মূলপাঠ (তৃতীয় অংশ)

মোগল আমলে পর্তুগীজদের আগমনে য়ুরোপীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার আগমন ঘটে। এই আগমন ক্রমশ সূচিত করে সাংস্কৃতিক যুগান্তর তথা কালান্তর। কিন্তু পরিপূর্ণভাবে কালান্তর সূচিত করার আগে নবাবি আমলেই কিছু কিছু সাংস্কৃতিক ও সভ্যতাগত পরিবর্তন ঘটে যায় বাঙালির সংস্কৃতিতে। এই পরিবর্তন যে জীবন-চর্চায় ও চর্যায় সংঘটিত হচ্ছিল পর্তুগীজদের সূত্র ধরে তার প্রমাণ রয়েছে বাঙালির ভোজন রসিকতার মধ্যে [হুগলি ও চব্বিশ পরগনার পর্তুগীজরা তাদের অধিকার-ভুক্ত জমিতে বিদেশী ফসলের চাষ করত—আলু, তামাক, বজরা, সাগু, আনারস, কাজু, পেয়ারা, পেঁপে, আমড়া ও লেবু ইত্যাদি। গোড়ার দিকে নিষ্ঠাবান

হিন্দুসমাজ এসব গ্রহণ করেনি, পরে নিত্য-খাদ্যে পরিণত করে নিয়েছে। তামাক খাওয়াটা বাঙালি পেয়েছে পর্তুগীজদের কাছ থেকে। জরদা, সুরতি এবং নস্যও পর্তুগীজদের নিয়ে আসা তামাক থেকে তৈরি।] পর্তুগীজদের প্রতি বাঙালির মেয়েদের অনুরাগ-প্রীতির মধ্যে [কাঁচরাপাড়ার এক মন্দিরে পোড়ামাটির এক মৃৎ-ফলকে এই অনুরাগ অত্যন্ত সজীবতার সঙ্গে চিত্রিত। বাঙালি মেয়েদের সঙ্গে পর্তুগীজদের যৌনমিলনের ফলে ফিরিঙ্গি জাতির উদ্ভব।] বাংলা শব্দভাণ্ডারে পর্তুগীজ শব্দ সংযোজনের সূত্রে [আচার, আয়, আনারস, কামিজ, চাবি, গুদাম, পিওন, পালকি, কামান, ভাঙ ইত্যাদি] এবং পর্তুগীজদের মতোই বিভিন্ন জিনিসের ব্যবহারে [জানালা, মেঝে, পেরেক, সাবান, তোয়ালে, বরগা, পিস্তল, পারদ, ফিতা ইত্যাদি]। প্রথম ও শেষেরটি বাস্তব সভ্যতার অন্তর্ভুক্তি(দাবি করতে পারে। পর্তুগীজেরা সপ্তগ্রামে বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে তুলেছিল, আর একসময় হুগলিকে জনবহুল নগরে পরিণত করেছিল। আর তা মোগল আমলেই। 1532-এ হুগলি থেকে তারা বিতাড়িত হয়।

ইংরেজরা এদেশে এসেছিল সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। ওলন্দাজেরা ঠিক ঐ সময়েই এদেশে আসে। পরে আসে দিনেমার আর ফরাসিরা। 1765-তে ইংরেজরা দেওয়ানি পায়। এর পরে তারা রেশম শিল্পকে নষ্ট করে রেশম তৈরির ব্যবসাকে উৎসাহিত করতে থাকে। বাংলার লোকশিল্পের এই দিকটি এর ফলে (তিগ্রস্ত হয়। পরিণামে গ্রামীণ অর্থনীতির সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতিরও দুর্দশা কিছুটা ঘনিয়ে আসে। গড়ে ওঠে নগর এবং তার আশেপাশে নতুন সমাজ—কলকাতা-কেন্দ্রিক কলকাতা-নির্ভর 'বাবু সমাজ'—মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও বাবু-কালচার। বাবুরা প্রমোদ-বিলাসে বারাঙ্গনা-বিলাসে টপ্পা-ঠুংরি, বাইজি নাচে-গানে, তরজায়, বুলবুলির লড়াইয়ে, বিদ্যাসুন্দরের যাত্রায় দিন কাটাতো। সমাজে নিজের দিকের মানুষ, যারা সাহেবের কথায় 'ভদ্দরলোক' বা সাধারণলোক—মুদ্রাযন্ত্রের প্রসার শি(া-প্রসার শি(া-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শি(িত শ্রেণীতে পরিণত হয়েছিল।—ত্র(মশ সম্ভাবিত হয়েছিল যুগান্তর, রবীন্দ্রনাথের কথায় কালান্তর

হাজার বছরের বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাসে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে প্রবেশের (ে ত্রে যে গুণগত পরিবর্তন, তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুধাবনের বাবুগৌরবের কলকাতার কথা তথা নব্য শি(িত-শ্রেণীর উদ্ভবের ও নগরভিত্তিক সভ্যতার ও সংস্কৃতির প্রকাশ-প্রসঙ্গ উত্থাপন একান্তই প্রয়োজনীয়। পর্তুগীজ সংস্কৃতি বহিরঙ্গ (ে ত্রেই মূলত প্রভাব ফেলেছে, তাই সেই পর্বে নগর অনেকটা গ্রামীণ সভ্যতারই প্রসারিত-পরিমার্জিত পরিশীলিত রূপ। কিন্তু এই পর্বে জীবনের সার্বিক পরিকাঠামোয় ও চিন্তন(ে ত্রে পরিবর্তন ঘটে গেছে। তাই গ্রামময় নগর নয়, এখন গ্রামীণ সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিজত্ব থেকে নগর-নির্ভর সংস্কৃতির সূচনা বেং বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতির কতকগুলি বিষয়ের বিলুপ্তি।

বাংলায় নবাবী আমল শু(মুর্শিদকুলিকে দিয়ে। শেষ পলাশীর যুদ্ধে (1757)। এই পর্বে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে বড় বড় জমিদারদের (যারা দিল্লীর বাদশাহের কাছ থেকে রাজা, মহারাজা, খান, সুলতান প্রভৃতি উপাধি পেয়েছিলেন) আধিপত্য ছিল সামন্ত-রাজার মত। তাঁরাই ছিলেন সাহিত্য-শিল্পকলা-সংস্কৃতি ও স্থাপত্যের পোষ্টা। এঁদের মধ্যে ছিলেন জঙ্গলমহল ও গোপভূমের সদ্‌গোপ রাজারা(বাঁকুড়ার মল্লরাজারা(বর্ধমানের (ত্রিয় রাজবংশ(চন্দ্রকোনার নদীয়ার (কৃষ(নগর) ও নাটোরের ব্রাহ্মণ রাজবংশ ইত্যাদি। আচার্য সুনীতিকুমার তাঁর দিগদর্শনীতে এই সন্ধি(ণের বাংলার সংস্কৃতির ও সভ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। মানসিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির (ে ত্রে তিনি পাঠশালা ও মক্তবের কথা না বললেও বলেছেন কথকতা-গান-পাঁচালি-যাত্রাভিনয়ের (যার মাধ্যমে হিন্দুরা পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে পরিচিত হত) কথা।

বলেছেন উচ্চশি(ার কেন্দ্ররূপে চতুষ্পাঠীগুলির কথা(নব্যন্যায়ের ও স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপনা ছিল চতুষ্পাঠীগুলির বৈশিষ্ট্য(তবে সেখানে জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ, গণিত-ব্যাকরণ-নাটক, ভারবি-কালিদাসের কাব্য, মহাভারত, কামন্দকী দীপিকা প্রভৃতি পড়ানো হত। চতুষ্পাঠীগুলি ছিল পশ্চিমবাংলার নবদ্বীপ, ত্রিবেণী, ভট্টপল্লী (ভাটপাড়া), গুপ্তিপাড়া, বিষু(পুর এবং পূর্ববঙ্গের ত্রিপুরা, ফরিদপুর, চট্টল কোটালিপাড়া প্রভৃতি অঞ্চলে। বিভিন্ন পণ্ডিত নৈয়ায়িক বৈদান্তিকের নাম করেছেন সুনীতিকুমার, কিন্তু বলেননি 114 বছর বেঁচে থাকা ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের কথা। অষ্টাদশ শতক উদ্ভাসিত সাহিত্য-চর্চার আলোতেও। সুনীতিকুমার লাউসেনের কথা বলেছেন [বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় ঘনরাম চত্র(বর্তী লেখেন ধর্মমঙ্গল]। বলেছেন ভারতচন্দ্রের কথাও [কৃষ(নগরের মহারাজ কৃষ(চন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর লেখেন অন্নদামঙ্গল]। শৈব উপাখ্যানের প্রসঙ্গও তিনি বাদ দেননি [কর্ণগড়-রাজের পৃষ্ঠপোষকতায় রামে(ের ভট্টাচার্য লেখেন শিবায়ন]। বিষু(পুর রাজ গোপালসিংহের তত্ত্বধানে শঙ্কর কবিচন্দ্র লেখেন রামায়ণ, মহাভারত, গোবিন্দমঙ্গল, কৃষ(মঙ্গল, রামায়ণ-মহাভারতের সঙ্গে সঙ্গে রাধাকৃষ(কাহিনীর বিশিষ্ট রূপেও কথা তিনি বলেছেন। এছাড়াও হালিশহরের রামপ্রসাদ সেনের শক্তি(গীতি আর বিশেষ করে কবিগানের উল্লেখও তিনি করেছেন। রঘুনাথ দাস, রাসু-নৃসিংহ, গোঁজলা গুঁই প্রমুখ ছিলেন বিখ্যাত কবিওয়ালা। বিষু(পুর ঘরানা ধ্রুপদের একটি বিশেষ ঘরানা। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে টপ্পার সেরা গায়ক হিসাবে খ্যাতিমান নিধুবাবুর (রামনিধি গুপ্ত) কথাও সুনীতিকুমার বলেছেন। তাঁর তালিকা কেবল তালিকামাত্র নয়(তার মধ্যে সংস্কৃতির রূপান্তরের পরিচায়িকা লুকিয়ে আছে। রামায়ণ-মহাভারত ষোড়শ বা সপ্তদশ শতাব্দীতেও ছিল, কিন্তু রূপান্তর এইখানেই যে অষ্টাদশ শতাব্দীর মানসিক আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির আয়োজন ষোড়শ বা সপ্তদশ শতাব্দীর রচনায় নেই। তাই রচয়িতা, পৃষ্ঠপোষক, গায়ক, ঘরানা ইত্যাদির উল্লেখ ছাড়া বাঙালির সংস্কৃতির হাজার বছরের ইতিহাসটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। অথচ একটি জাতির সংস্কৃতি তার সপ্রাণত্বেরই পরিচায়ক।

23.9 সারাংশ (তৃতীয় অংশ)

মোগল আমলে পর্তুগীজদের আগমনে য়ুরোপীয় সংস্কৃতির সূচনা হয়। এর ফলে দেশে সাংস্কৃতিক দিক থেকে যুগান্তর ঘটে। বাংলা শব্দ ভাণ্ডারে তার প্রমাণ মেলে। বাঙালির খাদ্য তালিকায়, তার দৈনন্দিন জীবনে, তৈজসপত্রে আসবাবপত্র প্রভৃতির মধ্যে শব্দগুলির ব্যবহার পাওয়া যায়। যেমন খাদ্য আলু, পেয়ারা, পেঁপে আনারস, কাজু, লেবু প্রভৃতি। তামাক, জর্দা, নস্যি পর্তুগীজদের কাছে পাওয়া। আচার, আয়া, গুদাম, পালকি, কামান, পিস্তল, জানালা, পেরেক প্রভৃতি বাংলা শব্দ ভাণ্ডারে পর্তুগীজ সংযোজন। পর্তুগীজরা সপ্তগ্রামে বাণিজ্য কেন্দ্র গড়েছিল। হুগলিকে জনবহুল নগরে পরিণত করেছিল।

ইংরেজরা এদেশে এসেছিল সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। ওলন্দাজেরা একই সঙ্গে এলেও, দিনেমার ও ফরাসিরা পরে এসেছে। পলাশির পর ইংরেজরা দেওয়ানি নেওয়ার পর বাংলার রেশম শিল্পকে ধ্বংস করে। গ্রামীণ অর্থনীতি (তিগ্রস্ত হওয়ায়, সংস্কৃতিতেও সংকট দেখা দেয়। গড়ে ওঠে নগর সভ্যতা, জন্ম হয় 'বাবু' সমাজ ও তার সংস্কৃতির। এরা প্রমোদ-বিলাসে দিন কাটাতো। সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 'ভদ্দরলোক'-রা শি(া বিস্তারের সঙ্গে শি(ত শ্রেণীতে পরিণত হয়ে নতুন চিন্তা-ভাবনা মনন ও সৃষ্টিশীল রচনায় নিবিষ্ট হয়েছিলেন।

এর ফলে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণ ঘটলো। পর্তুগীজরা দেশের বাহ্যসম্পদে প্রভাব বিস্তার করেছিল, ইংরেজের আবির্ভাবে সমাজের চিন্তা-জগতে পরিবর্তন ঘটেছে। গ্রামীণ সভ্যতা নগরকেন্দ্রিক সভ্যতায় রূপান্তরিত হয়েছে। এই যুগ-সন্ধি(ণে রাজা-জমিদারদের পৃষ্ঠপোষণায় সাহিত্য, শাস্ত্র, দর্শন প্রভৃতি বিদ্যাচর্চার ীয়মাণ ধারা যেমন ছিল, তেমনি তার পাশাপাশি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে কবিগান, টপ্পা, ঢপ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সংস্কৃতির রূপান্তরের পরিচয়টি ফুটে উঠতে সু(করেছে।

23.10 অনুশীলনী 3

নীচের প্র(গুলির উত্তর ক(ন। উত্তর শেষে 123 পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

1. শূন্যস্থান পূরণ ক(ন
   (ক) মোগল আমলে _____ আগমনে য়ুরোপীয় _____ও _____ আগমন।
   (খ) _____ এদেশে এসেছিল _____ _____ গোড়ার দিকে। _____ ঠিক ওই সময়েই এদেশে আসে। পরে আসে _____ আর _____।
   (গ) পর্তুগীজেরা _____ বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে তুলেছিল, আর এক সময় _____ জনবহুল _____ পরিণত করেছিল। আর তা _____ আমলেই।
2. সঠিক উত্তরে টিক ( ) দিন
   (ক) পর্তুগীজরা হুগলি থেকে বিতাড়িত হয়
      1. 1540
      2. 1615
      3. 1532
   (খ) ইংরেজরা দেওয়ানি পায়
      1. 1765
      2. 1758
      3. 1760
   (গ) বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষণায় ধর্মমঙ্গল লেখেন
      1. রূপরাম চত্র(বর্তী
      2. খেলারাম চত্র(বর্তী
      3. ঘনরাম চত্র(বর্তী
   (ঘ) কর্ণগড়-রাজের পৃষ্ঠপোষকতায় রামে(র ভট্টাচার্য লেখেন
      1. ধর্মমঙ্গল
      2. রায়মঙ্গল
      3. শিবায়ন
3. (ক) বাংলা শব্দ ভাণ্ডারে সংযোজিত দশটি পর্তুগীজ শব্দের উল্লেখ ক(ন।
   (খ) বিষু(পুর-রাজ গোপাল সিংহের তত্ত্বাবধানে শঙ্কর কবিচন্দ্রের লেখা বইগুলির নাম উল্লেখ ক(ন।

23.11 মূলপাঠ (চতুর্থ অংশ)

ইংরেজ আগমনকে রবীন্দ্রনাথ ল(্য করেছিলেন 'কালান্তর' রূপে। কালের পরিবর্তনে একটি জাতির যে আত্মিক পরিবর্তন তার প্রতি ইঙ্গিতও রেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সুনীতিকুমার একে 'যুগান্তর' বলেছেন এবং

যুগান্তরের ফলে বাঙালির নগরনির্ভর সংস্কৃতির নবরূপ নবগতি এবং নব-প্রকৃতির অত্যন্ত সংহত সংি(প্ত এবং চুম্বকীকৃত দিগ্‌দর্শনী দান করেছেন। এ(ত্রে তিনি বিংশ শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশককে স্পর্শ করেছেন কেবল কয়েকটি নাম দিয়ে। যেমন, বিধুশেখর শাস্ত্রী-শরৎচন্দ্র-অবনীন্দ্রনাথ-নন্দলালের শিষ্যবৃন্দ, সত্যেন্দ্রনাথ বসু-রমাপ্রসাদ চন্দ্র-শরৎচন্দ্র রায় প্রমুখ।

এই পর্বের বাঙালির সংস্কৃতির পরিচয়-(ত্রকে তিনি সীমাবদ্ধ করেছেন মোট এগারোটি বিষয় ও বস্তুর মধ্যে।

ব্রাহ্মধর্ম—আদিব্রাহ্ম সমাজ, ব্রাহ্ম সমাজ ও প্রার্থনা সমাজ, হিন্দুধর্মের নবজাগৃতি—রামকৃষে(র লোকধর্ম, বঙ্কিমের ধর্মতত্ত্ব-গীতোক্ত(নিষ্কাম ধর্ম-অনুশীলনতত্ত্ব ইত্যাদি। ধর্ম অবলম্বনে জনসেবা-ব্রাহ্ম-সমাজ, রামকৃষ(মিশন, হিন্দু মিশন (এ সবে মিশনারীদের পথ কিছুটা অনুসৃত)। সংস্কৃত-চর্চা—নবজাগৃতির পর্বে ধ্রুপদী বিষয়গুলি চর্চিত হয় সর্বকালে সর্বদেশে(এদেশেও বিশেষত সংস্কৃত কলেজে এই চর্চা প্রায় সিদ্ধির স্তর স্পর্শ করেছিল।

বাংলা সাহিত্যে—রবীন্দ্রনাথের কথায় য়ুরোপের চিত্তদূত ইংরেজের কাছ থেকে পাওয়া নব মানবতাবোধ পুষ্ট নতুন রীতি ও চিন্তাসমৃদ্ধ গদ্যের ও কবিতার মাধ্যমে লিখিত ধর্ম-পরতন্ত্র-মুক্ত(লেখকের ব্যক্তি(ত্বসূচক জীবনমুখী সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে।

প্রাচীন শিল্পের পুন(দ্ধার—হ্যাভেলের প্রচেষ্টা, অবনীন্দ্রনাথের সক্রি(য়তায় যে স্কুল অব ওরিয়েন্টাল আর্ট-এর সূচনা, তারই প্রত্য(উত্তরাধিকার বহন করে নিয়ে চলেছিলেন নন্দলাল বসু-মুকুল দে প্রমুখ(মুকুল দে গভঃ স্কুল অব্ আর্টের প্রথম ভারতীয় অধ্য(আর নন্দলাল বি(েভারতীর কলাভবনের কর্ণধার ছিলেন। ভারতীয় চিত্রকলাকে তাঁরা মর্যাদামণ্ডিত করলেন।

আধুনিক নাট্যশিল্প ও রঙ্গমঞ্চের উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠা—য়ুরোপীয় নাট্যাদর্শ ও মঞ্চরীতির অনুসরণে গড়ে উঠলো বেলগাছিয়ার শখের নাটশালা, গিরিশচন্দ্রের জাতীয় রঙ্গমঞ্চ, অন্যান্য পেশাদারী থিয়েটার প্রভৃতি উত্তর ভারতীয় মার্গ সংগীতের চর্চা ছাড়াও রবীন্দ্রসংগীত, অতুলপ্রসাদী, কান্তগীতি ও নজ(লগীতির ব্যাপক প্রচার ও প্রসার দেখা গেল। রবীন্দ্রনাথের প্রবর্তনায় বি(েভারতীতে নতুন নৃত্যশৈলীর উদ্ভব ঘটলো। উদয়শঙ্কর তাঁর ব্যালেতে ভারতীয় নৃত্য ঐতিহ্যের রূপান্তর ঘটালেন।

সমাজ-সংস্কার ও সংর(ণ প্রচেষ্টা—রামমোহনের সতীদাহপ্রথা রদের মত মানবতাবাদী সংস্কার প্রচেষ্টা দিয়ে সূত্রপাত(ঈ(েরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহের প্রচলন করলেন। বহুবিবাহের বি(দ্ধে জনমত গড়ে তুললেন। সংর(ণের প্রয়াস দেখা গেছে ভূদেব-বঙ্কিম-বিপিনচন্দ্রে।

রাজনৈতিক আন্দোলন, স্বাদেশিকতাবোধ ও দেশমাতার পরিকল্পনা—নীলবিদ্রোহের সূত্রে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে দিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত। সন্ত্রাসবাদের অগ্নিযুগের পর্বে অরবিন্দ ঘোষ, অ(িনীকুমার দত্ত, শিশিরকুমার ঘোষ, সূর্য সেন প্রমুখের আবির্ভাব। ঈ(ের গুপ্তের কবিতায় স্বাদেশিকতাবোধের সূচনা। রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র, ী(রোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখের রচনায় তার বিস্তার। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন ধারণার বিবর্তন এবং শেষ পর্যন্ত জাতীয়তার তুলনায় মানবতার বড়োত্ব ঘোষণা। জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম যুগের নেতৃত্বে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সুভাষচন্দ্র স্বাধীনতাযুদ্ধের নতুন পথের পথিক। মননের সাধনায় বঙ্কিমচন্দ্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর প্রমুখের অবদান অনস্বীকার্য।

প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস বিষয়ক গবেষণার মাধ্যমে জাতীয়-গৌরব ও চিত্তবল আহরণ—সুস্পষ্ট সূত্রপাত সম্ভবত বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনে বাঙলার ইতিহাস এবং বাঙলা ও ভারতের কলঙ্কমোচনের অভিপ্রায় ও প্রচেষ্টা দিয়ে। কিন্তু গবেষণার কেন্দ্র হিসেবে এশিয়াটিক সোসাইটি এবং ব্যক্তি(হিসাবে রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে দিয়ে সচেতন সতর্ক সূত্রপাত। যদুনাথ সরকার, রমেশচন্দ্র মজুমদার এ ধারার অনুসারী।

সুনীতিকুমার প্রতিটি বিষয় ও বহু স্মরণীয় ব্যক্তি(ও ব্যক্তি(ত্বের নামোল্লেখ করেছেন। কিন্তু দু-একটি ((ত্রে তিনি নীরব থেকে গেছেন(যেমন [1] জাতীয়তাবোধের কথা—ডিরোজিও-পন্থীদের কথায়—ডিরোজিওই প্রথম ব্যক্তি(যিনি বলেছিলেন India is may native land [2] বিশেষ পরিবারকে ভিত্তি করে সংস্কৃতির ও সভ্যতার নবতন্ত্রোন্মোচনের কথা [3] নাট্য((ত্র থেকে রবীন্দ্র থিয়েটারকে সযত্নে সরিয়ে রেখেছেন সুনীতিকুমার [4] পাশ্চাত্য দেশে গমন-প্রসঙ্গ—জ্ঞান আহরণ, বক্তৃ(তা দান, বাণিজ্য ইত্যাদি কারণে—বাংলা সংস্কৃতিকে যে বিপুল পরিবর্তনের মুখোমুখি এনে দিয়েছিল, তার কথাও সুনীতিকুমার বলেন নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও এগারটি ((ত্রনির্ণয় এবং সং(-ষ্ট ব্যক্তি(-প্রতিষ্ঠানের নামোল্লেখের মাধ্যমে সুনীতিকুমার বাংলার আধুনিক কালের সংস্কৃতির পরিচয় দিয়েছেন। এই সংস্কৃতি যে মননশীলতায় ও মননশীলকর্মে উজ্জীবিত, তার প্রমাণ-স্বরূপ তিনি যেমন বিজ্ঞানচর্চা ও গবেষণার ((ত্রে জগদীশচন্দ্র-প্রফুল্লচন্দ্র-মেঘনাদ সাহা-প্রমুখের নামোল্লেখ করেছেন, তেমনি রাজেন্দ্রলাল মিত্র থেকে শু(করে অ(য়কুমার মৈত্র, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, যদুনাথ সরকার, রমাপ্রসাদ চন্দ প্রমুখের নামও নির্দেশ করেছেন। প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস-বিষয়ক গবেষণার ((ত্রে এবং একাদশতম ((ত্রের শেষে তিনি বাচস্পত্য সংস্কৃত-অভিধান রচয়িতা তারানাথ তর্কবাচস্পতি ও বাংলা বি(েকোষ রচয়িতা নগেন্দ্রনাথ বসুর নামও জানিয়েছেন।

উনিশ শতকের গোড়া থেকেই প্রতীচ্য শি(া, বিদ্যা, দর্শন বিজ্ঞানের কর্মশীলতার সঙ্গে পরিচয়ের ফলে বি(ের সর্বোন্নত ও জাগ্রত জীবন-সমাজ-সংস্কৃতির ও রাষ্ট্রের সঙ্গে বাঙালির মানস-সংযোগ ঘটেছিল(পরিণামে এসেছিল কালান্তর—মধ্যযুগীয় জাড্যের অবসান ঘটেছিল। এর ফলে নতুন মুক্তি(চেতনা, আত্মজিজ্ঞাসা, আত্মসম্মানবোধ ও নতুন জীবনস্পৃহা জেগেছিল। দেশের জড়-সমাজের অচলায়তনে ও সংস্কার-জীর্ণ বন্ধ্যা-চিত্তে চাঞ্চল্য ও চলিষ্ণু(তা দেখা দিয়েছিল। এই চাঞ্চল্যের ফলে বাঙালি উনিশ শতকে বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী হয়ে উঠেছিল সর্ব((ত্রে এবং বিশেষত সাংস্কৃতিক ((ত্রে। সুনীতিকুমার তার কথা বলেছেন। কিন্তু বলেননি এর নেতিবাচক দিকটির কথা। অথচ নেতিবাচকতার পরিণামে উনিশ শতকের পরেই বাঙালির সংস্কৃতি তার উনিশ শতকীয় দীপ্তি আলোকজ্জ্বলতা হারিয়েছিল। আহমদ শরীফ 'বাঙলা বাঙালী ও বাঙালীত্ব'-গ্রন্থে এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। শরীফের মতো 'বন্দর নগরী ও রাজধানী কলকাতায় নবশি(তেরা দেখল রেনেশাঁস-রিফরমেশন-রেজেলিউশনের প্রসাদপুষ্ট ও ইনকুইজিশান-মুক্ত(বুর্জোয়া ইউরোপ বিজ্ঞানে-দর্শনে-সাহিত্যে, শিল্পে-বাণিজ্যে-সাম্রাজ্যে, ধনে-যশে-মানে, সেবায়-সৌজন্যে-মানবতায়, উদ্যোগে-উদ্যমে-প্রাণময়তায়, প্রতাপে-প্রভাবে-দাপটে প্রদীপ্ত ভাস্করের মত আশ্চর্য বিভায় শোভমান'। কিন্তু এর পাশেই বাঙালি সমাজ মধ্যযুগের নারকীয় পরিবেশে অচলায়তন। এই লজ্জা বাঙালির শি(র্জিত নবচেতনায় ও নবলব্ধ আত্মসম্মানবোধে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিল। য়ুরোপীয় আদলে জীবন-রচনার ও সমাজ-গড়ার সুতীব্র অন্ধ আবেগ তাদের পেয়ে বসল। জীবন ও সমাজের সর্ব((ত্রে নতুন কিছু করার জন্য তাই তারা ব্যস্ত হল। কিন্তু য়ুরোপ তাদের মনে যত আকাঙ(া জাগিয়েছিল, উত্তেজনা দিয়েছিল, ততটা পরিমাণে য়ুরোপীয় চিত্ত তাদের বোধগত হল না। প্রতীচ্যের

ব্যক্তি(স্বাতন্ত্র্য, নারীর মর্যাদা, জাতীয়তাবোধ, স্বাধীনতা-প্রীতি প্রভৃতি আয়ত্তকরণের সামর্থ্য তাদের ছিল না। এতে ব্যক্তি(স্বাতন্ত্র্যের নামে স্বেচ্ছাচার হয়ে উঠল প্রগতির পথ-বিশেষ, লোকহিত হল স্বশ্রেণীর কল্যাণবাঞ্ছা-পুষ্ট। সমাজে নারীর মর্যাদা ও অধিকার-প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন জাগলেও বিধবাবিবাহ প্রচলনে, বহুবিবাহ নিবারণে অথবা নারীসমাজের পর্দা প্রথা বর্জনে ও স্ত্রী শি(াদানে ব্যাপকতর উৎসাহের অভাব ছিল। শরীফের মত বাঙালির সংস্কৃতি পরিবর্তিত হল, কৃতিত্বের অধিকারী হয়তো-বা হল(কিন্তু সবসময় আলোকজ্জ্বল হল একথা বলা যায় না।

এই পরিবর্তিত সংস্কৃতির চারটি পর্যায় সুনির্দিষ্ট করা যায়। রামমোহনের যুগ, ইয়ংবেঙ্গলের যুগ, বঙ্কিম-ভূদেব-বিবেকানন্দের যুগ এবং অতি আধুনিক প্রথম মহাযুদ্ধ পরবর্তী যুগ। প্রতিটি যুগ পর্যায়েই বাঙালির সংস্কৃতি কিছু না কিছু সমিধ সংগ্রহ করেছিল।—সাহিত্যে যেমন য়ুরোপীয় প্রভাব এসেছিল, তেমনি রামমোহনের চেষ্টায় মধ্যযুগীয় স্বার্থবুদ্ধি-আচ্ছন্ন ভয়ভীতি-বিমিশ্র মূর্তিবাদী যুক্তি(হীন ধ্যান-ধারণা নিরাকার ঈ(রের ও যুক্তি(বাদী মানসিকতায় সার্বিক নবত্ব অর্জন করেছিল। অপরপ(বঙ্কিম তাঁর ব্যঙ্গাত্মক রচনায় বিশেষত লোকরহস্যে আঘাত করেছিলেন পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বাইরের চাকচিক্যের অন্ধ বিকৃত অনুকারিতাকে ও আবেগকে। ধর্মতত্ত্বে তিনি অনুশীলন-তত্ত্বের আলোয়, মিল বেন্থাম স্পেনসার ও (শোর হিতবাদী মানবতাবাদী দৃষ্টির দ্বারা ধর্মচিন্তাকে নবত্বে উদ্বোধিত করেছিলেন। ইয়ংবেঙ্গল-পূর্বে মূলত ডিরোজিওর নেতৃত্বে ব্যক্তি(স্বাতন্ত্র্য ও বিদ্রোহ বড় হয়ে উঠেছিল, ঐতিহ্য হয়েছিল অস্বীকৃত, প্রাচীন হয়েছিল অপমানিত ও বিনষ্ট। অথচ আধুনিক যুগ ঐতিহ্যকে স্বীকার করে প্রাচীনকে র(া করে সম্মান জানিয়ে অর্বাচীনকে গ্রহণের পথে ও নবচেতনায় সার্বিকভাবে জীবনকে দেখার যুগ। সেই পর্বাগম বঙ্কিম-ভূদেবের সময়ে। বঙ্কিম ঐতিহ্যবাহী, ভূদেব দেশের ইতিহাস-সমাজ-সংসার-রীতিনীতি সম্পর্কে উদ্‌গ্রীব এবং বাঙালির জাতিসত্তাকে সর্বভারতীয় জাতিসত্তায় দৃঢ়বদ্ধ করে তোলার জন্য সংযোগের ভাষা হিসাবে হিন্দী ভাষাকে সমধিক মূল্যদানে আগ্রহী। এর পরেই রামকৃষ(-বিবেকানন্দ প্রমুখের শিবজ্ঞানে জীবসেবা প্রকৃতপ(মানবতার নামেই উৎসর্গীকৃত, কিন্তু হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সংস্কৃতির কেন্দ্রচ্যুত নয়।

বিদেশী-শাসন স্বাধীনতা-প্রীতি জাতীয় কংগ্রেস হিন্দুমেলা ইত্যাদির জন্ম দিলেও, বাঙালির সংস্কৃতিকে বাঙালিত্বে ভূষিত করতে পারেনি। কারণ বাঙালির আত্মদৈন্য। বাঙালি য়ুরোপে দেখেছিল রাষ্ট্রিক-জাতীয়তা এবং নিজেদের জন্য কামনা করেছিল ধর্মীয় জাতিসত্তা। তাই বাঙালি-হিন্দু শি(ত হয়েও হিন্দুই, আর বাঙালি-মুসলমান শেষ-পর্যন্ত মুসলিম। কিন্তু কেউই বাঙালি হয়নি। বঙ্গভঙ্গের অভিসন্ধি, ডিভাইড এণ্ড (লের নিষ্পেষণ এই প্রবণতাকে তীব্র করে তুলেছিল। অতি-আধুনিক যুগের কথায় এই জাতি-সংকটের কথা উল্লেখ করেছেন সুনীতিকুমার। প্রথম বি(্বযুদ্ধোত্তর-পর্বে এর সঙ্গে যুক্ত(হয়েছিল অর্থনৈতিক সংকট, আন্তর্জাতিক চেতনার জটিল প্রসঙ্গগুলি জটিল বিষক্রি(য়া, বিপর্যস্ত মূল্যবোধ ও বি(্বাসের প্রতিক্রি(য়া। এসবের অভিঘাতে উনিশ শতকীয় বঙ্গসংস্কৃতি এবং সার্বিকভাবে এতকাল ধরে কালে-কালোত্তরে গড়ে ওঠা বাঙালির সংস্কৃতি পরিবর্তিত সময়ে তার ভিত্তিভূমি থেকে অনেকটাই সরে গিয়েছিল—ছিন্নমূল হওয়ার উপক্র(ম হয়েছিল। তুর্কি অভিঘাতের সময়ে বৈতসী বৃত্তি র(া করেছিল বাঙালিকে(কিন্তু এই পর্বে সেই বৈতসী বৃত্তি আর রইল না। বাঙালির সংস্কৃতি এক সংকটের মুখোমুখি হয়েছিল। এইভাবে প্রায় দুশো বছরের ইংরেজ শাসন-পর্বে বাঙালির সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটেছিল।

এ সবের পরিণামে বাঙালি-য়ুরোপকে গ্রহণ করলেও, একই সঙ্গে অতি-আধুনিক যুগে সর্বভারতীয় আর্য-সংস্কৃতির সঙ্গে তার মর্মের যোগ যেন কিছুটা শিথিল হয়েছিল। অথবা, তার মূলভিত্তি যে গ্রামীণ সংস্কৃতি, তা থেকেও বাঙালি বেশ কিছুটা বিচ্যুত হয়েছিল অতি-আধুনিক যুগে।

সুনীতিকুমার এই অতি আধুনিক যুগে বাঙালির সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে যে কেন্দ্রপসারী দিকটি রয়েছে, তার প্রকাশ ল(্য করেছিলেন। আধুনিক যুগের প্রথম ও তৃতীয় পর্ব আত্মসমাহিত হওয়ার পর্ব। সুনীতিকুমারের কামনা ছিল সেই আত্মসমাহিত সাংস্কৃতিক রূপটির জন্য(বলেছেন 'বাঙালীর মত শিল্পী জাতি দুনিয়ায় নাই'। প্রমাণ বাঙালি পটুয়ার পট, বাঙালি ছুতারের কাঠ-খোদাই, রায়বেঁশে নাচ, মেয়েদের ব্রতনৃত্য ইত্যাদি। এ সবের মধ্যে আত্মসমাহিতকারী শক্তি(র প্রকাশ। আধুনিক যুগের প্রথম ও তৃতীয় পর্বে এই শক্তি(ই নবজাগ্রত ও নবগঠিত বাঙালি সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে নতুন করে অধিষ্ঠান দিয়েছে। কিন্তু বাঙালি যখন প্রৌঢ় বয়সে বিবাহ করে, যখন বাঙালি সমাজে অকৃতকার-পু(ষ বা অবীরা বা কুমারী-নারীর সংখ্যাধিক্য হয়, তখন তা সমাজ ও সংস্কৃতির আত্মাপসারী রূপটির প্রকাশক হয়ে ওঠে। কারণ, এতে বোঝা যায় প্রথম মহাযুদ্ধ পরবর্তী যুগে পাশ্চাত্য সভ্যতা সংস্কৃতি ও ইতিহাসের বিষত্রি(য়া বাঙালিকে আন্তর্জাতিক বাঙালি করে তুলেছে— আত্মিক দিক থেকে নয়, জীবনের বহি(ে ত্রে-জীবনাচরণে ও উপরিতলের ভাব-ভাবনায় ভঙ্গিতে। এই শক্তি(ও তার চাকচিক্যের প্রতি মোহ বাঙালির আত্মসমাহিত কেন্দ্রভিমুখী নিষ্ঠাকে শিথিল করে আত্মাপসারী সত্তাকে মুখ্য করে তুলেছে। কিন্তু এই রূপও হাজার বছরের বাঙালির সংস্কৃতির অন্তর্লগ্ন হয়ে যায়।

23.12 সারাংশ (চতুর্থ অংশ)

ইংরেজ অধিকারের ফলে জাতির জীবনে যে পরিবর্তন সাধিত হয় সেটি ল(্য করে রবীন্দ্রনাথ তাকে 'কালান্তর' বলেছেন। সুনীতিকুমারের মতে এ হোল 'যুগান্তর'। এর ফলে গ্রাম নির্ভরতা থেকে বাঙালির সংস্কৃতি হোল নগর নির্ভর। নগর সভ্যতার বহুমুখী বিকাশকে বুঝতে তিনি কয়েকজন কৃতিপু(ষের স্মরণ করেছেন। এঁরা নিত্যনতুন পথে গবেষণা করে বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরেছেন। ধর্ম-সংস্কার, সমাজসেবা, শি(া সাহিত্য ও শিল্পকলা সৃষ্টি, নাটক রচনা ও প্রযোজনা, নানা রাজনৈতিক আন্দোলন ও প্রত্নতত্ত্ব-ইতিহাস এবং বিজ্ঞান-চর্চা প্রভৃতি এগারোটি বিচিত্র ধারায় বাংলার মনীষা এসময় ব্যাপৃত থেকেছে।

উনিশ শতকের শু(তে প্রতীচ্য শি(া বিদ্যা দর্শনের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে বি(্বের সর্বোন্নত জাগ্রত জীবন-সমাজ-সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রের সঙ্গে বাঙালি-মানসের যোগের ফলে রবীন্দ্র-কথিত 'কালান্তর' ঘটেছিল। যার ফলে বাঙালির মধ্যযুগীয় চিত্তবৃত্তিতে আত্মজিজ্ঞাসা থেকে মুক্তি(চেতনার আকাঙ(া জেগেছে, কিছু পরিবর্তনও অবশ্যই হয়েছে, কিন্তু সব সময় আলোকজ্জ্বল হয়নি। এই পরিবর্তন নানা ধারায় সংস্কৃতির পুষ্টি ঘটিয়েছে। কোনটি মধ্যযুগীয় অন্ধ সংস্কার বহন করতে সাহায্য করেছে, অপরটি যুক্তি(বাদী জীবন-মনীষার চর্চায় উদ্বুদ্ধ যেমন করেছে তেমনি শিখিয়েছে অন্ধ অনুসরণ বর্জন করতে।

বিদেশী শাসন স্বাধীনতা প্রীতি এবং জাতীয়তাবোধের জন্ম দিলেও বাঙালির সংস্কৃতিকে বাঙালিত্বে ভূষিত করতে পারেনি, অন্তরে সংকীর্ণ থেকে গেছে। তাই য়ুরোপের রাষ্ট্রিক জাতিসত্তা বাঙালিতে হয়েছে ধর্মীয় জাতিসত্ত্বা। বাঙালি হিন্দু বা মুসলমান আধুনিক শি(ায় শি(িত হয়েও শেষ পর্যন্ত হিন্দু বা মুসলমান থেকে গেছে, বাঙালি হয়নি। তাই বাঙালি আত্মসমাহিত কেন্দ্রাভিমুখী নিষ্ঠাকে শিথিল করে আত্মাপসারী সত্তাকে মুখ্য করে তুলেছে।

23.13 অনুশীলনী 4

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর ক(ন। উত্তর শেষে 323 পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

1. শূন্যস্থান পূরণ ক(ন
   (ক) য়ুরোপ তাদের মনে যত _____ জাগিয়েছিল _____ দিয়েছিল, ততটা পরিমাণে _____ তাদের _____ হল না।
   (খ) ব্যক্তি(স্বাতন্ত্র্যের _____ হয়ে উঠল _____ পথ-বিশেষ, _____ হল স্বশ্রেণীর _____ পুষ্ট।
   (গ) সমাজে নারীর _____ ও _____ প্রতিষ্ঠার _____ জাগলেও _____ প্রচলনে _____ নিবারণে অথবা নারীসমাজের _____ _____ ও স্ত্রী _____ ব্যাপকতর উৎসাহের অভাব ছিল।
   (ঘ) বাঙালি _____ দেখেছিল _____ _____ এবং নিজেদের জন্য _____ করেছিল _____ জাতিসত্তা।
   (ঙ) তাই _____ _____ শি(ত হয়েও _____, আর বাঙালি _____ শেষ পর্যন্ত _____। কিন্তু কেউই _____ হয়নি।
2. সং(পে আলোচনা ক(ন
   (ক) স্কুল অব ওরিয়েন্টাল আর্ট, (খ) সতীদাহ প্রথা, (গ) ইয়ংবেঙ্গল যুগ, (ঘ) বঙ্গভঙ্গ, (ঙ) নীলবিদ্রোহ।
3. নীচের উদ্ধৃতিগুলির অর্থ ও তাৎপর্য আলোচনা ক(ন
   (ক) 'তুর্কি অভিঘাতের সময় বৈতসী বৃত্তি র(া করেছিল বাঙালিকে, কিন্তু এই পর্বে সেই বৈতসী বৃত্তি আর রইল না।'
   (খ) "বাঙালি-হিন্দু শি(ত হয়েই হিন্দুই, আর বাঙালি-মুসলমান শেষ পর্যন্ত মুসলিম। কিন্তু কেউই বাঙালি হয় নি।"

23.14 উত্তর সংকেত

22.4 অনুশীলনী 1

1. (ক) বলতে বোঝায়, সেন যুগ, আর্য-অনার্য, মিলন-মিশ্রণ ঘটেছে, জাতিসত্তা।
   (খ) ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধদের, শঙ্করাচার্যের, মায়াবাদের, বৌদ্ধমতের।
   (গ) বেত, বাঁশের।
   (ঘ) নৌকার, বাণিজ্য, ক(ণানারী।
   (ঙ) আলমপুঁথি, মন্ত্র, সদগু(র, মধ্যপথে।

2. (ক) খ্রিস্টিয় দশম শতক।

   (খ) বেত ও বাঁশের কাজের কথা।

3. (ক) মোরলামাছ, নালচে (কলসী) শাক দিয়ে রান্না (স্ত্রী) (ভাত) দেন পুন্যবান কান্ত (স্বামী) খান।

   (খ) 'ক(ণার নৌকা' সোনায় ভর্তি।

22.7 অনুশীলনী 2

1. (ক) হিন্দু, ব্রাহ্মণ্যবাদীদের, অস্বীকার।

   (খ) বাঙালি, জীবনের, মিলেমিশে, বাঙালি, রমণী, সন্তানেরা ও বাঙলাভাষী।

   (গ) হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, গ্রামীণ, উত্তরাধিকার, ইসলামি।

   (ঘ) সুফি, সাধকেরাও, দৃষ্টিভঙ্গি।

2. (ক) জালালুদ্দিন মুহম্মদ শাহ্

   (খ) নাভাজী দাস

3. (ক) ঠিক, (খ) ভুল, (গ) ঠিক, (ঘ) ঠিক, (ঙ) ভুল।

4. (ক) 'মজম উ-ল-বহ্‌রৈন্' দুই সাগরের মিলন।

   (খ) ও (গ) আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এককের বর্তমান অংশটি আরও একবার পড়ুন।

22.10 অনুশীলনী 3

1. (ক) পর্তুগীজদের, য়ুরোপীয়, সংস্কৃতি, সভ্যতার।

   (খ) ইংরেজরা, সপ্তদশ, শতাব্দীর, ওলন্দাজেরা, দিনেমার, ফরাসিরা।

   (গ) সপ্তগ্রামে, হুগলিকে, মোগল।

2. (ক) 1532, (খ) 1765, (গ) ঘনরাম চত্র(বর্তী, (ঘ) শিবায়ন।

3. (ক) আচার, আয়া, আনারস, কামিজ, চাবি, গুদাম, পালকি, কামান, আলু, পেঁপে।

   (খ) রামায়ণ, মহাভারত, গোবিন্দমঙ্গল, কৃষ(মঙ্গল।

22.13 অনুশীলনী 4

1. (ক) আকাঙ(া, উত্তেজনা, য়ুরোপীয় চিত্ত, বোধগত।

   (খ) স্বেচ্ছাচার, প্রগতির, লোকহিত, কল্যাণবাঞ্ছা।

   (গ) মর্যাদা, অধিকার, স্বপ্ন, বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ, পর্দাপ্রথা, বর্জনে, শি(াদান।

   (ঘ) য়ুরোপে, রাষ্ট্রিক-জাতীয়তা, কামনা, ধর্মীয়।

   (ঙ) বাঙালি, হিন্দু, হিন্দুই, মুসলমান, মুসলিম, বাঙালি।

   2 ও 3 নম্বর প্র্নের উত্তর সংকেত নিষ্প্রয়োজন।

23.15 গ্রন্থপঞ্জি

1. সাংস্কৃতিকী—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।
2. কৃষ্টি, কালচার, সংস্কৃতি—নীহাররঞ্জন রায়।
3. বাংলা ও বাঙালির বিবর্তন—অতুল সুর।
4. বাঙলা, বাঙালী ও বাঙালীত্ব—আহমদ শরীফ।
5. সংস্কৃতির রূপান্তর—গোপাল হালদার।